আঁধার রাতের বন্দিনী

আমীরুল ইসলাম

আঁধার রাতের বন্দিনী

রচনায় ঃ

আমীরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

নাঈমা প্রকাশনী

আঁধার রাতের বন্দিনী-৩

রচনায় ঃ
আমীরুল ইসলাম

প্রকাশকাল ঃ
জানুয়ারী ২০০৫ ঈসায়ী
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
জুলাই ২০০৭ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ
এম. হক কম্পিউটার্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা।
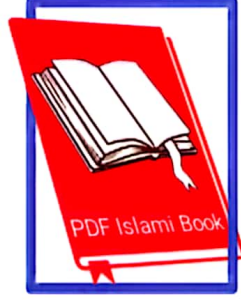
মূল্য ঃ ১৭০ (একশত সত্তর) টাকা মাত্র

উপহার

আমার স্নেহের/শ্রদ্ধেয়

....

....

.... কে

আঁধার রাতের বন্দিনী

বইখানা উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ..

....তাং ....

উৎসর্গ

✪ যে তরুণ তার তারুণ্যকে দ্বীনের পথে খরচ করার বজ্র শপথ নিয়েছে।

✪ যে যুবক আল্লাহ্র দ্বীনকে বঁচাতে পশ্চিমা আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সিনা টান করে লড়ে যাচ্ছে।

✪ যে নওজোয়ান তার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে, মসজিদ-মাদ্রাসার হেফাজত করতে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

✪ সে সব মর্দে মুমিন, বীর সিপাহী কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের করকমলে।

— আমীরুল ইসলাম

প্রকাশকের কথা

ওগো রাব্বুল আলামীন! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। কেননা, তুমি ছাড়া প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ নেই। অফুরন্ত দরূদ ও সালাম সে নবীর কদম মোবারকে যিনি সায়্যেদুল মুরসালীন ও খাতাম্মুন নাবিয়্যিন এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন।

আর তোমার রহমত প্রস্রবণ উছলে প্রবাহিত হোক সে রাসূল (সা.) এর সমস্ত উম্মতের মাথার উপর দিয়ে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনমুক্ত রুচিশীল সাহিত্য সভ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মার খোরাক যোগায়। যে কোন একজন পর্যটক সাহিত্যের সিঁড়ি বেয়ে তার পর্যটনকে অন্যের সামনে সাজিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। সুন্দর পৃথিবী অপরূপ প্রকৃতির এই দৃশ্যাবলীর বর্ণনা সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা সৃজনশীল লেখকের পক্ষে কখনো অসম্ভবের কিছুই নয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সাম্প্রতিককালের কিছু সংখ্যক স্বার্থপর কলমবাজরা অপসংস্কৃতির ছোঁয়ায় আপন সত্তাকে ভুলে গিয়ে অশ্লীল নাট্যগ্রন্থ, কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস ও অনৈতিক গল্প রচনা করে সমাজকে কলুষিত করে ফেলেছে। যুব সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অশ্লীলতার গহীন অরণ্যে।

সুতরাং পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি ও অশালীনতায় ছেয়ে যাওয়া এই কলুষিত সমাজকে, ইসলামি ভাব ধারাসম্পন্ন গল্প-কাহিনী, উপন্যাস ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের একটি স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণে আমাদেরকে সহযোগিতা করলেন উপন্যাস জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঔপন্যাসিক জনাব আমীরুল ইসলাম সাহেব।

তিনি রচনা করেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক উপন্যাস। দ্বীনপ্রিয় এই লেখকের হৃদয় ভেদ করে বের হয়ে এসেছে শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়া অপসংস্কৃতির দাবানলের কাব্যগুলি। আর সেই দাবানল ইসলামের শাশ্বত সুন্দর আদর্শ দিয়ে নির্বাপিত করেছেন লেখক তাঁর "আধার রাতের বন্দিনী" নামের এই বইটিতে।

অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় কালচার অবসান হয়ে ইসলামের সোনালী আদর্শের নব জাগরণ, নব উত্থান যাদের লালিত স্বপ্ন, আঁধার রাতের বন্দিনী বইটি সেই সব পাঠক পাঠিকাদের হৃদয়ের খোরাক হবে, ইনশাআল্লাহ্।

বইটি বের করতে দেরী হয়ে গেল। পাঠকদের কাছে দেরীতে হলেও বইটি পৌছে দিতে পেরে আল্লাহ্ তাআলার কাছে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

যথেষ্ট চেষ্টা করেছি ত্রুটি মুক্ত করার। তবুও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। পাঠকদের চোখে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবগত করুন, আমরা পুনঃমুদ্রণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইন্শাআল্লাহ।

এস, এম, আজিজুল হক
পরিচালক ঃ নাঈমা প্রকাশনী, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমার কৈফিয়ৎ

প্রভুহে!

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। কেননা তুমি ছাড়া প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত আর কেউ নেই। অফুরন্ত দরূদ ও সালাম সে নবীর কদম মোবারকে যিনি সায়্যেদুল মুরসালীন ও খাতাম্মুন নাবিয়্যিন এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন।

প্রভু হে!

সর্বোচ্চ মাকাম দান কর তোমার হাবিবের সমস্ত সহচর, সালেহীন, গাজী, শোহাদা ও অন্যসব উম্মতদেরে। ক্ষমা কর আমার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দেশবাসী, উস্তাদকুল এবং এ অধমেরে।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা!

হাজারো কর্মব্যস্ততার প্রতিকূলতার পাহাড় মাড়িয়ে আপনাদের প্রিয় পুস্তক "আঁধার রাতের বন্দিনী"র তৃতীয় খণ্ড লিখতে বাধ্য হলাম। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঠক বন্ধু ও বান্ধবীদের বারবার অনুরোধ উপেক্ষা করা অধমের জন্য বেয়াদবী হবে মনে করে, হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও অলসতাকে এক পাশে ফেলে দিয়ে কলম নিতে বাধ্য হলাম। আমি যখন আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ও আমল-আখলাকের দিকে তাকাই তখনই লজ্জা ও ঘৃণায় মাথা নত হয়ে আসে। আবার যখন আমার দয়ালু মাওলার দিকে চোখ ফিরাই তখন আশা-ভরসায় হৃদয় ভরে উঠে। আবার যখন আপনাদের পক্ষ থেকে মোবাইল ও পত্রাদির মাধ্যমে আরো কিছু লিখার তাগাদা পাই তখন উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে যায়। আবার কোন কোন বন্ধু-বান্ধব থেকে তিরস্কারও পাই। এসব মিলিয়ে পুরস্কার আর তিরস্কারের বোঝা মস্তকে নিয়ে পা পা করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা!

বইটি নির্ভুল রাখার চেষ্টা করেছি। তার পরও যদি কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়,তা আমাদেরকে অবগত করালে খুবই খুশী হব এবং আগামী মুদ্রণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ্। বাকি আপনাদের খাছ দোয়া ও আল্লাহ্‌র রহমতের কামনা করছি।

ওয়াস্‌সালাম

বিনীত—

লেখক

বই পরিচিতি

প্রকাশিত

- আঁধার রাতের বন্দিনী (১ম খণ্ড)
- আঁধার রাতের বন্দিনী (২য় খণ্ড)
- আঁধার রাতের বন্দিনী (৩য় খণ্ড)
- আঁধার রাতের বন্দিনী (৪র্থ খণ্ড)
- খুন রাঙ্গা প্রান্তর (১ম খণ্ড)
- খুন রাঙ্গা প্রান্তর (২য় খণ্ড)
- খুন রাঙ্গা প্রান্তর (৩য় খণ্ড)
- রাখাল বন্ধু (খলিফাতুল মুসলেমীন)
- ছোটদের মজার গল্প
- পথ ভোলা সৈনিক

প্রকাশের পথে

- রক্তে ভেজা কাশ্মীর
- আঁধার রাতের বন্দিনী (৫ম খণ্ড)
- রিক্ত পথিক
- নূরজাহান
- আলের পথে
- জিয়াউচ্ছালেকীন
- দুঃখ যাদের নিত্য সাথী

॥ এক ॥

কখন যে আমার হস্তস্থিত অস্ত্র খসে পড়েছে আর আমার দেহ নিঃসার হয়ে ছায়েমার লাশের উপর লুটিয়ে পড়েছে তা টের পাইনি। বিকাল চারটার দিকে চেতনা ফিরে আসলে চেয়ে দেখি চির নিদ্রিত ছায়েমার মরদেহ জড়িয়ে ধরে পড়ে আছি। ক্লান্ত দেহটা কোন মতে লাশের উপর থেকে সরিয়ে এনে লাশের পাশে বসে অপলক নেত্রে ছায়েমার সুন্দর ও ইন্দুনিভাননের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বৈকালিক গর্ভস্তিতে ছায়েমার মুখাবয়বের উজ্জ্বলতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজানুলম্বিত কৃষ্ণ চিকুর খুন-খাকে লুটোপুটি খেয়ে এলোমেলোভাবে এপাশ ওপাশ ছড়িয়ে আছে। আমি তার চন্দাননের দিকে তাকিয়ে ভাবাবেগে বলছিলাম, হে আমার প্রাণপ্রিয় ছায়েমা! তুমিই তো ছিলে আমার একমাত্র সুখ-দুখের সাথী। তুমিই তো ছিলে আমার অনুবন্ধ জিহাদের অনুপ্রেরণা দানকারিণী। আজ আমাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতলোকে পলায়ন করলে! চলে গেলে মাওলার স্মরণে, তাঁর সান্নিধ্যে। তুমি তো পেয়ে গেলে পরম কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু শাহাদাত। তুমি মহানন্দে জান্নাতে বিচরণ করতে থাক এব[illegible]ার জন্য মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে থাক, আমিও যেন তোমার [illegible]বয়ে অচিরেই তোমার সাথে জান্নাতে মিলিত হতে পারি। এটাই আমার চরম ও পরম চাওয়া-পাওয়া। এসব প্রলাপের মধ্য দিয়ে আমার প্লাবিত অশ্রুতে ছায়েমার মুখমণ্ডল আখেরী গোসল করে নিল।

আমি সংজ্ঞাহীন হওয়াতে কখন যে ভীমআহব থেমে গিয়েছিল তার খবর রাখতে পারিনি। চেয়ে দেখি চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। আমার খিমার পার্শ্বস্থিত ঝর্ণাটি রক্তে ভরাট হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কোন গাছ ও পাথর বাকি নেই যে ওরা রুশী হায়েনা ও মুজাহিদদের রক্তে গোসল করেনি। দুশমনের নিষ্ঠুর কামান ও মর্টারের গোলার আঘাত আমাদের সবগুলো বাংকার ও মোর্চা ধ্বংস করে দিয়েছে। মুজাহিদরা যে যেখানে ছিল সেখানেই শাহাদাত বরণ করেছেন। কেউ বাংকারে আর কেউ পাথর ও বৃক্ষের আড়ালে। এখনো বারুদের গন্ধে কুকান্দুজের প্রাণীকুল শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব করছে।

আমি এখনো ছায়েমার রক্তমাখা লাশের পাশে বসে ঘাড় ফিরিয়ে যৎসামান্য এ ধ্বংসলীলা অবলোকন করছিলাম। দৃষ্টির বাইরে কতটুকু কি হচ্ছে তা এখনো দেখিনি। দুঃখ, বেদনা ও অনুশোচনায় আমার পাষাণ বক্ষ ভেঙ্গে চৌচির হওয়ার উপক্রম। এ করুণ মুহূর্তে কি করব না করব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিপদে ছবর ও ধৈর্যধারণ করতে হয়, তা না করলে আল্লাহ্ নাখোশ হবেন। তাই আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। অশ্রু সিক্ত অক্ষিপল্লব পাগড়ীপ্রান্তে মুছে নিয়ে প্রিয়তমা ছায়েমার মৃতদেহ দাফনের চিন্তা করতে লাগলাম। অন্য কোন উপায় না পেয়ে নিকটতম অগভীর বাংকারে নিয়ে জানাজা পড়ে পাথর চাপা দিয়ে শেষবারের মত অশ্রু বিসর্জন দিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করলাম।

কুকান্দুজের গভীর অরণ্যের ধ্বংসলীলা নিজ চোখে দেখার জন্য এদিক ওদিক পায়চারী করতে লাগলাম। যেদিকেই চোখ বুলাই শুধু লাশ আর লাশ। বৃক্ষরাজির কাচা পাতাও গোলা-বারুদে ভস্ম হয়ে গেছে। কোন গাছের ছালও অবশিষ্ট নেই। শত শত রুশী সৈন্যের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মধ্যে মুজাহিদদের লাশ। আনুমানিক শতকরা পাঁচজন হবে মুজাহিদ আর ৯৫ জনই লাল ফৌজ অর্থাৎ বলসেবিক সৈন্য। অস্ত্র-শস্ত্র পড়ে আছে অগণিত।

আমি যতগুলো মুজাহিদের লাশ অবলোকন করেছি সবগুলোর চেহারাই ফুটন্ত কুসুমের ন্যায় সুষমামণ্ডিত। কয়েকটি লাশের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়েছে, আর বাকী লাশগুলো যেন শোণিত সিক্ত অবস্থায় অর্থাৎ রক্তে গোসল করে নওশার সাজে সুসজ্জিত হয়ে মুচকি হাসির রেখা টেনে সর্বশ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। আহা! সাথীদের এ শুভ যাত্রা দেখে আমার হৃদয়ে ঈর্ষার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাকে আমি বার বার ধিক্কার আর ভর্ৎসনা দিতে লাগলাম। আমার গোনামাখা শরীরে একটি গুলির আঁচড়ও না লাগাতে বড়ই লজ্জা অনুভব করছিলাম। কখন যে আমি জ্ঞান হারিয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়েছিলাম তাও বুঝতে পারিনি। মনে হয় দুশমন আমাকে মৃত মনে করে কাছে যায়নি।

আমি যখন শোহাদাদের নিকট গিয়ে পবিত্র লাশগুলো দেখছিলাম, তখন যেন ঐসব লাশেরা আমাকে তিরস্কার করে বলছিল, "হে খোবায়েব! তুমি এখনো অক্ষত অবস্থায় আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখছ? আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে যে কি স্বাদ আর মজা তা যদি জানতে তবে এখনো আমাদের চার পাশে ঘুরে বেড়াতে না।

হে খোবায়ের! আমরা তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে ফিরে আসছি। কিন্তু বাকী কাজ সমাধার জন্য তোমাকে রেখে আসছি। তোমার হাতে রেখে আসছি জিহাদী পরচম্। তা নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। হে খোবায়েব! ভয়-ভীতি আর সংকীর্ণমনা ত্যাগ করে এ মিশনের নেতৃত্বে এগিয়ে চল। তুমিও একদিন শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আমাদের সাথে মিলিত হবে। আমরাও তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছি।"

অকস্মাৎ আমার হৃদয়ে উদয় হল যে, কোন মুজাহিদ আহত অবস্থায় কোথাও পড়ে আছে কি-না তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। তাই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রতিটি বিটপী, বাংকার, মোর্চা ও পাথরের আড়ালে আড়ালে খুঁজতে লাগলাম। তালাশ করতে করতে আমি বেশ কিছু দূরে গিয়ে দেখি আহত একজন মুজাহিদ ক্ষীণ আওয়াজে বলতেছেন, "হাছবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়ানি'মান্নাসীর।" আমি সে করুণ সুরলহরী ধরে এগিয়ে আরো নিকটে গেলে উক্ত মুজাহিদ আমাকে দেখে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! কি অবস্থায় আছেন? তিনি পায়ের দিকে ইশারা করলেন। চেয়ে দেখি আহা! বেচারার কটিদেশের নিচের অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাছাড়া গুলি ছুড়ায় সমস্ত শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এটাই যে, এখনো তিনি জ্ঞানশূন্য হননি বা কোন ধরনের হা-হুতাশ বা আহ্ উহ্ করেননি। তিনি এক হাত আমার স্কন্ধে স্থাপন করে বলতেছিলেন, "খোবায়েব! তুমি এখনো বেঁচে আছ! আল্লাহ্র শোকর। বিদায় বেলা দু'টি কথা বলে যাই, তা স্মরণ রাখবে। মুনাফেককে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। মুসলমানরা কখনো লড়াইয়ে পরাজিত হওয়ার নয়। একমাত্র মুনাফেক গাদ্দারদের কারণেই মুসলমানগণ সাময়িক পরাজয় বরণ করে। আজকের লড়াইয়ে আমি ঐ সমস্ত মুনাফেকদের চেহারা প্রত্যক্ষ করেছি যারা দু'তিন মাস আগেও আমাদের পক্ষ হয়ে বলসেবিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ওরা অর্থের লোভে মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করে কমান্ডার কামাল পাশার পক্ষ নিয়েছে। এ কামাল পাশাই এক সময় আমাদের আমীর হযরত আনোয়ার পাশা শহীদ (রহ.)-এর দক্ষিণ হস্ত ছিল। বলসেবিকরা তাকে রাজ্যের লোভ দেখিয়ে তাদের পক্ষে নিয়ে গেছে। তার কারণেই আজ মুসলমানদের চরম অধঃপতন। প্রিয় খোবায়েব! মুনাফেকদের রেখে গেলাম তোমার জন্য। তোমার হাতে তাদের শাস্তির বিধান করবে। জিহাদের প্রোগ্রাম ছাড়া যেন তোমার আর কোন কাজ না থাকে।" এতটুকু বলতে না বলতেই আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে ওষ্ঠযুগলে হাসির রেখা টেনে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে করতে নিরব নিথর হয়ে চির

নিদ্রায় ঘুমিয়ে গেলেন। এখনো সে হাসি ফোটা চেহারা আমার চোখে লুকোচুরি খেলছে।

বেশ কিছুক্ষণ আমি ঘুরে ঘুরে এসব ধ্বংসলীলা দেখলাম। আমাদের যে কয়টা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোটক ও গাধা ছিল সবগুলোকেই দুশমনরা হত্যা করে ফেলেছে। এখানে একা একা অবস্থান করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এখন কোথায় যাব, কিভাবে যাব তা নিয়ে ভাবছি। কিছুক্ষণ পরেই গোধূলীতে ছেয়ে যাবে দশদিক। আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঝর্ণার পানি সব রক্তে রক্তাক্ত। তায়াম্মুম করে কাজা নামাযসহ আসরের নামায পড়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করলাম, প্রভু হে! অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর কুকান্দুজের গভীর অরণ্যে ও কুহেকাফ পবর্তমালার পাদদেশে আশ্রয় নিয়েছিলাম। দুশমনরা আমাদের সঙ্গী সাথীসহ সবকিছুই ধ্বংস করে দিয়েছে। তোমার সৃষ্টি বিশাল নিখিল ধরা থাকতেও তা আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। প্রভু হে! কোথায় যাব, কিভাবে যাব তা ভেবে পাচ্ছি না। তুমি যদি আমার রাহাবর হয়ে যাও তবে আশ্রয়স্থলে সহজে পৌছতে পারি। তা না হয় তোমার সৃষ্ট হিংস্র হায়েনাদের উদরে যেতে হবে। অতএব, আমাকে পথ দেখাও। বেঁচে থাকা মুজাহিদগণ যেদিকে পা বাড়িয়েছেন সেদিকে আমার পা পরিচালিত কর।

আমার মোনাজাত শেষ হতে না হতেই পশ্চিম দক্ষিণ কোণ থেকে একটি শব্দ ভেসে এল, "এদিকে এসো, এদিকে এসো।" এ শব্দটি পরিচিত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ বলেই মনে হল। আমি উক্ত আহবানের সুর ধরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগলাম। দু-তিনশ গজ যাওয়ার পরেই একজন রুশী জেনারেলের মৃতদেহ শোণিতসিক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। উক্ত লাশের বক্ষদেশে নেইম প্লেটে রুশী ভাষায় লেখা রয়েছে জেনারেল নিকুলায়েভ দিমাগা। নামটা দেখেই আমার সর্বাঙ্গে এক তড়িৎ প্রবাহ খেলে গেল। জেনারেল নিকুলায়েভ দিমাগা একজন দুর্ধর্ষ লড়াকু যোদ্ধা। তার হাতে বহু মুসলমান নারী-পুরুষ নির্যাতিত হয়েছে এবং বহু মুজাহিদ প্রাণ হারিয়েছে। এ নর পিশাচ আজ মুজাহিদদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে বলে খোদার প্রশংসা গাইতে লাগলাম। অতঃপর তার ইউনিফরম খুলে নিলাম এবং অস্ত্রটিও তুলে নিলাম। তারপর আরো একটু এগিয়ে দেখি রুশীদের খাদ্যভাণ্ডার। সেখান থেকে শুকনো খাবার ও ফলমূল, শীত বস্ত্র এবং এক মশক পানি নিয়ে সামনে এগিয়ে চললাম। গোলা-বারুদ, কম্বল, খাদ্য ও অস্ত্র-শস্ত্র মিলিয়ে কম পক্ষে ২০/২৫ কেজি ওজন হবে। এ মুহূর্তে এগুলো একা একা বহন করা খুবই কঠিন, কিন্তু এগুলো ছাড়াও যে চলে না...। তাই মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এসব ছামান পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করে এগিয়ে চললাম।

॥ দুই ॥

সামান্য কিছু স্মৃতি অতিক্রম করার পরই অষর্মা অস্তপার হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। মসিময় হয়ে আসছে চারদিক। কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। তুষার চাদরে আচ্ছাদিত কুহেকাফের শীর্ষচূড়া। শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া দুঃসাধ্য। নাসারন্ধ্র ফেটে রুধিরাক্ত শ্লেষ্মা বেরিয়ে আসছে। এতক্ষণে আদিত্য অস্তপারে লুকিয়ে গেল। আমি গলিত তুষারে অজু করে মাগরিবের নামায আদায় করে কোথায় যাব তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

সামান্য সময় বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা করলাম। বন্য দাঁতাল বরাহগুলো কেবলই হুমড়ি খেয়ে পালাচ্ছে। কে যেন সারা দুনিয়ার অন্ধকারকে যাদু-মন্ত্রের মাধ্যমে কুকান্দুজে চালান দিয়েছে। অথবা এরাই স্বেচ্ছায় রাত যাপনের জন্য কুকান্দুজের ঘনকান্তারে আশ্রয় নিয়েছে। চলার পথে লক্ষ কোটি লতা ও কাঁটা-গুল্ম আমার চলার গতি রোধ করে দিচ্ছে। ওরা যেন নিরব ভাষায় ডেকে বলছে, "হে পথিক! ওদিকে যেও না। এখানে থাক। বিশ্রাম কর। আমি কাটার আঘাতে আঘাতে কেবলই বিরক্ত হচ্ছি, কিন্তু চলার গতি থামাইনি। আমার কর্ণকুহরে এখনো অনুরণিত হচ্ছে, "এদিকে এসো, এদিকে এসো।"

পাহাড়ের কূল ঘেঁষে ঘন বনবনানীর ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। হঠাৎ বিকট আওয়াজে উপর থেকে কি যেন নিম্নদেশে পতিত হল। মনে হল সপ্ত আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। চলার গতি থেমে গেল। গা কাঁপছে। ছাতি দুরু দুরু করছে। এটা কিসের আওয়াজ তা বুঝতে পারিনি। এখন পিছে হটব না অন্যদিকে অগ্রসর হব তা ভেবে পাচ্ছি না। বেশ কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় মনে হল যে, এটা কোন কামান দাগানোর শব্দ নয়। লোক মুখে শুনেছি অনেক সময় বিশালাকারের বরফের স্তূপ নিচে পতিত হয়ে প্রলয়ংকরের সৃষ্টি হয়। আসলে এটা বরফের চটান ভূপতিত হওয়ার শব্দ।

আনুমানিক রাত এগারটার দিকে এক খরস্রোতা নদীর নিকট গিয়ে পৌছলাম। এত গভীর নদী জীবনে কোনদিন দেখিনি। দৈর্ঘ্যও একেবারে কম নয়। মালামাল তো দূরের কথা দেহ নিয়েও পার হওয়া সম্ভব নয়। স্রোতের তোড়ে বিশালাকারের তুষারখণ্ডগুলো ভেসে যাচ্ছে। কোন ব্যাঘ্রশাবকও সাঁতার দিয়ে সোজা ওপারে পৌছতে পারবে না। পৌছলেও এক কিলোমিটার দূর দিয়ে পৌছতে পারবে।

ঠাণ্ডায় সবকিছু বরফ হয়ে গেছে। এক কদমও সামনে অগ্রসর হওয়ার শক্তি নেই। তাই নদীর কূলেই রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। হায়! গ্রাউন্ডশীট

বিছানোর মত জায়গাটুকু খুঁজে পেলাম না। সবখানেই বরফ। অগত্যা গিরিকন্দর তালাশে লেগে গেলাম। আল্লাহ্‌র রহমতে একটি গুহা পেয়েও গেলাম। গুহা অনেকটা পরিষ্কারই মনে হচ্ছে। শীতের প্রকোপ থেকেও অনেকটা মুক্ত। তাই বার বার আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলাম। গুহাটা অনেক দীর্ঘ বলে মনে হল। অত গভীরে না গিয়ে গ্রাউন্ডশীট বিছিয়ে আনুমানিক কিবলা সাব্যস্ত করে নামায আদায় করলাম। অতঃপর আহার্যগুলো বের করে আহার করলাম। রুশীদের থেকে যে কম্বলখানা এনেছি এটা ছিল বেশ বড় ও মোটা। তার কিছু অংশ বিছিয়ে বাকি অংশ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত গভীর। গুহাটি আঁধারের খনি। এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করছি, ঘুম আসছে না। এমনিভাবে কেটে গেল রাতের দু'প্রহর। এরই মধ্যে গুহাভ্যন্তর থেকে কিসের একটি আওয়াজ কানে এল। ভয়ে গা ছমছম করছে। হয়ত বন্য কোন প্রাণীর আস্তানায় এসে আশ্রয় নিয়েছি। ভয়ে শোয়া থেকে উঠে বসে গেলাম। ঠিক এমন সময় কি যেন হুমড়ি খেয়ে আমার শরীরে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার কণ্ঠ থেকে এক বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল। সাথে সাথে অন্য আর এক কণ্ঠে মনুষ্য কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেলাম। একে অপরের উপর পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছি। ভাবলাম, হয়ত বন্য দস্যু হবে বা অন্য কেউ। আমি সাহস সঞ্চয় করে ঝাপটে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে তুমি? অপর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল "তুমি কে?"

আমাদের কথোপকথনের শব্দ পেয়ে গুহাভ্যন্তর থেকে চিল্লিয়ে অপর একজন খামোশ খামোশ আওয়াজ করে এদিকে ধেয়ে আসছে। আমি বুঝলাম, এবার আর রক্ষা নেই। অন্ধকারেই দুশমনের হাতে জীবন দিতে হবে। আমার অস্ত্রটিও হাতের নাগালে পেলাম না। ভিতর থেকে অপর জন এসে অনেক শক্তি খাটিয়ে আমার উভয় হস্ত ও চোখ বেঁধে ফেলল। আমার চিৎকার এ অরণ্যে কে শোনে? অতঃপর টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেল গুহাভ্যন্তরে। সেখানে ওরা ডাল-পালা দিয়ে শীত নিবারণের জন্য আগুন ধরিয়েছিল। আমাকে বসিয়ে ওরা আগুন প্রজ্জ্বলিত করে অন্ধকার দূর করল। আমার গায়ে ছিল রণাঙ্গনের উর্দি এবং শহীদ কমান্ডার আনোয়ার পাশা (রহ.)-এর গ্রুপের নির্বাচিত পোশাক। তা দেখে উভয়ে আঁতকে উঠল। তারপর চোখের বন্ধন খুলে চেহারার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল, "ইয়া আল্লাহ্! তুমি কি খোবায়েব নও? আমিও দু'জনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলাম, তোমরা কি ভাই ওয়ায়েভ আর উছায়েদ নও? এবার আমার হস্ত বন্ধনমুক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন এবং ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

ওয়ায়েভ ও উছায়েদ দু'জনই হযরত আনোয়ার পাশা (রহ.)-এর তরবিয়ত ইয়াফতা জানবাজ সালার। অনেক যুদ্ধে তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদের লাইনে তাদের কুরবানীর তুলনা হয় না।

আমি এ দু'জন অকুতোভয় ও জানবাজ সালারকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা, খুশীতে মাতোয়ারা, উল্লাসে দিশেহারা, প্রফুল্লে আপনহারা। আমার মনে হচ্ছিল নৈরাশ্যের দিগন্তে আশার চাঁদ উদিত হয়েছে। কূলহীন পারাবারে কাষ্ঠ নির্মিত তরণী ভেসে উঠেছে। ধূসর মরুভূমিতে বারি বর্ষণ হয়েছে এবং হৃদয় মরু সবুজ-শ্যামলে ও ফলে ফুলে ভরে উঠেছে। আনন্দ রাখার আর জায়গা নেই। আল্লাহ্র শোকর আদায় করতে গিয়ে মমললাটে জমিনে লুটিয়ে পড়লাম।

আমি মস্তক উত্তোলন করে ওয়ায়েভকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই তোমরা প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় কো . কিভাবে ছিলে এবং এখানেই বা এলে কেমন করে? তিনি বললেন, "ওসব কথা পরে হবে এখন কিছু খেয়ে নাও।" আমি বললাম, ভাই তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করার পূর্বক্ষণে উদর পূর্ণ করে আহার করেছি। আমার নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য আছে, প্রয়োজনে তোমরাও খেতে পার। ওয়ায়েভ বলল, "না ভাই! আমরাও আহার করেছি এখন আর প্রয়োজন নেই।" তারপর তিনি প্রচণ্ড লড়াইয়ের কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, "আমরা দু'জনে পিছনের পাহাড়ে বাংকারে বসে নাস্তা করছিলাম, এমন সময় বিকট শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দিল। একবার ভেবেছিলাম হয়ত পর্বত শৃঙ্গ থেকে তুষার চটান পতিত হয়েছে। কিন্তু পরপর শব্দ শুনে ভাবলাম যে, আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেছে। সে সময় আমরা খানা শেষ করে কি করব না করব তা নিয়ে পরামর্শে বসলাম। উছায়েদ বলল, "একটু অপেক্ষা করুন, অবস্থা একটু জেনে নেই।" এই বলে উছায়েদ দূরবীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব পর্যবেক্ষণ করল এবং বলল, "ওয়ায়েভ ভাই! অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। বিপুল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে হাজার হাজার সৈন্য আমাদের ঘিরে রেখেছে এবং আমাদের মোর্চা ও বাংকারগুলো নিশানা করে কামান দাগাচ্ছে। চিন্তা করে কাজ করতে হবে।"

উছায়েদের কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। দুশমনকে কাবু করা ছাড়া শহীদ হওয়া ছিল খুবই বেদনাদায়ক, তাই আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইতে লাগলাম। উছায়েদ এখনো দূরবীনের সাহায্যে তাদের গতি-বিধি দেখছিল। এক পর্যায়ে বলে উঠল, "ওয়ায়েভ ভাই! বিশাল একটি বাহিনী আমাদের রেঞ্জের ভিতর এসে গেছে। এরা সবাই বড় বড় অফিসার বলে মনে হয়। এদের পশ্চাতে আর কোন সৈন্য আছে বলে মনে হয় না। আমাদের পিছনে রয়েছে পাহাড়, এদিকে কোন সৈন্য নেই। আমরা ফায়ার করে যদি কিছু জাহান্নামের ভিসা দিতে

পারি তবে মন্দ হয় না। প্রয়োজনে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারব। আপনিও একটু দেখে নিন।" এই বলে দূরবীন আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমিও ভালভাবে দেখে নিলাম। হ্যাঁ এরা সবাই বড় বড় অফিসার আর এটা অফিসার সারি হওয়ারই কথা। কারণ ওদের কমান্ডারগণ পশ্চাৎদিক থেকে কমান্ড করে। আর আমাদের আমীর বা কমান্ডারগণ যুদ্ধের ময়দানে থাকেন প্রথম সারিতে। অতঃপর সময় নষ্ট না করে আমাদেরকে আড়াল করে, "ওয়ামা রামাইতা ইজ রামাইতা, ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা" বলে ট্রেগার টানতে লাগলাম। সম্মুখ থেকে মুজাহিদদের ফায়ারে ওরা এগিয়ে যেতে পারছে না। কিছু কিছু পিছু হটছে। এদিকে আমরাও গুলি বর্ষণ করতে লাগলাম। এটা ফখরের কিছু না। আমাদেরকে আনোয়ার পাশা এমন শিক্ষা দিয়েছেন যে দৌড়ে ফায়ার করলেও টার্গেট মিস হয় না। ওদের কামান, মর্টার আর অন্যান্য মারণাস্ত্রের আওয়াজে আমাদের রাইফেলের আওয়াজ ওরা ঠাহর করতে পারেনি। কোন দিক থেকে গুলি আসছে তাও অনুমান করতে পারেনি। এভাবে শত শত দুশমন হত্যা করার পর আমাদের গুলি শেষ হয়ে যায়। অতঃপর পিছনে চলে আসি।

ওযায়েরের কথা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম, ভাই! আপনাদের এখান থেকে যেসব মুজাহিদরা দল ও দ্বীন ত্যাগ করে কামাল পাশার নিকট চলে গেছে, ওরা তো এ স্থানটির কথা জানত, তাহলে হামলা হওয়ার আগেই এ স্থান ত্যাগ করেননি কেন?

"হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক। আমরা আগে আরো পূর্ব দিকে ছিলাম, তাদের আক্রমণের আশংকায় ২০ মাইল পশ্চিমে চলে এসেছি। ওদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক খুবই মজবুত। এতসব চিন্তা করে লাভ নেই। আল্লাহ্‌র যা মর্জি তাই হবে।"

"আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা কি মজবুত করা যায় না?"

"করা যায়, কিন্তু যে ধরনের অর্থের প্রয়োজন তা আমরা বহন করতে পারি না। এক শ্রেণীর ওলামাবেশী মুনাফেকদের ফতোয়ার কারণে মুসলমানরা আমাদেরকে অর্থ যোগান দিচ্ছে না। অর্থের অভাবে আমাদের অনেক প্রোগ্রাম ধুলায় মিশে গেছে। এসব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে রজনী পোহায়ে ভোর হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

নিরব নিথর যামিনী। কোলাহলমুক্ত গ্রাম্য পরিবেশ। রাত ৮/৯ টার পর শ্রমক্লান্ত মানুষজন শয্যা গ্রহণ করে এবং নিদ্রাপুরীতে হারিয়ে যায়। শুক্লা দ্বাদশীর

চাঁদ সবে মাত্র অস্ত গিয়েছে। দূরাকাশের তারকাগুলো এখনো মিটমিট করে ঘুমন্ত প্রকৃতি অবলোকন করছে। রাওয়ান্ডের অধিবাসী হারেছ মিকাইলীর একমাত্র রূপসী অনূঢ়া কন্যা মাহমুদা খোলা বাতায়নে বসে তারার লুকোচুরী খেলা দেখছে। তার চোখে ঘুম নেই। অস্থির-বেকারার। কি যেন তার হারিয়ে গেছে। কি যেন সে পেয়েও পেল না। কয়েক মাস যাবৎ কে যেন তার মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে তা কেউ বুঝতে পারেনি। মাহমুদার এ অবস্থা তার মাতা-পিতা ছাড়াও মেয়ে মহলে ধরা পড়েছে।

মাহমুদা ছিল ইসলামী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বলসেবিকরা মাদ্রাসাটি বন্ধ করে দিয়ে সেখানে তাদের অস্থায়ী ক্যাম্প বসিয়েছে। তাই মাহমুদার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। সেদিন থেকেই মাহমুদা মিকাইলী তার বাসভবনে বসে বসে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খসরা আঁকতে থাকে।

মাহমুদা মিকাইলীর আব্বা হারেছ মিকাইলী যেদিন আমাকে বাঁশ বাগান থেকে নিয়ে তাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেদিন থেকেই তার সাথে আমার পরিচয়। তাদের বাড়ীতে অবস্থান করাকালীন একমাত্র মাহমুদাই ছিল আমার খেদমতগার। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার সাথে তার ভাব জমে ওঠে। হারেছ মিকাইলী দুশমনের ভয়ে আমাকে অন্তপুরে অর্থাৎ তাদের হেরেমে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন। নিরুপায় হয়েই ক'দিন থাকতে হয়েছে তাদের হেরেমে। আমার অজু-গোসলের পানি ও খানা-পিনার প্রয়োজন মিটানোর অন্য কেউ না থাকায় মাহমুদাকেই সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

মাহমুদা মিকাইলী প্রায় সময়ই আমার নিকট বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞাসা করত এবং জিজ্ঞাসা করত জিহাদ সম্পর্কীয় মাসআলা। আমি তাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সমাধান দিয়ে খুশী করতাম। আমি যেদিন ওর আব্বার দেয়া অস্ত্রগুলো কফিনে ভরে এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বেরিয়ে আসি সে তখন কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল এবং বলছিল, "মুসাফির ভায়া! আমার হৃদয়ে তোমাকে স্থায়ীভাবে আসন দিয়েছিলাম। তুমি আজ তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, প্রাণের দুয়ার খুলে বেড়িয়ে যাচ্ছ। চেয়েছিলাম আজীবন তোমার সুখে দুখে ছায়া হয়ে পাশে থাকব। তা বুঝি আর হল না।"

মাহমুদার দরদমাখা কথাগুলো শুনে আমি বড়ই ব্যথিত হয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। তারপরও বলেছিলাম, মাহমুদা! তোমার হৃদয় উজার করা ভালবাসা আমি পেয়েছি। তোমার অভিপ্রায় আমি অনুধাবন করেছি। কিন্তু আমার হৃদয়টা অন্য একজনে নিয়ে গেছে। আমার হৃদয়জুড়ে অন্য একজন আসন পেতে বসে আছে। তা না হয়...।

"সে মহিয়সী ও সৌভাগ্যশালিনী কে? তার পরিচয় দেবে মুসাফির ভাইয়া?"

অতঃপর আমি ছায়েমার হৃদয় বিদারক কাহিনী আদি-অন্ত শুনিয়ে দিলাম। অতঃপর সে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "অন্যের হকে আমি হাত দিতে চাই না। কিন্তু হৃদয় যে মানে না! আচ্ছা ঠিক আছে, ছায়েমাকে নিয়ে তুমি পরম সুখে থাক এটাই কামনা করি। তবে ছায়েমাকে নিয়ে তোমার এ দুঃখিনী বোনটিকে দেখতে আসবে না?" সেদিন তাকে আমি ওয়াদা দিয়ে এসেছিলাম যে, নিশ্চয় ছায়েমাকে নিয়ে আসব।

সেদিন থেকে মাহমুদা অপলক নেত্রে আমার আগমনের পথপানে চাতকের মত চেয়ে থাকে ও ফোটায় ফোটায় অশ্রু ঝরায়। আজও সে নিশি রাতে খোলা বাতায়নে বসে, মেঘমুক্ত আকাশপানে তাকিয়ে আমার কথা ভাবছে যে, হায়! আজ দুতিন মাস অতীতের করাল গর্ভে বিলীন হতে চলল, খোবায়েব আমার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে, আবার আসার ওয়াদা দিয়ে। এখনো তো সে ফিরে এলো না। তাহলে কি সে গ্রেফতার হয়ে গেছে? না বলসেবিকরা শহীদ করে দিয়েছে! প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন এলাকায় কঠিন সংঘর্ষ হচ্ছে, এতে উভয় পক্ষের হতাহতের খবর শোনা যাচ্ছে।,এমন যেন না হয় যে খোবায়েব এ ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছে। আহা! এ সংবাদ শুনতে আমি মোটেও প্রস্তুত নই। আহা! কত ভাল মানুষ বেচারা! কি সুন্দর তার চেহারা ও আমল আখলাক। ছায়েমাকে নিয়ে আবার যদি আসে তবে বলব, ছায়েমার বাঁদী হিসাবে আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে। মেয়েদের মন খুবই নরম। হয়ত কবুল করতেও পারে। আর যদি তা নাই হয়, তবে আজীবন একজন হাফেজ, আলেম ও দ্বীনের মুজাহিদকে ভালবেসে যাব। এসব জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে মাহমুদার রাত দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

মাহমুদার অন্তরের গভীর থেকে এক একটি দীর্ঘশ্বাস এমন নির্গত হয় যা দুনিয়াকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবে। তার চোখ থেকে ফোটায় ফোটায় তপ্ত অশ্রু নির্গত হয়। ফুটন্ত গোলাপের হাসির মত ছিল তার মুখের হাসি। তা আজ সে ভুলে গেছে। তরু তাজা দেহ বল্লরী ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে চলেছে। স্নিগ্ধ কুসুমের কোমলতা যেন কেড়ে এনেছিল তার চন্দ্রাননে, আজ তা কেবলই শুকিয়ে যাচ্ছে। অনাহার আর অনিদ্রা এখন তার নিত্যদিনের সাথী। তার হৃদয়ের আসল রোগ সকল ডাক্তারগণই নির্ণয় করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তবে ডাক্তারগণ যদিও তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেননি, কিন্তু তার পিতা হারেছ মিকাইলী ও মাতা খাদিজা বুঝতে পেরেছেন যে, খোবায়েবের প্রেম-বিরহ তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। আহা! খোবায়েব যদি আবার ফিরে আসত!

বেচারা কতই না ভাল মানুষ ছিল! সে যদি ফিরে আসত তাহলে আমার সমস্ত ধন-দৌলত তাঁর হাতে তুলে দিতাম। জামাতা বানিয়ে ঘরে তুলতাম এবং ছেলের মর্যাদা দিতাম। খাদিজা মিকাইলী এসব প্রলাপ বকতেন স্বামীর নিকট।

একটি মাত্র ছেলে ছিল মাহমুদ। দেখতে রাজ দুলালের মত। ১৪ বৎসর বয়সে এক ভীমআহবে শাহাদাৎ বরণ করেন। বর্তমানে এক কন্যা ছাড়া এ সংসারে আর কেউ নেই। অর্থ-কড়ি, জায়গা-জমি ও ধন-দৌলতের কোনই অভাব নেই। অনেক সময়ই খাদিজা মিকাইলী লোহিত লোচনে ও লোলিত কণ্ঠে স্বামীকে বলতেন, "প্রিয়তম! খোবায়েবকে তালাশ করে আনো না!" উক্ত শহীদ পরিবারে যেমন অর্থ-কড়ির অভাব নেই ঠিক তেমনি দ্বীনদারীরও কমতি নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে আনোয়ার পাশা (রহ.)-এর মুজাহিদ ফান্ডে দান করেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার অস্ত্র, খাদ্য, সাওয়ারী, ঔষধ ও পোশাক-পরিচ্ছদ দান করেছেন।

সোনার সংসার এখন বিরাণ হতে চলেছে। একদিকে পুত্র শোক, অপরদিকে মুসলমানদের দুরবস্থা, অন্যদিকে মেয়ের দুশ্চিন্তা। এসব মিলিয়ে পরিবারটা এখন নরকানলে জ্বলছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে পিতা মাতাও অশ্রু না ঝরিয়ে থাকতে পারেন না।

মেয়ের এ অবস্থা সইতে না পেরে খাদিজা তাঁর বড় ভাই ডাক্তার রাগেভ মিকচির (যিনি রাওয়ান্ডের বিশাল হাসপাতালের বড় অফিসার) নিকট কন্যার সমস্ত অবস্থা জানালে তিনি বলেন, "মেয়েকে অনতিবিলম্বে আমার এখানে পাঠিয়ে দাও। এখন যদি তার চিন্তা-চেতনা অন্য দিকে প্রবাহিত না করা যায় তবে ব্রেইন আউট হয়ে যেতে পারে। তাকে যদি আমার এখানে দিয়ে দাও তাহলে ছওদার সাথে (মাহমুদার মামাত বোন) থেকে যদি আলাপ আলোচনা করে তাহলে তার চিন্তা অনেকটা কাটতে পারে। তাছাড়া আমি আরো একটি চিন্তা করছি; তাহল, দুজনকেই প্রাথমিক চিকিৎসা ইনিস্টিটিউটে ভর্তি করে দেব। তাহলে গ্রাম্য ডাক্তার বা নার্সের কাজ করতে পারবে। কোন একটি কাজে লেগে থাকলে বাজে চিন্তা করার সময় পাবে না। আহা! মেয়েটা তো ছওদার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী ছিল। তার অবস্থা শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম।"

খাদিজা ভাইয়ের কথা শুনে বললেন, "আমি তাকে দু'এক দিনের মধ্যেই নিয়ে আসব, আপনি সব ঠিকঠাক করে রাখেন। পাঠানোর সাথে সাথেই যেন ভর্তি করে দিতে পারেন।"

"আমি তো ছওদার জন্য ভর্তি ফরম আগেই নিয়ে এসেছি। মাহমুদার জন্য আগামীকালই আর একটি ফরম নিয়ে আসব। তুই তাকে পাঠিয়ে দিস।"

"ভাইজান! যেভাবেই হোক খোবায়েবের চিন্তা তার দিল থেকে দূর করতে হবে। তা না হলে মহা সঙ্কটে পড়তে হবে।"

"তোমরা কোন খোবায়েবের কথা বলছ?"

"কেন! আপনি দেখেননি? কিছুদিন যে একটি ছেলে গোপনে আমাদের বাড়ীতে ছিল। মাহমুদার আব্বা যাকে অস্ত্র দিয়ে কফিনে ভরে দিয়েছিল। আপনিও তো এ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তা কি ভুলে গিয়েছেন?"

"অ...সেই খোবায়েব? সে তো অনেক বড় মুজাহিদ। তার কথা তো ইদানিং খুব বেশী বেশী পত্র-পত্রিকার হেড লাইনে আসছে। এই তো দু'দিন আগে ডেইলী নিউজে সংবাদ এসেছে। তাকে যদি কেউ জ্যান্ত বা মৃত ধরে দিতে পারে তবে লেনিন তাকে ৫০ লক্ষ রোবল পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যদি কেউ তার ছবি অথবা কোথায় থাকে সে সংবাদ দিতে পারে তাহলে তাকে লক্ষ রোবল পুরস্কার প্রদান করবেন। তাকে ধরার জন্য বলসেবিকরা আদা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে। উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে নাকি কমিউনিস্টদের চরম ক্ষতি সাধন করছে।"

ডাক্তারের কথা শুনে খাদিজা অশ্রুসজল নয়নে বললেন, "আহা! ছেলেটা তো ছিল যেমন খুবসুরত, তেমনি আমলী। সে আমার ঘরে সপ্তাখানেকের জন্য মেহমান হয়ে উঠেছিল। তাকে আমি যদিও পেটে নেইনি ও বুকে ধরিনি তবু তাকে ছেলের মর্যাদা দিয়েছিলাম। আমার আদর সোহাগ সে কেড়ে নিয়েছিল। আয় আল্লাহ্! তুমি তাকে দুশমনের শ্যেন দৃষ্টি থেকে হেফাজতে রাখ। তুমি তার একমাত্র আশ্রয়দাতা। তোমার কুদরতী হাতে তাকে সঁপে দিলাম।"

খাদিজা পিত্রালয় থেকে বাড়ী ফিরে হারেছ মিকাইলীর নিকট সব খুলে বললেন। হারেছ মিকাইলী ডাক্তারের পরামর্শ খুবই পছন্দ করলেন। অতঃপর মাহমুদাকে ডেকে এনে বললেন, "মা মাহমুদা! তোমার মাদ্রাসা তো বলসেবিকরা তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কয়েক মাস যাবৎ লেখাপড়া বন্ধ। অযথা অমূল্য সময় নষ্ট না করে আগামীকাল তোমার মামা বাড়ী চলে যাও। তোমার মামা তোমাকে ও ছওদাকে ডাক্তারী পড়াবেন। তোমরা দু'বোন এক সাথে পড়াশোনা কর। এতে সমাজের খেদমত হবে।"

"আব্বা! এ সমাজে লেখাপড়া করে লাভ নেই। যে সমাজে মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে, যে সমাজে ধর্ম কর্ম করলে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, যেখানে পাইকারী হারে আলেম-ওলামা, দ্বীনদার-পরহেজগারদের ধরে জবাই করতেছে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে মানুষের জান, মাল ও মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই, সে সমাজে লেখাপড়া করে লাভ নেই। আমি এখন জিহাদে

বেরিয়ে পড়ব। আল্লাহ্‌র দুশমনদের হত্যা করে করে ভাই এর মত শাহাদত বরণ করব। এটাই আমার অঙ্গীকার।"

মাহমুদার অভিপ্রায় শুনে পিতা বললেন, "মা! জিহাদ সকলের উপর ফরয তা মানি। কিন্তু পরিবেশ তা দিচ্ছে না। তা ছাড়া প্রশিক্ষণেরও দরকার। প্রশিক্ষণ ছাড়া কি জিহাদ করা সম্ভব?"

"আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। খোবায়েব ভাই আমাকে চুপি চুপি তিন চারটা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি বিদায় বেলা অতি গোপনে আমাকে একটি অস্ত্র ও গুলি দিয়ে গেছেন। তা দিয়েই যা পারি দুশমন হত্যা করে মনের জ্বালা মেটাব। আমাকে আর অন্য কোন কাজে ব্যবহার করার চিন্তা করবেন না।"

"মা! পাগলামী করলে হয় না, তুমি তোমার মামার নিকট চলে যাও। তুমি যদি একজন ভাল নার্সও হতে পার তবে এর দ্বারাও জিহাদের কাজ করতে পার। যেমন কোন মুজাহিদ আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলে তার পরিচর্যা ও সেবা শুশ্রূষা করা। দুশমন এলে তারও ব্যবস্থা নেয়া যাবে। তারপর যদি কোন একটি পরিবেশ তৈরী করতে পারি, তবে আমরা সবাই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

পিতার কথা শুনে মাহমুদার মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং মামা বাড়ী যেতে রাজি হয়ে গেল। পরদিন হারেছ মিকাইলী নিজেই মাহমুদাকে নিয়ে তার মামার নিকট রেখে আসলেন। মামা দু'জনকে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য ভর্তি করিয়ে দিলেন। দু'বোন নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ে লেখাপড়া করতে লাগল।

॥ চার ॥

ফজরের নামায আদায় করে তাছবিহাত পড়ে, কিছু আহার করে নদী পার হওয়ার চিন্তা করতে লাগলাম। নদীর ওপারেও সারি সারি পাহাড় ও বন-বনানী দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। আশ্রয় নেয়ার স্থান নেই। পাহাড়ী নদী হিসাবে নদীটি বেশ চওড়া ও খরস্রোতা, পারাপারের কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা আমাদের ছামানা পত্র নিয়ে আস্তে আস্তে নদীর কূল ঘেঁষে এগিয়ে চললাম।

কয়েক ঘন্টা চলার পর আমরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমাদের পদযুগল আমাদেরকে নিয়ে এক কদমও চলতে রাজি নয়। অগত্যা বৃহদাকারের একটি মহিরুহের নিচে বসে গেলাম। ওযায়েভ আমাকে লক্ষ্য করে বলল, "খোবায়েব ভাই! আমরা তো লোক তিনজন, এর মধ্যে আমাদের একজন আমীর নিযুক্ত করা একান্ত জরুরী। পরামর্শ করে কাজ করা সুন্নত। এতে খায়ের ও বরকত হয় অধিক। চলুন, আমরা একজন আমীর নিযুক্ত করি।" আমি বললাম, তা অবশ্যই

সত্য। তাই এখন থেকে আপনিই হলেন আমীর। আমরা আপনাকে মেনে কাজ করব।

আমার কথা শুনে ওয়ায়েভ তেলে-বেগুলে জ্বলে উঠল এবং বলল, "খোবায়েব ভাই! আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আলেম, কুরআন-হাদীসের জ্ঞান রাখেন, তাছাড়া নির্ভীক রণকৌশলী অকুতোভয় সালার। অন্যদিকে, জিহাদের লাইনে আপনার ত্যাগ-তিতীক্ষা আর কুরবানীর তুলনা হয় না। এসব দিক দিয়ে আপনার ফযিলত অনেক বেশী। কাজেই আপনি হলেন আমাদের আমীর। আমরা আপনার হাতে জিহাদের বাইয়াত নেব এবং আপনার কমান্ডে জিহাদ করব। আমি নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের পীড়াপীড়িতে দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং দু'জন থেকে জিহাদের বাইয়াত নিলাম এরপর প্রয়োজনীয় কিছু নসিহত করে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলাম।

দায়িত্ব এত কঠিন কাজ তা আমি এর আগে জানতাম না। এখন আমি হাড়ে-হাড়ে, রগে-রেশায় টের পাচ্ছি, দায়িত্ব কাকে বলে! ভয়ে আমার শরীর কুঁজো হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় সপ্ত আকাশ ভেঙ্গে আমার মস্তকে পতিত হয়েছে। কারণ, এটা পিকনিক পার্টির আমীর নয়, নয় খেলার পার্টির। ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হল জিহাদ। একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ এবাদতের নাম হল জিহাদ। যে এবাদাত আদায় করতে গিয়ে জান যায়, মাল যায় ও দুশমনের হাতে বন্দী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এখানে আমার সামান্য ভুলের কারণে একজন মুজাহিদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। মাল ছামানা বিনষ্টসহ এলাকা বিরান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একজন আমীরের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যদি এমনটি হয় তাহলে তো লাভের চেয়ে লোকসান বেশী হবে। এসব চিন্তায় অস্থির হয়ে সেজদাবনত মস্তকে রোদন করতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর উছায়েদ আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, "খোবায়েব ভাই! আপনি এত বিচলিত হলে কি চলবে? এসব চিন্তা আমি অনর্থক মনে করি। কারণ আমরা কোন একটি কাজ পরামর্শ ছাড়া করব না। চিন্তা ফিকির করে, এস্তেখারা করে যদি আমরা সিদ্ধান্ত নেই তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ মদদ আর সাহায্য করবেন।" তিনি আরো বলেন যে, "বর্তমান যামানায় জিহাদী পশ্চম উঁচিয়ে আমাদের নেতৃত্ব দিতে আসবেন না খালিদ বিন ওলীদ, মোহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন যিয়াদ, সালাহউদ্দীন আয়ুবী, আনোয়ার পাশা, ইমাম শামিল প্রমুখ দিগ্বিজয়ী মুজাহিদগণ। আমাকে আপনাকে এ মিশন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।" তিনি আরো বলেন—

"খোবায়েব ভাই! যেসব উলামায়ে কেরামগণ মুজাহিদদের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখতেন কেউ তো আর জীবিত নেই, সবাইকে শহীদ করে দিয়েছে। বর্তমানে যারা মসজিদ, মাদ্রাসা আর খানকা নিয়ে আছেন তারা তো তাদেরই কেনা গোলাম। বলসেবিকরা যা হুকুম করে ওরা তাই পালন করে। কাজেই জিহাদী মিশনের নেতৃত্ব দেয়ার মত আলেম আর পাবেন না। আপনি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সামনে এগিয়ে চলুন, আল্লাহ্র নুসরত পাবেন।"

উছায়েদের প্রবোধবাণী শুনে আমার অন্তরে অনেকটা শান্তি অনুভব করছিলাম। এখন আমরা পরস্পর পরস্পরের পরিচয় নিতে লাগলাম। কার বাড়ী কোথায় তা জানা ছিল না। আমি প্রথম আমার পরিচয় এভাবে দিলাম যে, আমার নাম খোবায়েব, বাড়ী জামবুল, পিতা ছিলেন আলমাআতা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিচালক। বলসেবিকরা তাঁকে শহীদ করে দিয়েছে। মাতাও বেঁচে নেই। বর্তমানে আমি নিজের জন্য শাহাদাৎ খুঁজে বেড়াচ্ছি। অপর একজন বললেন, "আমার নাম ওয়ায়েভ, পিতা বরকতুল্লাহ্, বাড়ী উযগান, পিতা মাতা কেউ নেই। আমি আনোয়ার পাশার একজন নগণ্য সালার ছিলাম, বর্তমানে আপনার একজন অধীন সৈনিক।"

অন্যজন বললেন, "আমার নাম উছায়েদ, পিতা আব্দুল করিম দামলা, বাড়ী নিমনগান। পিতা মাতাসহ পরিবারের ১৭ জনকে শহীদ করে দিয়েছে। আমিও ছিলাম আনোয়ার পাশার শাগরিদ ও সালার। বর্তমানে আপনার অধীনস্ত সৈনিক।

এভাবে পরস্পর পরিচিত হওয়ার পর নদী পার হয়ে ওপারে কিভাবে যাওয়া যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলাম। ওয়ায়েভ বলল, ওপারের অবস্থা কি তা আমাদের কারো কিছু জানা নেই। নেই পথ ঘাট চেনা। আমাদের জন্য এপার ওপার সবই সমান। তবে ওপারে যেতে পারলে একটু নিরাপদ বেশী মনে করি। কিন্তু এত স্রোত বেয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। চলুন, আরো একটু উজানে গিয়ে দেখি নদীর প্রশস্ততা ও গভীরতা কতটুকু বা পারাপারের অন্য কোন উপায় হয় কি-না! উক্ত প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম। উছায়েদ বললেন, "মুহ্তারাম! আমাদের নিকট রুশী সৈন্যদের পোশাক রয়েছে। এগুলো পরে নিলে মনে হয় ভাল হয়।" আমি বললাম, পোশাক তো আমার নিকটও আছে। ঠিক আছে চল পরে নেই। অতঃপর সবাই মুজাহিদদের পোশাক পাল্টিয়ে বলসেবিকদের পোশাক পরলাম। আমার পোশাক দেখে উছায়েদ আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, "আরে এতো জেনারেল নিকুলায়েভ দিমাগার পোশাক দেখছি। বাহ্! কত সুন্দর! দুশমনরা দেখলে আপনাকে স্যেলুট না দিয়ে পারবে না।" আমি আমার অস্ত্র ও কম্বলের

দিকে ইশারা করে বললাম, দেখ না এগুলোও তো তারই। এবার খুব সতর্কতার সাথে নদীর কূল ঘেঁষে উজানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

একটানা কয়েক ঘন্টা পথ চলার পর এক ঘন ঝোঁপের আড়াল থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে আসল, "স্যার! স্যার! আমরা এদিকে আছি।" আমরা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ আহ্বান কি দুশমনের পক্ষ থেকে আসছে না মুজাহিদদের পক্ষ থেকে তা মোটেই বুঝতে পারিনি। আমি সাথীদেরকে অস্ত্র ঠিক রাখার নির্দেশ দিলাম। প্রয়োজন হলে যেন সাথে সাথে ফায়ার করতে পারি।

অস্ত্র প্রস্তুত করতে করতে একজন কমিউনিস্ট সৈন্য ঝোঁপের অভ্যন্তর থেকে বাইরে এসে সামরিক কায়দায় স্যেলুট দিয়ে বলল, "স্যার! মনে হয় আমাদের খুঁজছেন, আমরা এখানে।" সৈন্যটি রুশী ভাষায় কথা বলছিল। আমিও রুশী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে তোমরা কতজন আছ?

"আমরা ২৮ জন।"

"যখমি কেউ আছে কি তোমাদের মধ্যে?"

"স্যার! বর্তমানে যারা এখানে আছে সবাই সুস্থ। যে কয়জন গুরুতর যখমি ছিল মেজর সাহেব তাদেরকে খঞ্জরের আঘাতে হত্যা করে ফেলেছেন।"

"তুমি আমাকে কি করে চিনলে?"

"স্যার! চেনার জন্য তো আপনার পোশাকই যথেষ্ট।"

"এর আগে আমাকে দেখেছ?"

"স্যার! যুদ্ধের আগে প্যারেডগ্রাউন্ডে সৈন্য বিন্যাসের সময় আপনাকে দেখেছি এবং আপনার তেজদীপ্ত ভাষণ শুনেছি।"

সৈন্যটির কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে, সে আমার পোশাক দেখে গোলক ধাঁধাঁয় পড়েছে। অতঃপর আমি বললাম, তোমরা পাঁচজন ছামানার কাছে থাক আর বাকীরা আমার সাথে আস। সৈন্যটি গিয়ে তার সাথীদের বলল, "জেনারেল নিকুলায়েভ দিমাগা পাঁচজন ছাড়া সবাইকে ডাকছেন। সাথে সাথে নিরস্ত্র ২৩ জন সৈন্য বেরিয়ে এল। আমরা ওদেরকে গিরি কন্দরে ঢুকিয়ে খঞ্জরের সাহায্যে একজন একজন করে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর উক্ত ঝোঁপের অভ্যন্তর থেকে একজন একজন করে ডেকে এনে বেঁধে ফেললাম এবং উক্ত স্থান থেকে একটু দূরে নিয়ে হত্যা করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম। এখানেও গনিমত হিসাবে বেশ অস্ত্র-শস্ত্র হাতে এল। অতঃপর আরো একটু সামনে গিয়ে দেখলাম নদী অনেকটা অগভীর ও স্রোতও বেশ কম। সেদিক দিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলাম।

॥ পাঁচ ॥

আমরা এত সহজে নদী পাড়ি দিতে পারব তা কখনো ভাবতে পারিনি। আমরা যেদিক দিয়ে পাড়ি দিয়েছি তা নদীর উৎসমূল। কয়েকটি ঝর্ণার সমন্বয়ে এ নদীর সৃষ্টি হয়েছে। আমরা শুধু পাথরের উপর পা রেখে পাড়ি দিয়েছি।

নদী পাড়ি দিয়েছি বটে কিন্তু পবর্তমালা পাড়ি দিব কি করে তা নিয়ে ভাবছি। কারণ দূরবীন দিয়ে উপরের দিকে তাকালে পর্বত চূড়াগুলোকে দেখা যায় যে শ্বেত পাগড়ী বেঁধে ধ্যানে মগ্ন কোন তপস্বী। ঘন বন বনানী আর লতা গুল্মে ভরা। চলার পথে কেবলই বাধার সৃষ্টি করে। তুষার ঢাকা প্রস্তর খণ্ডে পা রাখার সাথে তোলারাশির মত ছুটাছুটি আরম্ভ করে। যতই দুর্গম হোক চলতেই হবে। এখানে থাকা তো আর সম্ভব নয়। ছোটবেলায় লোকমুখে শুনেছি, তুষারাঞ্চলে প্রচুর শ্বেত ভল্লুক রয়েছে। এরা নাকি খুবই হিংস্র। মানুষ পেলে নাকি ওরা খুব মজা করে খেলা করে ও মেরে ভক্ষণ করে।

ভয়ে সকলেরই গা ছমছম করছে। তুষারের উপর দিয়ে পথ চলা যে এত কঠিন তা আগে বুঝতে পারিনি। শুধু যে ঠাণ্ডা তা নয় পিচ্ছিলও অনেক বেশী। ২০/৩০ গজ পথ চলতে না চলতেই রক্ত জমাট হয়ে যায়। তখন তাড়াতাড়ি কোন বৃক্ষ শাখে উঠে বিশ্রাম নিতে হয়। প্রায় তিনদিন ধরে এ তুষারাঞ্চল পাড়ি দিয়ে উষ্ণাঞ্চলে এসে পৌছলাম। এখনো লোকালয়ের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের খানা-পিনা সব ফুরিয়ে গেছে। অনাহারে প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত।

উছায়েদ লোলিত কণ্ঠে বললেন, "খোবায়েব ভাই! আমি আর চলতে পারব না।" এই বলে অবোধ বালকের ন্যায় হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললেন। ওকে খেতে দেয়ার মত আমাদের নিকট কিছুই ছিল না। অবশেষে গাছের কচি পাতা চিবায়ে রস পান করে জীবন বাঁচাল। ওর দেখাদেখি আমরাও তাই করলাম। এভাবেই পথ চলছি।

এভাবে আরো দু'তিন দিন শুধু কচি পাতার রস খেয়ে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু চতুর্থ দিন সকলেরই পেট খারাপ হয়ে গেল। একটু পরপর পাতলা পায়খানা হতে লাগল। পাতলা পায়খানায় আমরা সবাই মরণাপন্ন। কোন ঔষধও আমাদের নিকট ছিল না। ওয়ায়েভ বললেন, "খোবায়েব ভাই! আমরা শেষের দিকে যেসব পাতা খেয়েছি, তা মনে হয় বিষাক্ত ছিল। খাওয়ার সময় কেমন যেন ঝাঁঝালো লাগছিল।" আমিও চিন্তা করে তাই মনে করলাম।

এখন আমরা একদম দুর্বল হয়ে পড়ে রইলাম। এখানেই আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। আর কোথাও যাব না তা স্থির করলাম। সবাই তাওবা এস্তেগফার পড়ে আযরাঈলের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলাম। এক সময়

আমরা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি এক বৃদ্ধ নীলগাভী দোহন করে দুধ এনে আমাদের পান করালেন এবং বললেন, "এ দুধে তোমাদের পাতলা পায়খানা বন্ধ হবে, শরীরে বল পাবে, এমনকি দু'তিন দিনের মধ্যে ক্ষুদ-পিপাসাও টের পাবে না।"

স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। খোদার রহমতে পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করতে লাগলাম। পেটের পীড়া সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল। উনারাও ঘুম থেকে জেগে একই কথা বলতে লাগলেন। এ অলৌকিক ঘটনার পর আমরা পূর্ণ সুস্থ এবং সবল হয়ে গেলাম। অতঃপর আবার পথ চলতে লাগলাম। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার ক্ষুদ-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ি। যখন সবাই চলতে অক্ষম হয়ে পড়লাম, তখন আল্লাহ্র দরবারে দু'-দু'রাকাত নামায পড়ে দোয়া করলাম। অতঃপর চেয়ে দেখি এক পাল বন্য ছাগল হয়ত নেকড়ের তাড়া খেয়ে আমাদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা তা থেকে একটি ছাগল পাকড়াও করে জবাই করলাম। অতঃপর গোস্ত তৈরী করে আগুনে পুড়িয়ে আহার করলাম। উক্ত ছাগলে ৪/৫ দিনের আহার হয়ে গেছে।

এ ধরনের কষ্ট করতে করতে আমরা তিন সপ্তাহে লোকালয়ের সন্ধান পেলাম। আমরা যে এলাকায় প্রবেশ করেছি, সে এলাকার নাম মার্ডবার্গ। মার্ডবার্গ এককালে ছিল প্রাচীনতম মুসলিম জনপদ। এখানে ছিল বড় বড় মসজিদ ও ইসলামী বিদ্যাপীঠ। জার নেকুলাই এর শাসনামলে উক্ত শহরটি ধ্বংস করে দিয়েছে। কারণ এটা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। জারশাহীকে মার্ডবার্গের মুসলমানরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। জার নেকুলাই তার রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জন্য এবং মুসলিম বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য একদিন রাতের আঁধারে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও বিপুল পরিমাণ গোলা-বারুদ আর কামান নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় উক্ত জনপদ ধ্বংস করে দেয়। কামানের সাহায্যে বড় বড় দালান-কোঠা আর ঘর বাড়ী মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। বর্তমানে মার্ডবার্গকে বলা হয় কুরগান। কুরগানের অধিবাসীরা ৯৭ ভাগ ছিল খৃস্টান। খৃস্ট ধর্মযাজক বা ধর্মীয় নেতা ফাদার যোহন এবং অপরাপর খৃস্টানরা কমিউনিস্টদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। কারণ কমিউনিস্টরা বলত ধর্ম বলতে কিছু নেই। ধর্মীয় অনুশাসন মানা তো দূরের কথা ওরা ধর্মকেই বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্ বিশ্বাস করে না।

এ কারণেই ফাদার যোহনসহ কুরগানের খৃস্ট জনগণ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। আমরা একজন রাখালের নিকট থেকে কুরগানের সার্বিক অবস্থা জেনে নিয়েছি। ফাদার যোহনের চিন্তা চেতনা ও মন-মানসিকতা জানতে

চাইলে রাখাল বলল, "ফাদার খুব দয়ালু মানুষ। তিনি মুসলিম মুজাহিদদের ভালবাসেন। তাঁরও ইচ্ছা যিশু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ক্রোসেড করা। কিন্তু পারতেছে না।"

"ফাদার কোথায় থাকেন?"

"প্রধান গির্জায়।"

"বয়স কত?"

"ষাট এর কোঠায়।"

"তিনি কি পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানে থাকেন?"

"তা ঠিক বলতে পারছি না।"

"তিনি কি এ এলাকার বাসিন্দা?"

"না, তিনি ধর্ম প্রচারে ইংল্যান্ড থেকে এখানে এসেছেন।"

"কত বৎসর আগে এসেছেন তিনি?"

"তা সঠিক বলতে পারব না, তবে ৩০ বৎসরের কম হবে না। কারণ আমি ছোট বেলা থেকেই তাকে দেখে আসছি। বর্তমানে আমার বয়স ২৫ বৎসর।"

"আয়ের উৎস কি উনার?"

"গির্জার নামে প্রচুর ওয়াক্ফকৃত জমি আছে। তাছাড়া মিশনের নামে প্রচুর অর্থ আসে ইংল্যান্ড থেকে।"

"গির্জার পরিচর্যায় কতজন ভক্ত থাকেন এখানে?"

"প্রায় ত্রিশজন।"

"এরা সবাই কি ফাদার?"

"না, বড় ফাদার একজন, আর দু'জন সহকারী। বাকিরা কর্মচারী। এদের মধ্যে রাখাল, দারোয়ান, বাবুর্চি, বাগান চৌকিদার, ফসল রক্ষক ও মুবাল্লিগ।"

"মনে হয় সবাই পুরুষ তাই না?"

"না, মেয়েরাও আছে। তারা প্রভু যিশুর সন্তুষ্টিকল্পে গির্জাবাসী হয়েছে। তারা জীবনে কোন পুরুষকে বিয়ে করবে না। প্রভু যিশুর জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে।"

রাখালের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আমরা আরো একটু পথ এগিয়ে গিয়ে পরামর্শের জন্য একটি বিটপী মূলে বসলাম। আমরা কিভাবে ফাদার যোহনের নিকট যেতে পারি তা নিয়ে পরামর্শ চাইলে ওয়ায়েভ বললেন, তাদের নিকট যেতে হলে প্রথমেই আমাদের গা থেকে সামরিক পোশাক খুলে ফেলতে হবে। তারপর মুজাহিদদের উর্দি পরে দেখা করতে হবে। পরিস্থিতি যদি

প্রতিকূলে চলে যায় তাহলে অন্য কোন চিন্তা না করে ব্রাশ ফায়ারে গির্জা রঞ্জিত করে দিতে হবে। এটা আমার পরামর্শ। এখন হযরতের মর্জি।"

উছায়েদও এই পরামর্শে একমত প্রকাশ করল।

অতঃপর আমরা সেনাবাহিনীর পোশাক খুলে মুজাহিদদের পোশাক পরে, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে প্রায় গির্জার নিকট পৌঁছে গেলাম। তারপর পাদ্রীর এক সহচরকে ডেকে বললাম, আমরা মুসলিম মুজাহিদ। ফাদারের সাথে সাক্ষাত্ করতে এসেছি যদি অনুমতি হয়। উক্ত লোকটি পাদ্রীর নিকট আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বলেন, "সাক্ষাতের অনুমতি অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু বিপদ মুক্ত নয়। কারণ, আমার এখানে বলসেবিকদের গোয়েন্দা আছে বলে মনে হয়। আজ তিনদিন যাবৎ এক যুবক খৃস্টান পরিচয় দিয়ে গির্জার করিডোরে প্রার্থনায় রত। একে খুব সন্দেহ হচ্ছে। তুমি এদেরকে নিয়ে মেরী গমেজের গির্জায় চলে যাও। সেখানে ওদের খানা-পিনা ও থাকার ব্যবস্থা করে দিবে। ওরা যেন মেরী গমেজের অন্তপুরে অর্থাৎ খাস কামরায় অবস্থান করেন। বাইরে হাঁটা হাঁটি করা ঠিক হবে না। আমি সুবিধামত ২/১ দিনের মধ্যে তাদের সাথে রাত্রে দেখা করব।"

সংবাদবাহক লোকটি এসে বললেন, "আমাদের মাননীয় ফাদার নিজেই আপনাদের সাথে সাক্ষাত করবেন, তবে এখানে নয়। আপনাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন। চলুন, জলদি চলুন।" আমরা এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম।

পায়ে চলা মেঠো পথ, আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে বহু দূর। আমরা সে পথ বেয়েই চলছি। ঝোঁপ-ঝাড় ও টেক-টিলায় ভরপুর। এভাবে চলতে চলতে এক অরণ্যে প্রবেশ করলাম। এখানেই মেরী গমেজের গির্জা। মেরী গমেজ একজন ইংল্যান্ডি খৃস্টান যুবতী। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি এত দূরে এসে গির্জা নির্মাণ করেছেন। গির্জায় বসবাসকারী সব ভক্তদের খানা পিনার ব্যবস্থা তিনিই করেন। গির্জাটা যদিও ছোট কিন্তু দেখলে নয়ন কেড়ে নেয়। দুর্গম এলাকা হওয়ার কারণে এখানে লোকের সমাগম কম।

রাহাবর মেরীর নিকট আমাদের পরিচয় করিয়ে ফাদারের নির্দেশ শুনিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি আমাদের নিয়ে গেল তার খাস কামরায়। অতঃপর খাদেমাকে ডেকে চা-নাস্তার হুকুম দিলে, খাদেমা চা নাস্তা হাজির করল। আমরা নাস্তা করার সাথে সাথে খাদেমা এসে বলল, "জনাব! আপনাদের উপর নির্দেশ গোসল করার। হাম্মামখানায় পানি আপনাদের অপেক্ষা করছে। এর মধ্যে মেরী গমেজ এসে একই কথা বলল যে, "আপনারা বহু দূর থেকে সফর করে

এসেছেন, ক্লান্তির ছাপ চেহারা থেকে এখনো দূরীভূত হয়নি। গোসল সেরে বিশ্রাম নিলে ক্লান্তি অনেকটা দূর হবে।"

আমরা গোসল করতে হাম্মামখানায় চলে গেলাম। গোসলের জন্য দেয়া হয়েছে গরম পানি। আমরা মনের আনন্দে একজন একজন করে গোসল করলাম। অতঃপর রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিলাম।

গরম পানিতে গোসল করাতে যে কি আরাম অনুভব করছিলাম তা প্রকাশ করার সাধ্য কারো নেই। একটানা বিকাল চারটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে জাগ্রত হয়ে দেখি ওয়ায়েভ এখনো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন আর আমাদের পাশে উপবেশন উছায়েদ ভাই। চোখ দুটি তার লোহিতবর্ণ। তার অবস্থা দেখে বড়ই মায়া লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে ঘুমাওনি?

"মাফ করবেন হযরত! আমি ইচ্ছা করেই জেগে আছি। কারণ অস্ত্র-শস্ত্র এভাবে রেখে ঘুম যাওয়া মুনাছেব মনে করিনি, কার ভিতর কি আছে কে জানে? খোদা না করুক যদি কোন অঘটন ঘটে যায়! তাই জাগ্রত রয়েছি।"

উছায়েদের হুঁশিয়ারী ও বিচক্ষণতা দেখে প্রাণ খুলে তার জন্য দোয়া করলাম। আমি আমাকে তিরস্কার করতে করতে বললাম, "খোবায়েব! তুই আমীর বনে ঘুমাচ্ছিস, আর তোর সাথী তোদের হেফাজত আর মালের হেফাজতের জন্য অঘুম নয়নে পাহারা দিচ্ছে। এখন যে পাহারা দিতে হবে তা তোর কল্পনার জগতেও ছিল না। তোর মত গাফেল আর আহাম্মক দ্বারা দ্বীনের কি ফায়দা হবে? এ কাজটিও ছিল তোর। তা তো আদায় করলে না, এরজন্য আল্লাহ্‌র নিকট কি জবাব দেবে?"

এ ধরনের ভর্ৎসনা করে আত্মাকে সামান্য মালামাত করে ওয়ায়েভকে জাগালাম। এর মধ্যে পরিচারিকা খানা এনে হাজির করল। আমরা তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করে আহার করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলাম। অতঃপর আমরা দু'জন জেগে রইলাম আর উছায়েদকে ঘুমানোর সুযোগ করে দিলাম। উছায়েদ ঘুমিয়ে গেলেন।

আমরা যে রুমে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম সে রুমের এক পার্শ্বে মেরী গমেজের বিছানা, অপর পার্শ্বে আমাদের জন্য করা বিছানা। মধ্যে কোন আড়াল নেই। এখানে অবস্থান করা বা বিশ্রাম নেয়া খুবই সংকোচবোধ করছিলাম। কিন্তু তাছাড়া আর কোন উপায় তো নেই।

মেরী গমেজ ২০ বৎসর বয়সের সুন্দরী যুবতী। মন কেড়ে নেয়া চেহারা। পিংগল বর্ণের চোখ আর ফ্যাকাশে চিকুর ছাড়া কোন খুঁত পাবে না তার দেহ বল্লরীতে। যৌবন জোয়ার দেহের কানায় কানায় ভরপুর। সে কেন হাজার হাজার

মাইল দূরে এসে এ বিজন বনে গির্জা তৈরী করে অবস্থান করছে তা বোধগম্যের বাইরে। এখানে যারা আসা যাওয়া করে প্রায় সবাই যুবক। আসলেই কি ধর্ম প্রসারের জন্য এখানে এসেছে না অন্য কোন মতলব নিয়ে তা কে জানে?

মেরী গমেজ তার খাটে উপবেশন। তিনজন যুবক খাটের কাছে হাঁটু গেড়ে নতশীরে বসে আছে। মেরীর সম্মুখে শোভা পাচ্ছে তাদের ধর্ম গ্রন্থ বাইবেল। মেরী তার শিষ্যদেরকে বাইবেল পড়ে পড়ে বুঝাচ্ছে। বাইবেলটা ছিল লেটিন ভাষায় লেখা। অনুবাদ করেছে রুশী ভাষায়। বাইবেল পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যুবতী অপাঙ্গে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করছে। আমি বাইবেল শোনার সুবাদে মাঝে মধ্যে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। এর মধ্যে প্রায় ৩/৪ বার চার চোখের মিলন হয়ে গেল। আমি বার বারই লজ্জায় চোখ নিচে নিয়ে আসি।

যুবতী তার অনুসারীদেরকে বাইবেল পাঠ করে বুঝাতে লাগল যে, "প্রভু যিশু হলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। এ জন্যই তিনি মৃত মানুষকে জিন্দা করতে পারতেন, দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিদান, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান করতে পারতেন। ভক্তেরা বসে বসে মস্তক নেড়ে হাঁ হাঁ করতে লাগল।

এসব পাগলের প্রলাপ আমার বরদাস্ত হচ্ছিল না। আমি আমার আসন ত্যাগ করে আস্তে আস্তে তার টেবিলের নিকট গিয়ে বললাম, "জানার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি সিস্টার?"

"হ্যাঁ, ধর্ম সম্বন্ধে জানতে দোষ কি, বলুন।"

"সন্তান জন্ম দেয়া কি ভাল গুণ নাকি খারাপ?"

আমার প্রশ্নের উত্তর কি দেবে তা নিয়ে ফাঁপড়ে পড়ে গেল। তার তো বিয়ে হয়নি, সন্তানের কোন প্রশ্নই আসে না। সে মাথা চুলকাতে চুলকাতে লোলিত কণ্ঠে বলল, "সন্তান জন্ম দেয়া আমাদের ধর্মমতে দূষণীয় ও জঘন্য অপরাধ। তাই আমি কোন পুরুষকে বিয়ে করি না।"

"সন্তান জন্ম দেয়া যদি দূষণীয় বা অপরাধ হয় তাহলে আপনার আব্বা আম্মা যে অপরাধ করেছে আপনাকে জন্ম দিয়ে, এ হিসাবে আপনার আল্লাহ্‌ও তো অপরাধী যিশুকে জন্ম দিয়ে। দোষী ব্যক্তি কি করে আল্লাহ্ হতে পারে বলুন?"

আমার কথা শুনে মেরীর চেহারা পাণ্ডুর হয়ে গেল। এরপর কি বলবে না বলবে তা স্থির করতে পারছে না। কি যেন চিন্তা করে একটু পর বলল, "সিদ্ধ পুরুষের জন্য এসব ঠিক নয়। খোদাওয়ান্দের জন্য ও সাধারণ মানুষের জন্য ঠিক।"

অতঃপর আমি বললাম, "সিস্টার! খোদাওয়ান্দের জন্য যদি এটা ঠিক হয় তাহলে বলব এত শক্তিশালী খোদা মাত্র একজন সন্তান জন্ম দিল কেন? এতে

তো খোদার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কেননা সাধারণ মানুষ সন্তান জন্ম দেয় ১ থেকে ১২-১৪ জন। সে হিসাবে খোদাওয়ান্দ দিলেন মাত্র একজন। এমন দুর্বল ব্যক্তি খোদা হলেন কি করে?"

আমার কথা শুনে মেরীর সুন্দর মুখশ্রীখানা মলিন হয়ে গেল। তার মুখ থেকে একটি কথাও বের হল না। লজ্জায় মাথা নত করে বসে রইল। এক পর্যায়ে ভক্তদের বিদায় দিয়ে সে শয্যা গ্রহণ করল। আমি এসে আমার খাটে আসন গ্রহণ করলাম। এভাবে দিবস কেটে গেল। আমরা মাগরিবের নামায আদায় করলাম। পরিচারিকা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল পুষ্পকাননে। সেখানে রয়েছে পাশাপাশি দুটি চেয়ার আর মধ্যে একটি টেবিল। একটি চেয়ার দখল করে মেরী বসা। আমি অপর চেয়ারে বসলাম। মেরী মুচকি মুচকি হেসে বলল, "আজ আমি তোমার নিকট হেরে গেছি, তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দেয়া হবে।" এ ধরনের আরো কিছু আলাপের পর রুমে ফিরে আসি।

॥ ছয় ॥

রাত পোহায়ে ভোর হল, ফাদার যোহন এখনো আসেননি। খবর পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে অবস্থান নেয়া কতটুকু নিরাপদ তা স্থির করতে পারছি না। তাছাড়া গির্জাপতি মেরী গমেজের সাথে হল কথা কাটাকাটি, এতেও অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে। চিন্তা ও পেরেশানিতে সকলেরই মন খুব খারাপ।

মেরী গমেজ আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছ, এখন তোমরা আমার মেহমান। তোমাদের সেবা করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। তাছাড়া আমাদের প্রধান ফাদার তোমাদেরকে আমার আশ্রয়ে প্রেরণ করেছেন, এতেও তোমাদের সেবা করা আমার নৈতিক কর্তব্য। তোমরা অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছ, ক্লান্তিজনিত দুর্বলতা এখনো কাটেনি। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে এখানে থাক, খাও, ঘুমাও ও বিশ্রাম নাও। কোন চিন্তা করো না। আমরাও তোমাদের মত কমিউনিস্টদের অর্থাৎ নাস্তিকদেরকে দেখতে পারি না। ধর্ম যদিও ভিন্ন, কিন্তু চিন্তা অভিন্ন। আমরা যদি তোমাদের কোন উপকার না করতে পারি তবে অপকার করব না। তোমরা কোন চিন্তা করো না, আমাদের ফাদার নিশ্চয় আসবেন।"

মেয়েটির কথা শুনে আমরা অনেকটা চিন্তামুক্ত হলাম। তার কথা সত্য বলেই মনে হল।

গির্জার যুবকরা এসে আমাদের নিকট ভীড় জমাল। আমরা তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ আলোচনা করলাম। তাদের কথার দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এরা বিদ্রোহী। কমিউনিস্টরা তাদের চক্ষুশূল। এক যুবক আমার নিকট প্রশ্ন করে জিহাদ সম্পর্কে জানতে চাইল। আমি পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, জিহাদের ফাযায়েলগুলো বর্ণনা করলাম। তাছাড়া জিহাদের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও খোদায়ী নুসরত ও মদদের কাহিনী শোনালাম। সে সময় মেরী গমেজও এক পাশে দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলো গভীরভাবে শুনছিল। এক যুবক বলে উঠল, "তাহলে আমাদের ধর্মের চেয়ে ইসলামই অধিক সত্য বলে মনে হয়। অপর এক যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "মুজাহিদ বন্ধু! আমরা যদি আপনাদের সাথে মিশে বলসেবিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি তাহলে নেবেন কি?"

"মানুষের জানের শত্রু হল সাপ। উক্ত সাপকে চাই মুসলমানে হত্যা করুক চাই খৃস্টান করুক, পুরুষে করুক চাই মহিলায় করুক, ছেলে করুক চাই মেয়ে করুক। হত্যা করলে সকলেরই উপকার হবে। শত্রুকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হত্যা করার দরকার। অপরদিকে বলসেবিকরা যেমনিভাবে মুসলমানদের শত্রু ঠিক তেমনিভাবে খৃস্টানদেরও শত্রু। এদেরকে হত্যার জন্য যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন বা সহযোগিতা করেন তাহলে আপত্তির কি থাকতে পারে? আসুন আমরা দেশ ও ধর্মকে বাঁচানোর জন্য দুশমনের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। দুশমন নিপাত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি।"

আমার কথা শুনে মেরী গমেজ আনন্দে নেচে উঠল এবং বলল, "মুজাহিদ ভাই! যুক্তি অকাট্য ও মহা মূল্যবান। আমি সর্বদিক দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। আমার যতগুলো অনুসারী আছে সবাইকে তুমি প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে নিয়ে যাবে। আর তোমাদের টাকা-পয়সা যা প্রয়োজন হয় তা মিশন থেকে দেয়া হবে। ফাদার আসলে তিনি চূড়ান্ত ফায়সালা দিবেন।"

এসব আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দিবস কেটে গেল।

এতক্ষণে সূর্য তার চিরাচরিত অভ্যাসানুযায়ী রক্তিম আভা ছড়িয়ে গাছ-গাছালির উপর দিয়ে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। স্নিগ্ধ সমীরণ সন্ধ্যার আগমনী বার্তা নিয়ে শন্ শন্ আওয়াজ তুলে দিগ-দিগন্তে ছুটে চলছে। পাখীরাও কিচির-মিচির গান গেয়ে আপন আপন নীড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। গির্জায় টানানো বড় বড় ঘন্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠছে। সন্ধ্যার প্রার্থনাকারীরা গির্জাভিমুখে ছুটে চলছে। আমরাও গির্জার অদূরে পুষ্পকাননের এক কোণে দাঁড়িয়ে আযান দিয়ে নামায আদায় করলাম। গির্জার পূজারীরা আমাদের আযান শুনে চুপি চুপি

আমাদের নামায অবলোকন করছে। আমরা এশার নামায পড়ে খানাপিনা সেরে শয্যা গ্রহণ করলাম।

রাত আনুমানিক একটার দিকে প্রধান ফাদার যোহন একজন সঙ্গী নিয়ে মেরীর রুমে হাজির হলেন। মেরী আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল, "বন্ধু! তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ও আমাদের মহান ধর্মগুরু চলে এসেছেন। তোমরা জলদি আলাপ শেষ কর। তিনি এখনই চলে যাবেন।"

আমরা প্রথমেই কুশল বিনিময় করে খুব আদবের সাথে আমাদের পরিচয় দিলাম। আমার নাম শোনার সাথে সাথে পাদ্রী চমকে উঠে বললেন, "আপনি কি সেই খোবায়েব! যার মাথার মূল্য লেলিন ঘোষণা দিয়েছে ৩০ লক্ষ ডলার?"

পাদ্রীর কথার কোন উত্তর আমার নিকট মওজুদ ছিল না। কারণ আমাকে নিয়ে যে বাইরে এ ধরনের তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে তা আমি কোনদিন জানতাম না। আমার নিরবতায় পাদ্রী আবার জিজ্ঞাসা করলেন—

"কি? কিছুই বলছেন না যে?"

"কোন খোবায়েবকে নিয়ে এমন ঝড়ো হাওয়া বইছে তা আমার জানা নেই।"

"আপনি ছাড়া আরো কোন খোবায়েব আছে?"

"তা-ও জানা নেই।"

এসব আলাপ-আলোচনার পর পাদ্রী বললেন, "তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও, সব ধরনের সাহায্য করে যাব। তবে আমাকে কিছুতেই প্রকাশ করবে না। বর্তমানে আমার উপর খুব নজরদারী চলছে। একজন লোক আমার এখানে আজ তিনদিন যাবৎ অবস্থান করছে। আমার সবকিছুর উপরই নজর চলছে। মনে হয় ও বড় ধরনের গোয়েন্দা হবে।"

পাদ্রীর কথা শুনে আমি বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তার ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা নেব। আগামীকাল থেকেই এ্যাকশন আরম্ভ হবে। একবার তাকে একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন।"

পাদ্রী পরামর্শের পর চলে গেলেন। পরদিন সাধারণ বেশে ওয়ায়েভকে পাঠালাম। তিনি সব তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। আমরা পরদিন রাত্রে সামরিক পোশাক পড়ে গির্জা থেকে ফাদারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসি। তারপর তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়ে গোপন ওয়ারলেছ সেট, কাগজ পত্র ও পরিচয় পত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে পাহাড়ে জঙ্গলে নদীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিলাম। এ ঘটনা আমরা তিনজন ছাড়া আর কোন প্রাণীই জানল না। অপারেশন সেরে সাধারণ পোশাক পরে মেরীর গির্জায় চলে গেলাম।

॥ সাত ॥

মাহমুদা ও ছওদা, দু'জনেই প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ১৫০ জনের মধ্যে এ দু'জনই বেশী নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। তাদের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পত্র-পত্রিকায়ও তাদের ছবিসহ কৃতিত্বের কাহিনী ছাপা হয়েছে। উভয়েই এখন সরকারী হাসপাতালে নার্সের চাকুরী পেয়েছে।

মাহমুদার অন্তর থেকে এখনো আমার নাম-নিশানা মুছতে পারেনি। পারেনি জিহাদের তামান্না দূর করতে। মাহমুদার থাকা খাওয়া, চলাফেলা, কাজকর্ম ছওদার সাথে। ছওদা অনেকবারই মাহমুদাকে বুঝিয়েছে যে, দেখ বোন! তোমার মত নির্বোধ আর বোকা কে আছে? তুমি এমন একজন ছেলেকে ভালোবেসেছে যার কোন ঠাঁয়-ঠিকানা নেই। নেই সহায়-সম্পদ। তারপর সে একজন মুজাহিদ। থাকে পাহাড়-জঙ্গলে। জীবনের নেই কোন নিরাপত্তা। তুমি মনে মনে তাকে আপন করে নিয়েছ; সে তো তোমার প্রতি সামান্যতম অনুরাগী নয়। যদি তার অন্তরে তুমি বেঁচে থাকতে তাহলে অবশ্যই খোঁজ খবর নিতেন। এখনো তিনি জীবিত আছেন কি-না কে জানে? আমার তো মনে হয় কুকান্দুজের ধ্বংসলীলায় পতিত হয়েছেন তিনি। পত্রিকার ভাষ্যনুযায়ী সেখান থেকে কোন মুজাহিদ জীবন নিয়ে যেতে পারেননি। সেখানে শত শত রুশী ফৌজও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তিনি যদি বেঁচেও থাকেন তবে তো লোকালয়ে বের হবেন না। কারণ ইদানিং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে দেয়ার জন্য ৩০ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছে। অর্থলোভী মানুষরা তাকে পেলে ধরিয়ে দেবে। কাজেই এখনো সময় আছে বোন, তার চিন্তা তোমার অন্তর থেকে মুছে ফেল। তার আশায় আশায় থেকে জীবন ক্ষয় করার কোন অর্থ নেই। তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে রূপ-লাবণ্য দান করেছেন, তা ক'জন মেয়ের মধ্যে আছে? বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, রূপ-সৌন্দর্য কোনটার তো তোমার অভাব নেই। অনেক ভাল ঘরের উপযুক্ত ছেলেরা তোমার পাণীপ্রার্থী হবে। শরীফ স্যার (ডা. শরীফুল ইসলাম-এম.বি.বি.এস) মনে হয় আব্বার কাছে তোমার বিয়ের প্রস্তাব দেবেন। এর একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ছওদার কথা শুনে মাহমুদা তার অশ্রুসিক্ত আঁখিযুগল উড়নাঞ্চলে মুছতে মুছতে বলল, "বোন ছওদা! আজকাল তোমাকে একজন দার্শনিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ যেসব যুক্তি-পরামর্শ আর নীতিকথা তোমার মুখ থেকে বের হচ্ছে, তা অতীতে কোনদিন শুনিনি। খোবায়েব সম্পর্কে তুমি যেসব মন্তব্য করেছ তা সবই অর্থহীন। একজন মুজাহিদের মূল্য ৩০ লক্ষ ডলার নয়। এ বিশ্ব ভ্রাম্যগুলে যা কিছু আছে এর চেয়েও লক্ষ গুণ বেশী একজন মুজাহিদের দাম। তারা দুনিয়ার

ধন-সম্পদের লালসায় বা প্রতিপত্তির আশায় জিহাদ করে না। তারা আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র কলেমাকে বুলন্দ করার জন্য, আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করে। তাঁরা হলেন আল্লাহ্‌র সৈনিক, আল্লাহ্‌র খাস বান্দা। আল্লাহ্‌র নিকট তাদের মর্যাদা অধিক। তারা দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় আল্লাহ্‌র হুকুমতকে।

মাহমুদা আরো বলল, "বোন হুওদা! তুমি যে বলছ, তিনি আমাকে ভালবাসেন না, যদি সত্যিকার অর্থে ভালবাসত তাহলে এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে থাতে পারতেন না। অবশ্যই খোঁজ খবর নিতেন। এ ব্যাপারে তোমার ধারণা একশ ভাগ ঠিক। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দুটো কথা শোন, খোবায়েব একজন আল্লাহ্ প্রেমিক। আল্লাহ্‌র প্রেমানলে খোবায়েবের অন্তরের সমস্ত গায়রুল্লাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। আমার চেয়ে শতগুণ সুন্দরী নারীর মোহ থেকে তার অন্তর পবিত্র। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশ তাদের গতিরোধ করতে পারে না। কোন নারীর মোহ তাদের কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না। মুজাহিদদের শ্রমক্লান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্রের শ্লেষ্মাযুক্ত বালুকণার যে মূল্য আল্লাহ্‌র কাছে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মত মর্যাদাশালী হয়ে যায় তবু সে বালু-কণার মত হবে না। মুজাহিদগণ তাদের ঘোড়াকে যে খাদ্য ও পানীয় খাওয়ায় সে সব, যে মল-মূত্র ত্যাগ করে সেসব এবং যে সমস্ত স্থান জুড়ে দৌড়া-দৌড়ি করে সেসব স্থানের মাটি নেকির পাল্লায় ওজন করা হবে। অর্থাৎ জিহাদের নিয়তে যে ঘোড়া পালা হয় তাকে যা খাওয়াবে এবং উক্ত ঘোড়ার চনা-লেদা ও যে স্থানে দৌড়ায় সে এলাকার মাটিকে নেকি বানিয়ে মিযানে উঠানো হবে এবং সে সওয়াব মুজাহিদদের আমলনামায় দেয়া হবে। মুজাহিদদের তুলনায় নেক আমল অন্য কেউ কামাই করতে পারে না। যে মুজাহিদদের জন্য বেহেস্তের শত শত হুরেরা পাগল, সে মুজাহিদের জন্য আমি পাগল হব না কেন? আমার জীবন বিলিয়ে দিয়ে হলেও ভালবেসে যাব।"

হুওদা মাহমুদার কথা শুনে বলল—

"তুমি এত কথা কোত্থেকে শিখলে?"

"খোবায়েব ভাইয়া যে কয়দিন আমাদের এখানে ছিলেন সে কয়দিন তিনি শুধু জিহাদের আলোচনাই করতেন। কত শত প্রশ্ন করে কত কিছু শিখেছি তার কাছ থেকে।"

"তুমি না বলেছ তিনি ছায়েমাকে ভালবাসেন, তাকেই অন্তরে স্থান দিয়েছেন। অন্যের স্থান তুমি দখল করতে যাবে কেন? তাছাড়া একটু আগে তুমি

বলেছ যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসা ছাড়া মুজাহিদের অন্তরে অন্যের ভালবাসা নেই, তাহলে ছায়েমাকে....।"

"আপা! তুমি শুধু কথায় কথায় প্রশ্ন কর। তুমি তো আসল কথা জান না বা জানার চেষ্টাও কর না। ছায়েমার পিতা-মাতাকে বলসেবিকরা শহীদ করে দিয়েছে, তাঁকেও বেঁধে ওদের সাথে ফায়ার করেছিল। আল্লাহ্ তাকে বাঁচিয়েছেন। খোবায়েব লাশের স্তূপ থেকে তাকে উদ্ধার করেছেন। খোবায়েবও পিতা-মাতা ও বাড়ীঘর থেকে বঞ্চিত। দু'জনেই এখন মুজাহিদ। যুদ্ধ করে রাত দিন। এ অসহায় মেয়েটাকে কার হেফাজতে রাখবে বল? তাই মায়ের আদেশে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আসলে খোবায়েবের অন্তরে নারীর ভালবাসার চেয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসা বেশী।"

"বুঝলাম, তাহলে ছায়েমার পাত্রে তুমি হাত বাড়াও কোন দুঃখে? এটা কি ঠিক হবে?"

"সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। আবার দেয়াও ঠিক নয়। আমি একজন মুজাহিদকে ভালবেসে যাব। মুজাহিদের খেদমত করে যাব। স্ত্রী তার স্বামী থেকে যা যা পায় বা পাওয়ার আশা করে, সে সব চাওয়া পাওয়া বা হক আমি ক্ষমা করে দেব। আমি শুধু তার সাথে থেকে থেকে জিহাদ করব। জিহাদ করে করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাব। এটাই সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া।"

"হ্যাঁ, এতক্ষণে তোমার মুখ থেকে আসল কথা বেরিয়ে আসছে। তুমি একজন মুজাহিদের স্ত্রী হতে চাচ্ছ জিহাদের অভিলাষে, আর মুজাহিদকে ভালবাসছ জিহাদের স্বার্থে। মূল উদ্দেশ্য হল জিহাদ করা তাই না?"

"হ্যাঁ, এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।"

"বুঝলাম, এ চিন্তা থেকে তোমাকে সরানোর চেষ্টা করা বৃথা। তবে তার যে কোন সন্ধান নেই?"

"তিনি বিদায়ের পথে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি আসবেন। মুজাহিদরা মিথ্যা কথা বলে না। হয়ত জিহাদের প্রোগ্রামে খুব ব্যতিব্যস্ত, তা না হয় এতদিনে অবশ্যই আসতেন। আমি আমরণ তাঁর আগমনের পথ পানে চেয়ে থাকব।"

দু'জনের মধ্যে প্রায় সময়ই এসব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। মাহমুদা অনেক সময় রাতের নিরালায় একা একা বসে খোবায়েবকে নিয়ে জিহাদের প্রোগ্রাম তৈরী করে ও শত্রুর আস্তানায় হানা দিয়ে অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে ফিরে আসে। মাহমুদার অস্থির হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এসব কল্পনা করে থাকে। এতে সান্ত্বনা পায় প্রচুর। এসব চিন্তা করে কখনো বেলকুচিতে বসে, আবার কখনো

বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বের পুষ্পকাননের বিটপীমূলে বসে। এসব ভাবতে গিয়ে হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশে। এভাবে প্রেম বিরহের দাবানলে দিবা-নিশী জ্বলছে মাহমুদা। এদিকে নামায পড়ে পড়ে রোযা রেখে রেখে দোয়া করছে খোবায়েবের জন্য ও দেশের জন্য।

॥ আট ॥

কুকান্দুজের যুদ্ধটা ছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কোন মুজাহিদ সাথী বেঁচে আছেন কি-না তার কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই। এখন নতুন করে কোমর বাঁধতে হবে। সাথী তৈরী করে টিম গঠন করতে হবে। সময়ও লাগবে প্রচুর। এসব বিষয় নিয়ে আমরা পরামর্শে বসলাম। পরামর্শের জন্য সময় নির্বাচন করলাম রাত দু'টায় আর স্থান পুষ্পবাগান। দিন বিদায় নিল, রাত হল। আমরা অন্যদিনের মত খানা-পিনা ও নামায সেরে শুয়ে পড়লাম।

রাত দুটো। আমরা অযু এস্তেঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে বাগানে চলে গেলাম। চারদিক নিরব নিস্তব্ধ। ঠাণ্ডাও প্রচুর। শিশিরগুলো তুষার হয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরছে। আমরা জেনারেল নিকুলায়েভ দিমাগার কম্বলটি মুড়ি দিয়ে বসলাম। হামদ-নাতের পর আমাদের কর্মপদ্ধতি কি হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে ওয়ায়েভ ভাই বললেন—

"আমার পরামর্শ হল স্বেচ্ছায় কোন আক্রমণ না করা। কোথাও আক্রমণের সংবাদ পেলে আমরা খুব সতর্কতার সাথে সংবাদ নিয়ে দেখব কারা এ আক্রমণ করেছে। এভাবে সবগুলো গ্রুপের সাথে সারা দেশব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। নতুন নতুন সাথী সংগ্রহ করে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে জিহাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। দাওয়াতী কার্যক্রম খুব গোপনে চালিয়ে যাওয়া। মজবুত একটি গোয়েন্দা টিম গঠন করা। আগামী ছয় মাসের মধ্যে যদি আমরা একটি সীমায় পৌঁছতে পারি তাহলে আক্রমণের প্রোগ্রাম তৈরী করব। তা না হলে প্রয়োজনে আরো ছয় মাস বা এক বৎসর পিছিয়ে যাব। তবে আমাদের উপর যদি কোন আক্রমণ এসে যায় তাহলে পিছ পা হব না। এর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এগুলো আমার পরামর্শ।"

উছায়েদ বললেন, "আপনার চিন্তার সাথে আমিও একমত। তবে যেসব খৃষ্টানরা আমাদের সাথে জিহাদে শরীক হতে চায় তাদের ব্যাপারে আমার পরামর্শ হল, এরা আমাদের সাময়িক বন্ধু হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এরা আমাদের অবিসংবাদিত দুশমন। এরা তো অনন্যোপায় হয়ে আমাদের সাথে মিশে কাজ

করতে চাচ্ছে। সুযোগ বুঝে সর্প হয়ে দংশনও করতে পারে। এজন্য প্রথম থেকেই তাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।"

উছায়েদের কথা শুনে আমি বললাম, আপনার পরামর্শ খুবই সুন্দর, তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে; তা হল, দুশমন যদি ইসলামের সাথে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে গ্রহণ করতে হয়, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল ওরা যদি ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে আর আমাদের সাহচর্যে থাকে তাহলে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। ওরা তো কাছ থেকে ইসলামকে দেখার সুযোগ পায়নি। ওরা আমাদের কাছে অবস্থান করলে আর আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ দেখলে ইসলাম গ্রহণ না করলেও শত্রু থাকবে না। আমার কথায় ওরাও একমত হল। ওয়ায়েভ বললেন, "আমাদের কাজ আগামীকাল থেকেই আরম্ভ করা হোক।" এ কথায় সম্মতি জানিয়ে পুনরায় শয্যা গ্রহণ করলাম।

পরদিন মেরী গমেজ ২০ জন যুবককে নিয়ে গির্জার মধ্যে জরুরী পরামর্শ মিটিংএ বসে আমাদেরকে অংশগ্রহণের আবেদন জানালে, গির্জায় উপস্থিত হলাম। উক্ত মিটিংএ যুবকদের লক্ষ্য করে মেরী গমেজ বললেন, "সমস্ত প্রশংসা খোদাওয়ান্দ যিশুখৃস্টের। শান্তি বর্ষিত হোক অনুসারীদের উপর।"

প্রিয় যিশুর ভক্তবৃন্দ! আজ আমি ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তোমাদের নিকট কয়েকটি কথা বলতে চাই, আশা করি মন দিয়ে তা শুনবে। কমিউনিস্ট কর্তৃক সমস্ত ধর্ম আজ আক্রান্ত, কোন ধর্মই নিরাপদ নয়। মিস্টার লেলিন ধর্মকে আফিম বলে আখ্যায়িত করেছে। সে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে। এসব উপাসনালয়কে আস্তাবলে রূপান্তরিত করেছে। ইদানিং ওরা আমাদের গির্জার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। শুনেছি বেশ কয়েকটি গির্জাকে ওরা ক্লাবে ও অফিসে পরিণত করেছে। মুসলিম নিধনের সাথে সাথে এখন খৃস্টান নিধন আরম্ভ করেছে। ওরা প্রথমে ধর্মের উপর কোন আঘাত করেনি। লেলিন নিজেও এক সময় খৃস্টধর্মভীরু ছিল। খৃস্টজগত তাকে একজন দার্শনিক হিসাবে জানত। বর্তমানে সে কাফের হয়ে গেছে। প্রভু যিশুর অভিশপ্ত বান্দা।" তিনি আরো বলেন—

লেলিন বর্তমানে কয়েক ধাপ এগিয়ে প্রচার করছ, "সমাজে কিছু লোক আছে, তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের রুজী-রোজগারের ও আয়-ইনকামের পথ সুগম করেছে। ওরা বিনাশ্রমে ও বিনা পুঁজিতে ব্যবসা করে বিরাট আরাম-আয়েশে পরিবারের ভরণ-পোষণ করে যাচ্ছে। এরাই কায়েমি স্বার্থবাদী। ওরা মসজিদ, মাদ্রাসায় ও গির্জায় বসে বসে ধর্মের সরল মানুষদের অর্থ-কড়ি চুষে নিচ্ছে। এক পয়সা নাকি ওদের দিলে ১০ পয়সা পাওয়া যায়। ওদের না

দিলে না-কি জাহান্নামে যেতে হয়। ওদের কাছেই নাকি বেহেস্তের ঠিকাদারী। বেহেস্ত-দোযখ বলতে কিছু নেই। মরে যাওয়ার পর সবই মাটি হয়ে যায়। তখন হিসাব-নিকাশের প্রশ্নই আসে না। লেলিন আরো ঘোষণা দিয়েছে এই বলে, "হে আমার কমিউনিস্ট কর্মী ভাইয়েরা! তোমরা মসজিদ-মাদ্রাসা ও গির্জায় কোন পয়সা দিবে না। যারা মসজিদ, মাদ্রাসা আর গির্জায় বসে বসে গরীবদের শোষণ করছে এদেরকে টেনে বের কর। ওদেরকে বল, আমাদের সাথে ক্ষেতে-খামারে, মিল-ফ্যাক্টরীতে আর কল-কারখানায় কাজ করতে। আর বসে বসে খাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। বেশ কিছু জায়গায় তাই করেছে। লেলিন এও বলেছে যে, ঐসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের থেকে মোটা অংকের কর নিতে হবে। ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে আর দুনিয়ায় রাখা হবে না। মাওলানা ও পাদ্রীরা দেশের আবর্জনা। এদেরকে চিরতরে স্তব্ধ করতে না পারলে আমাদের মিশন কামিয়াব হবে না। এরাই আমাদের বিরোধিতা করছে। এসব উস্কানিমূলক কথায় জনগণ ক্ষেপে যাচ্ছে। কাজেই এখন আর চুপটি করে বসে থাকার সময় নেই। এ মর্মে আমাদের মুহতারাম মেহমান কিছু বলবেন, তোমরা ধৈর্য্যের সাথে শোন।"

আমি বললাম, প্রিয় বন্ধুরা! আমাদের ধর্মমতে ইসলামের শত্রুদের উপর আক্রমণ করা বা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা ফরয দায়িত্ব অর্থাৎ পুণ্যের কাজ। এটাকে জিহাদ বলে। জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করলে তাকে শহীদ বলে। আর শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তার আত্মা চির শান্তির নীড় জান্নাতে প্রবেশ করে। আর জীবিত থাকলে তাকে গাজী বলে। গাজীকেও জান্নাতের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে।

প্রিয় বন্ধুরা! তোমরা যদি আমাদের কমান্ড মেনে যুদ্ধ করতে চাও তবে করতে পার। কিন্তু কমান্ড পুরোপুরি মানতে হবে। যেখানে জীবন দেয়া নেয়ার প্রশ্ন সে কাজ করার আগে তোমাদের চিন্তাকে ভালভাবে পরখ করে নাও। আরো একটি কথা খুব ভালভাবে জেনে রাখ, যুদ্ধের ময়দানে যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর অর্থাৎ পলায়ন কর তাহলে তোমাকে আর দুনিয়াতে রাখা হবে না, হত্যা করা হবে। তোমার সাথীরা যদি সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবু তুমি আত্মসমর্পণ করতে পারবে না, রেখে দিতে পারবে না হাতের অস্ত্র। তোমার কমান্ডার তোমাকে যা নির্দেশ দেন তা বুঝে আসুক চাই না আসুক, ভাল লাগুক চাই না লাগুক, তা জীবন দিয়ে হলেও পালন করতে হবে। আমার কথাগুলোর উপর তোমরা আলোচনা-পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। তিনদিন সময় দেয়া হল চিন্তা ফিকিরের জন্য, তারপর আমাকে জানাবে।

মেরী গমেজ আমার কথা শুনে তার অনুসারীদের বললেন, “প্রিয় বন্ধুরা! মহামান্য সিপাহ্‌সালার অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। যা বলার তা বলে দিয়েছেন। এখন তোমরা তা বিবেচনা করে উনাকে জানাও।”

তিনদিন পর মাত্র তিনজন যুবক যুদ্ধ করার জন্য একমত হয়েছে। আর ফাদার যোহন প্রেরণ করেছেন পাঁচজনকে। আমাদের নতুন যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়াল আটজনে। আমরা এই আটজনকে গভীর অরণ্যে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলাম। একটানা তিন মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য সাথী হিসেবে তৈরী করলাম। এদিকে আমাদের গির্জা থেকে দশ কিলোমিটার দূরে বলসেবিকরা ছাউনী ফেলেছে। এর আশ-পাশে চলছে জুলুম নির্যাতন, গণধর্ষণ ও লুটপাট। মানুষ অতিষ্ট হয়ে এলাকা ছেড়ে বনজঙ্গলে আশ্রয় নিতে লাগল। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। নির্যাতিতদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরও বেশী খৃস্টান। এ সংবাদ পেয়ে ফাদার যোহনসহ ছোট বড় সব পাদ্রীগণ মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। গির্জা রক্ষা ও নিজেদের বাঁচার তাগিদে ওরা গভীর রাতে বড় গির্জায় পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। উক্ত মিটিংএ আমাদেরকেও ডাকা হল। গভীর রাত্রে মেরী গমেজ আমাদেরকে নিয়ে প্রধান গির্জায় হাজির হল।

ফাদার যোহন সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, “প্রিয় ভক্তবৃন্দ! বিপদ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত বন-বাদার, মাঠ-ঘাট, একাকার করে এদিকে ধেঁয়ে আসছে। কুকান্দুজের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর রুশী বলসেবিক হায়েনারা নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাট আরম্ভ করেছে। ওদের কাছে ধর্মের বাছবিচার নেই, যাকে সামনে পায় তাকেই হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচার উপায় নবাগত কমান্ডার সাহেব বলে দিবেন—

আমি বললাম, “বাঁচার উপায় একমাত্র জিহাদ। তাছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের অগ্রযাত্রা রোখার চেষ্টা করব। এখন আপনারা নিজ নিজ স্থানে চলে যান, আমি একটু ফাদারের সাথে পরামর্শ করব। সবাই চলে গেলেন।

আমি ফাদারকে চুপি চুপি বললাম, তাদের অগ্রযাত্রা রুখতে হলে বেশ কিছু ছামানার দরকার। এসব ছামানা ক্রয় করতে দরকার প্রচুর অর্থের। সে অর্থ কোথায় পাব?

“অর্থের কোন অভাব নেই। গির্জা ফান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা আছে, আলমীরার চাবি এখনই তোমার কাছে দিয়ে দিচ্ছি। যা দরকার তা খরচ কর। কেউ কৈফিয়ত তলব করবে না।”

আমি বললাম, জনাব! চাবির প্রয়োজন নেই। চাবি আপনার কাছেই থাকবে। আপাতত ত্রিশ হাজার টাকা ও একজন বুদ্ধিমান রাহাবর আমাকে দিন। ফাদার যোহন তাই করলেন। আমরা মেরী গমেজকে নিয়ে রাত্রেই ছোট গির্জায় চলে এলাম।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে নামায আদায় করে আল্লাহ্র দরবারে সাহায্যের প্রার্থনা করলাম। অতঃপর উছায়েদ ও রাহাবরকে সাধারণ পোশাক পরিয়ে শহরে পাঠিয়ে দিলাম পেট্রোল বোম বানানোর মালামাল আনার জন্য। এও বলে দিলাম যে, একশত হারিকেন ও ৩০ লিটার কেরোসিন আনতে। এদিকে ওয়ায়েভ ভাইকে ছদ্মবেশে পাঠিয়ে দিলাম দুশমনের গতিবিধি লক্ষ্য করে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুতের জন্য। আমি বড় বড় দু'টি কমিউনিস্টদের পতাকা দুটি মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় উড়িয়ে দিলাম। বলসেবিকরা যেন বুঝতে পারে যে, আমরা তাদের অনুগত। তাছাড়া লেলিনের লেখা রাষ্ট্রদর্শন (নতুন পুরাতন মিলিয়ে) পুস্তিকা গির্জার অভ্যন্তরে বুক সেলফে ঢুকিয়ে রাখলাম।

ওয়ায়েভ ছদ্মবেশে ফেরিঅলার বেশ ধরে দুশমনের এলাকায় প্রবেশ করলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে পুরো এলাকা জরীপ করলেন। এক পর্যায়ে টহলরত একজন আর্মি হাতের ইশারায় ওয়ায়েভকে ডাকল। ওয়ায়েভ নির্ভয়ে সৈন্যের নিকট গেলে জিজ্ঞাসা করল—

"হে যুবক! তোমার নাম কি?"

"আমার নাম আব্দুল্লাহ্।"

"বাড়ী কোথায়?"

"রাসেখবলী।"

"এখান থেকে কত দূর?"

"দুই ক্রোশ।"

"কি কর?"

"পেটের দায়ে ফেরি করি।"

"তাহলে তুমি পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে বেড়াও?"

"হ্যাঁ।"

"লেখাপড়া জান?"

"সামান্য লেখাপড়া করেছি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে পারিনি। তাই পেটের দায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"এমন কত দিন করবে?"

"মনে হয় বেশীদিন ফেরী করা লাগবে না। আমাদের মুক্তিদাতা মিঃ লেলিন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। তখন গরীব আর গরীব থাকবে না, সব হয়ে যাবে এক সমান। বাহ্! কি মজা...।"

"তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্যই তো লেলিন কাজ করে যাচ্ছেন। আর আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করছি কিন্তু মুজাহিদদের কারণে তো তা পারছি না। ওরা কোথায় লুকিয়ে থাকে দেখি না! আমাদের ফৌজ হত্যা করে বাতাসে মিশে যায়।"

"এটা কেমন কথা! ওরা কি দৈত্য?"

"মনে হয় এমনই।"

"আপনারা ওদেরকে দেখেন না?'

"দেখি না তো।" অতঃপর সৈন্যটি বলল, হে যুবক! তোমাকে একটি কাজ দিতে চাই, তা করতে পারবে কি? যদি পার তবে তোমার, আমার ও দেশের খুব উপকার হবে।

তারপর বলল, আনোয়ার পাশা একজন দুর্ধর্ষ মুজাহিদ ছিলেন, তাকে আমরা হত্যা করেছি। তারপর আব্দুল্লাহ বিন আকিলকেও হত্যা করেছি। বর্তমানে খোবায়েব নামে এক মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটেছে। তার হামলার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। তাকে জীবিত বা মৃত ধরে দেয়ার জন্য ৩০ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছেন লেলিন। আজও তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তার ছবির জন্য ঘোষণা করেছেন ১০ লক্ষ রোবেল।"

সৈন্যটির কথা শুনে ওয়ায়েভ মৃদু হাসলেন। সৈন্য চোখ দু'টি লাল করে, দাঁত কটমট করতে করতে বলল, "তুমি দেখি বোকার মত হাসছ।"

"স্যার! আমি হাসছি আমাকে নিয়ে। অচিরেই আমি ৩০ লক্ষ ডলালের মালিক বনে যাব।"

সৈন্য বুকে হাত মেরে বলে উঠল, "সাব্বাস-সাব্বাস। তাহলে তুমি তাকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাই না?"

"একশ বার আশাবাদি। কিছুদিন আগেও তাকে দলবল সহ কুকান্দুজের দিকে যেতে দেখেছি।"

"আলবৎ! আলবৎ! তুমি তাকে চিনেছ? কুকান্দুজে সেই আমাদের সৈন্যদের উপর চড়াও হয়েছে। তুমি সত্যিই বলছ? তার চেহারাটা কি ধরনের বলতে পার কি? এতটুকু বলার পর ব্রিগেডিয়ার এস, কে পারসানস ওদের নিকটে এসে যুবকের পরিচয় চাইলে সৈন্যটি সব খুলে বলল। ব্রিগেডিয়ার তা শুনে যুবকের প্রতি খুশী হল এবং বলল, তুমি কি বলতে চাচ্ছিলে তা বল।"

"আমাকে খোবায়েবের আকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।"

"হ্যাঁ, বল শুনি।"

"গত ক'দিন আগে খোবায়েব তার বাহিনী নিয়ে কুকান্দুজ যাওয়ার পথে আমাদের মহল্লায় রাত্রি যাপন করেছিল। এর আগে তাকে চিনতাম না, শুধু নাম শুনেছি। সেদিন ভালভাবেই তাকে দেখেছি। স্যার! আপনার উচ্চতা থেকে তার উচ্চতা আরো ৬ ইঞ্চি বেশি হবে। স্বাস্থ্যও আপনার দ্বিগুণ। মাথা ভরা বাবরী চুল, বুক স্পর্শ করা দাড়ি, চোখ দুটো কস্তাকৃতির, যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। গায়ে লম্বা কোর্তা, মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি। হঠাৎ কেউ তাকে দেখলে কাপড় নষ্ট করে ফেলবে। তাকে ঘিরে আরো ৩০ জন মুজাহিদ রয়েছে। তাদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। এক ভয়ংকর আকৃতি ওদের। ওরা নিয়মিত জিহাদের নামে নিরীহ মানুষ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা কালেকশন করে। তার সাথীরা তাকে হযরত বলে সম্বোধন করে।"

"তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তা সম্পূর্ণ ঠিক। আমাদের ধারণার সাথে অনেকটা মিল। এখন বল, তাকে ধরিয়ে দিতে পারবে কি-না? যদি পার তবে ৩০ লক্ষ ডলার...।"

"স্যার! আপনাদের গোয়েন্দা নেই?"

"আছে বটে কিন্তু ভয়ে কেউ তার তালাশ করতে রাজি নয়।"

"আপনার অনুমতি হলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি কিন্তু আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাগবে। আর আমার সহকারী আরো দু' তিনজন লোক লাগবে।"

"অবশ্যই আমাদের সহযোগিতা পাবে। আর তোমার সহকারী তুমিই তোমার এলাকা থেকে বেছে নিবে।"

"স্যার! আগামীকালই আমার সাহায্যকারী দু'জনকে নিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাত করব এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ শুনব। কাজের আগে চারটা ডাল ভাতের পয়সা পাব না স্যার? তা না হয় কি খেয়ে ঘুরব?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই খরচ পাবে। কাল এস।"

অতঃপর ওয়ায়েভ গির্জায় ফিরে এল।

॥ নয় ॥

গভীর রাত। আশু বিপদাশংকায় চারদিকে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। গির্জার অভ্যন্তরে খৃস্টানরা উপাসনায় মত্ত। রাহেবা মিস্ মেরী গমেজ ক্রুশ সংলগ্ন স্থানে বসে প্রার্থনা করছে।

আমরা আমাদের কক্ষে বসে পরামর্শ করতে লাগলাম। ওয়ায়েভ সেনা ছাউনীতে গিয়ে যেসব আলাপ আলোচনা করেছেন তা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। ওয়ায়েভের কথা শুনে আমি মনে মনে হামলার যে পরিকল্পনা করেছিলাম তা পরিহার করে নতুনভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। উছায়েদ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "খোবায়েব ভাই! আমরা মনে হয় ভুল করে বসেছি। খৃস্টানরা আমাদের আদি শত্রু। তাদেরকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। আমার রাহাবর থেকে জানতে পেরেছি, ফাদার যোহন ইংল্যান্ডের নাগরিক। তিনি হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে উস্তুবারের দুর্গম এলাকায় এসে গির্জা স্থাপন করেছেন। অন্যসব এলাকা থেকে এখানকার অধিবাসীরা খুবই গরীব। ওদেরকে ঋণ দিয়ে, বিভিন্নভাবে টাকা পয়সা দিয়ে অনেক মুসলিম পরিবারকে ধর্মান্তরিত করেছেন। আমাদের আশ্রয়দাত্রী রাহেবা মিস্ মেরী গমেজ উক্ত ফাদারের কন্যা। তা অনেকেই জানেনা। যুবকদেরকে নারী ফাঁদে আটকিয়ে খৃস্টান বানাচ্ছে। আর আমরাও তা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্যসব গির্জা থেকে এখানে যুবকদের আনাগোনা একটু বেশি। এসব দিক নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। খৃস্টানরা খুবই ধূর্ত ও বজ্জাত। তাদের কূট-কৌশল আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। এক সময় ওরা বলসেবিকদের সাথে হাতও মিলাতে পারে। আমাদেরকে লক্ষ কোটি টাকা দেয়ার পিছনে ওদের কোন ষড়যন্ত্র বা দুরভিসন্ধি আছে কি-না তা তলিয়ে ও খুঁটিয়ে দেখতে হবে।"

ওয়ায়েভ বললেন, "খোবায়েব ভাই! উছায়েদের কথা একবারে অমূলক নয়। এদের প্রতি আমারও সন্দেহ সুপ্রকট। এখন থেকে আমাদের নাম পরিবর্তন করে নিতে হবে। যদিও আমরা আগে আমাদের পরিচয় দিয়েছিলাম তা হয়ত তাদের মনে নেই। আমরা একে অপরকে নতুন নাম নিয়ে ডাকব। যে নামে ডাকব তা দু'এক দিনের মধ্যেই মশহুর হয়ে যাবে এবং আগের নামের বিলুপ্তি ঘটবে। আর কোন গোপনীয় পরামর্শ এদের সামনে করা যাবে না। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"

আমি ওদের বক্তব্য শুনে তাদেরকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললাম, প্রিয় বন্ধুরা! আমরা যদি সুন্নতের উপর অটল অবিচল থাকতে পারি তবে দুশমন আমাদের কিছুই করতে পারবে না। ইসলাম কোন হাল্কা বস্তুর নাম নয়। ইসলামের সাথে যারাই টক্কর দিতে আসবে, তারাই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তোমরা অচিরেই দেখবে উভয় গির্জায় ইসলামী পতাকা উড়বে। আমি আজ সারাদিন মেরীর শিক্ষা মজলিসে ছাত্রের মত বসে তাদের তালিম দেখছিলাম। ওরা যেসব মিথ্যা, কাল্পনিক ও বানোয়াট কথা বলে ওদেরকে বুঝাচ্ছে, তা

একজন পাগলের প্রলাপ বৈ কিছুই নয়। আমার কোন একটি প্রশ্নের জবাব এরা দিতে পারবে না। চৌদ্দ গোষ্ঠি মিলেও পারবে না। আমরা একটু মজবুত হয়ে এদিকে অগ্রসর হব। আমি আরো বললাম, প্রিয় ভায়েরা! আমাদের প্রশিক্ষণ জারি রাখতে হবে। আমরা যে আটজন খৃস্টান যুবক পেয়েছি, তাদের উপর আমি মোটেই আস্থাশীল নই। যুদ্ধের বিভীষিকা ওরা কোনদিন দেখেনি। ওরা বেঈমান, অন্তর খুবই দুর্বল। ঈমানী কুওয়ত ছাড়া বেশীক্ষণ লড়তে পারবে না। আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে মুসলিম যুবক সংগ্রহ করতে হবে। ওদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করতে পারলে উপকারে আসবে।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ওয়ায়েভ বললেন, "ঠিক বলেছেন ভাইয়া, আমার চিন্তাও তাই। আমরা বলসেবিকদের গোয়েন্দা সেজে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় চষে বেড়াব আর অতি গোপনে জিহাদের দাওয়াত দিব। যুবকদের তাশকিল করে গির্জায় এনে প্রশিক্ষণ দেওয়াব।"

উছায়েদ বলে উঠলেন, "আলবৎ আলবৎ।"

আগামী দিনের প্রোগ্রাম তৈরীর জন্য সবাইকে একটু মোরাকাবা করার নির্দেশ দিলাম। সবাই দু'দু রাকাত নামায পড়ে চক্ষু বন্ধ করে মোরাকাবায় মনোনিবেশ করলেন। পুরো কামরা নিরব-নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পর মস্তক উত্তোলন করে উছায়েদ বললেন, "ভাইজান! আগামীকাল আপনারা দু'জন সেনাছাউনীতে গিয়ে দেখা সাক্ষাত ও সলা পরমার্শ করে আসেন। আমি রংতুলি এনে খোবায়েবের কাল্পনিক ছবি অংকন করব। এদ্বারা তাদের চোখে এক ধাঁধাঁ সৃষ্টি করতে পারব।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি তা পারবে? ওয়ায়েভ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "কি বলেন ভাইজান! তার মত একজন নিপুণ ও দক্ষ শিল্পী বর্তমান সময়ে অন্য একজন আছে কি-না তা জানা নেই।"

"ছবি দ্বারা জিহাদের কি উপকার হবে তা বুঝে আসে না আর এটা তো সম্পূর্ণ হারাম। ছবি অংকন করতে আমাদের প্রিয় নবী নিষেধ করেছেন।"

"তা আমি জানি! আমি একজন বিশিষ্ট চিত্রকর। জীবনে ছবি এঁকে অনেক গোনাহ্ করেছি। জিহাদে এসে তওবা করে ছেড়ে দিয়েছি। এখন চিন্তা করলাম আমার অর্জিত এলেম দ্বারা (ছবি অংকন) দ্বীনের একটু উপকার করি। আমার বিশ্বাস এ কাজ দ্বারা অতীতের গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে যদি হযরতের এজাজত হয়।"

"আমি তোমাকে ছবি অংকনের হুকুম দেব না। আগামীকাল আমরা দু'জনেই সেনা ছাউনিতে যাব। তোমাকে রেখে যাব গির্জায়। তারপর তোমার এখতিয়ার।

কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ সবেমাত্র উদিত হয়েছে। তিমির কেটে সামান্য আলো প্রকাশ পাচ্ছে। এতক্ষণে রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়েছে। গির্জার উপাসকরা একে একে তাদের কামরায় গিয়ে গা এলিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ছে। গির্জার একটু দূরে এক মনোরম পরিবেশে খুবই সুন্দর করে নির্মাণ করা হয়েছে উপাসকদের আবাস। আর গির্জার অতি নিকটে বিশালাকারে অনেকগুলো কক্ষবিশিষ্ট হল মেরীর বাসস্থান। দেখলে মনে হবে এটা জান্নাতের এক কুঠরী। আমরা মেরীর রুমেরই এক কোণে থাকি। আমরা অযু করে শেষ রজনীর নামায আদায় করে শোয়ার এন্তেজাম করছি। এমন সময় রাহেবা মিস্ মেরী গমেজ এসে তার চন্দন কাষ্ঠে নির্মিত ও কারুকার্যখচিত কেদারায় বসে বলল, "কি হে মুজাহিদ বন্ধুরা! এখনো আপনারা জেগে আছেন? ঘুমান নি?"

"এই তো এখন ঘুমিয়ে পড়ব।"

"আমি আমার সহচরদের নিয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত প্রভু যীশুর অর্চনা করেছি। খোদাওন্দ যীশুর নিকট বিপদাপদ দূর করার জন্য প্রার্থনা করেছি। আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত কি করেছেন?"

"আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আমার রব, যীশুখৃস্টের ও বিশ্ব ভ্রাম্যগুলের খোদার নিকট প্রার্থনা করেছি। আমার কথা শুনে মনে হল তার ফুটন্ত গোলাপের স্নিগ্ধ হাসিসম কোমল চন্দাননে কে যেন এক পোচ কালি মেখে দিয়েছে। আমি তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মলিনতার ছাপ দেখে ওষ্ঠযুগলে হাসির রেখা টেনে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে সুন্দরী! আপনার ইন্দুনিভাননের হাসির রেখা মিলিয়ে আঁধারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে কেন? আমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন বুঝি?"

"কই! না তো!"

"তাহলে মনে হয় আমার অক্ষিপল্লবে ধাঁধাঁ লেগেছে। মাফ চাই। ক্ষমা করুন।"

"মুজাহিদ ভাইয়া! আপনি বড় বিচক্ষণ!"

"আমাকে আর কোনদিন মুজাহিদ বলে ডাকবেন না। কারণ দেয়ালেরও কান আছে। হিতে বিপরীত হবে। আমাদেরকে আপনার অন্যান্য অনুসারীদের মত মনে করবেন এবং সেরূপ ব্যবহারই করবেন।"

"আপনার পরামর্শ সঠিক, আর এমন পাবেন না।"

অতঃপর মেরী জিজ্ঞাসা করল, "আজ সারাদিন আপনারা কোথায় কি কাজে কাটিয়েছেন তা শুনতে পারব কি?"

"অবশ্যই পারবেন তবে এ মুহূর্তে নয়, দু'চার দিন অপেক্ষা করতে হবে।"

"শুনেছি সেনা ছাউনীর আশ-পাশ এলাকায় নাকি বলসেবিকরা খুব জুলুম অত্যাচার চালাচ্ছে। ওরা আমাদের এলাকায়ও আসবে। সে ব্যাপারে কি চিন্তা করতেছেন?"

"আমরা শুধু চিন্তা পর্যন্ত সীমিত নই, সাথে সাথে ব্যবস্থাও নিচ্ছি। এখন সব বলা যাবে না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমরা জীবিত থাকতে আপনাদের উপর আঘাত আসতে দেব না। আমরা আপনাদের আশ্রয়ে রয়েছি। জীবন দিয়ে হলেও আপনাদেরকে রক্ষা করব। আমরা মুসলমান, আমরা আপনাদের পিতরের মত গাদ্দার নই। (পিতর যীশুর প্রধান শিষ্য; যাকে তারা যীশুর প্রেরিত রাসূল মনে করে)

"মুসাফির ভাই! আপনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। পিতর আমাদের খোদাওন্দ যীশুর প্রেরিত রাসূল। তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবেন না।"

"প্রাণাদিক বোন মেরী! আমরা মুসলমান, আমরা মিথ্যা বলি না। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেই প্রমাণ আছে। যীশুর সর্বাধিক প্রিয় ১২ জন সহচরদের মধ্যে একজন ৩০ টাকা ঘুষ পেয়ে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়। দশজন সহচর যীশুকে ফেলে রেখে জীবন নিয়ে পলায়ন করে, এদের মধ্যে একজন দিগম্বর অবস্থায় পালিয়ে যায়। যীশুর প্রধান শিষ্য পিতর তার খোদা যীশুকে ফেলে শত্রুর ভিতর ঢুকে পরে এবং বলে "আমি যীশুর কিছু নই, তাকে চিনি না।" শত্রুরা তাকে চিনতে পেরে গ্রেপ্তার করার জন্য উদ্যত হলে সে তিনবার যীশুকে অভিসম্পাত করে।

বাইবেলের মথি ২৬ ঃ ৪৭-৫৬ ও ৪৯-৫০ পদ
বাইবেলের মার্ক ১৪ ঃ ৪৩-৫২ ও ৬৬-৭২ পদ
বাইবেলের লুক ২২ ঃ ৪৭ এবং ৫৪-৬০ পদ

"আপনারা অবিশ্বাসী। আপনাদের সাথে আমার কথা চলে না। আপনাদের কাজ আপনারা চালিয়ে যান।"

"আমার কথার সত্যতা যাচাই এর জন্য বাইবেল খুলে দেখুন। আমি মিথ্যা বলিনি। কথার সুরে একথা এসে গেছে। তাই ক্ষমা চাই।" অতঃপর আমরা নিজ নিজ শয্যা গ্রহণ করে ঘুমিয়ে গেলাম।

সবাই গভীর নিদ্রায় বিভোর। রাহেবা মিস মেরীর চোখে ঘুম নেই। তার হৃদয়ে একই ব্যথা ধিকিধিকি জ্বলছে। একজন মুসলিম যুবক বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে এত সব বদনাম করল। কোন উত্তর দিতে পারেনি সে। নীরব নিথর রজনীতে বাইবেল খুলে খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করছে। চিন্তা করে দেখল, মুসাফিরের কথাই তো সত্য প্রমাণিত হল। তাহলে তার উত্তর কি দিয়ে দেয়া

যায় তা ভাবছে। বাইবেলের পাতার পর পাতা পড়ে এর উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেল না। এদিকে রজনী পোহায়ে ভোর হয়ে গেল। গির্জায় ঝুলানো বড় ঘন্টাটা ঢং ঢং আওয়াজ তুলে সবাইকে জাগিয়ে দিল।

আমরা অযু এস্তেঞ্জার হাযত সেরে ফজরের নামায আদায় করে তিলাওয়াতে বসে গেলাম। অতঃপর এশরাক নামায আদায় করে কিছু নাস্তা পানি খেয়ে ওয়ায়েভকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম সেনা ছাউনীতে। উছায়েদকে রেখে গেলাম গির্জায়।

সকাল ১০টা। আমরা সেনা ছাউনীর প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসে গেছি। সেনাবাহিনীর চলাফেরা আবছা আবছা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। এলাকাটা কেমন যেন নীরব-নিথর মনে হচ্ছিল। কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। সবাই যেন চির নিদ্রায় শায়িত। দু'একজন মানুষকে একটু দূর দিয়ে ত্রস্তপদে হেঁটে যেতে দেখে ডাক দিলাম। কিন্তু কেউ তাকাল না। মাঝে মধ্যে দু'একটি বাড়ী ভস্ম হয়ে মাটির সাথে মিশে আছে। ভাবলাম এরা সেনা হায়েনাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করছে। এসব ভাবতে ভাবতে সেনা ছাউনীতে এসে পৌঁছলাম।

আমাদেরকে দেখে ব্রিগেডিয়ার এস, কে পারসানস এগিয়ে এসে বলল, "তিনজন না আসার কথা? এখন দেখি দু'জন। উত্তরে ওয়ায়েভ বললেন, "স্যার! আর একজন ব্যবস্থা করতে পারিনি, তবে আশা করি পেয়ে যাব। এখন আমাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিন, কিভাবে কাজ করব।"

"তোমার সাথী কিছু লেখাপড়া জানে তো?"

"হ্যাঁ, আমার মতই।"

অতঃপর ব্রিগেডিয়ার আমাদেরকে একটি তাঁবুতে নিয়ে বসাল এবং চা-নাস্তা করিয়ে বলল, "আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, রণ-কৌশল ও প্রযুক্তি কম নয়। গোটা দেশ আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি। কোন একটি অঞ্চল মুজাহিদদের দখলে নেই। তাদের তৎপরতা প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু আনোয়ার পাশার রেখে যাওয়া দু'চারজন মুজাহিদ ও নব উদিত দুর্ধর্ষ ও দুরাক্রম্য জানবাজ মুজাহিদ খোবায়েবের আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য। এদের তৎপরতা নিঃশেষ করতে পারলে আমরাও নিস্তার পাই আর দেশও বাঁচে। তোমরা দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে এদের সন্ধান কর, প্রচুর টাকা পাবে। তোমাদের যাবতীয় খরচ বাবদ দশ হাজার ডলার আপাতত দিলাম, তা দিয়ে চলতে থাক। আর খবরাখবরের জন্য দূর পাল্লার দু'টি ওয়ারলেছ সেট দিচ্ছি, যেন তড়িৎ সংবাদ পৌঁছাতে পার।"

"স্যার! ওয়ারলেছ কি সব জায়গা দিয়ে দৌড়ানো যায়?"

"(ব্রিগেডিয়ার মুচকি হেসে) এটা কি গাড়ী নাকি যে দৌড়ানো যাবে?"

"স্যার! আপনিই তো বললেন, আমরা যেন দ্রুত সংবাদ পৌঁছাতে পারি এজন্য ওয়ারলেছ দিচ্ছেন। না এসে সংবাদ দেব কিভাবে?"

"আরে! তোমাদের এসে সংবাদ দিতে হবে না। সুইজ অন করে যা বলবে তা আমাদের ওয়ারলেছে এসে বাজবে। এভাবে আমরা সংবাদ পাব।"

"তাহলে তো খুবই সুন্দর!"

অতঃপর ব্রিগেডিয়ার দু'টি ওয়ারলেছ আর দশ হাজার ডলার প্রদান করে কিভাবে ওয়ারলেছ চালাতে হয় বুঝিয়ে দিল। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার! তেল মবিল কিভাবে ভরতে হয়, তা তো দেখালেন না?"

এবারও ব্রিগেডিয়ার মৃদু হেসে বলল, "এটা চালাতে তেল মবিলের দরকার হয় না, ব্যাটারির সাহায্যে চলে। ব্যাটারি ক্ষয় হয়ে গেলে এসব ব্যাটারি এভাবে ভরে চালাবে। যাও যেভাবে বলছি কাজ কর গে।"

আমরা হাসি হাসি মুখ করে সেখান থেকে গির্জায় চলে এলাম।

॥ দশ ॥

উছায়েদ রং তুলির সাহায্যে ছোট বড় অনেকগুলো পোস্টার তৈরী করলেন। বিভিন্ন ভঙ্গিতে আমার কাল্পনিক ছবি অংকন করেছেন। একটা অংকন করেছেন, ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং করাচ্ছে। একটা এঁকেছেন হামলার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অপর একটাতে হামলার কমান্ড দিচ্ছে। অন্য একটায় এবাদতে মগ্ন। এ ধরনের বেশ কিছু ছবি তৈরী করেছেন তিনি। ছবিগুলো দেখলে মনে হয় তা সত্যিই। একটা ছবি আর একটা ছবির সাথে খুবই মিল, কোন বেশ কম নয়। প্রত্যেকটা পোস্টারেই বলসেবিকদের ধমকি ও হুঁশিয়ার বাণী লিখেছে।

পোস্টারগুলোর অপর পৃষ্ঠায় গাম মেখে দেয়ালে লাগানো হয়েছে। আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দ্বারা কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। উছায়েদ আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, "হুজুর! নতিজা পরে দেখবেন। আগামীকাল আমাকে সেনা ছাউনীতে যাওয়ার অনুমতি দিন। দেখি কিছু করা যায় কি-না।"

আমি তাকে এজাজত দিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে নামায ও নাস্তা সেরে সেনা ছাউনীতে চলে গেলেন। আমরা অধীর আগ্রহে তার আগমনের পথ পানে চেয়ে রইলাম। তার চিন্তায় জীবন ওষ্ঠাগত। ফিরে আসে কি আসে না তা ভেবে অস্থির। খোদার

শোকর, গোধূলী লগনের সামান্য একটু আগে উছায়েদ গির্জায় ফিরে এলেন। সন্ধ্যার নামায সমাপন করে উছায়েদের সফর কাহিনী শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে রইলাম।

উছায়েদ নামায শেষ করে বসে ছফরনামা শোনাতে গিয়ে বললেন, "ভাইজান! আমি যখন সেনা ছাউনীর নিকটবর্তী হলাম, তখন এক সিপাহী আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে উদ্যত হলে একজন সেনা কর্মকর্তা বাধা দিয়ে বলল, "সাবধান গুলি ছুড়ো না, ওকে এদিকে আসতে দাও।" আমি নির্ভয়ে ছাউনীতে প্রবেশ করলাম। উক্ত অফিসার আমার বডি চেক করে একটি বৃক্ষের নিচে নিয়ে গেল এবং এদিকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে আমি বললাম, "স্যার! আমার বাড়ি এখান থেকে দু'মাইল দক্ষিণে মুরাদাবাদে। আমার এলাকার জনগণ প্রায় সবাই কমিউনিস্ট। এ অপরাধে আজ দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের উপর মুজাহিদদের নিপীড়ন চলছে। আমাদের চাল-ডাল, টাকা-পয়সা, খাসী-মুরগী এমন কি শাক-সব্জি পর্যন্ত এরা নিয়ে যাচ্ছে। আমরা গ্রামবাসী মহা আতঙ্কে দিন যাপন করছি। এক মাসে পাঁচজন কামিউনিস্ট নেতাকে দিবালোকে রাস্তায় জবাই করেছে। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি-না, তা জানার জন্য এখানে এসেছি।"

"ওরা কোন গ্রুপের তা বলতে পার কি?"

"স্যার! আমরা তো অত কিছু জানি না, তবে ওদের মুখ থেকে খোবায়েবের কথা শুনেছি।"

"তুমি কি তাকে দেখেছ?"

"দেখব না কেন স্যার! বহুবার দেখেছি।"

"দেখতে কেমন বলতো শুনি।"

"পাহাড়ী পালোয়ান। আপনার ডাবল। মনে হয় আমার হাতে পাঁচহাত লম্বা। অগ্নিবর্ণ চোখ। মাথাভরা বাবড়ী চুল। বুক পর্যন্ত আধপাকা দাড়ি। ইয়া বড় পাগড়ী। মাটি ছোঁয়া জুব্বা। বড় বড় গোফ। তার এক ধমকে পেশাব করে দিবেন স্যার। ওকে দেখলে মানুষ বলে মনে হয় না। আস্তা নিগ্রো।"

আলাপের ফাঁকে সৈন্যরা এসে চার দিকে জমা হয়েছে। একজন সৈন্য বলে উঠল, "স্যার! তার কথা বিলকুল সত্য। আব্দুল্লাহও তাই বলেছে।"

অফিসার বলল, "তুমি অনেক বাড়িয়ে বলেছ।"

"না স্যার! একটি শব্দও এদিক-সেদিক বলিনি। আমার নিকট প্রমাণ আছে।"

"কি প্রমাণ আছে পেশ কর।"

"(পোস্টারগুলো বের করে) দেখুন স্যার! তার ছবি সম্বলিত পোস্টার। এগুলো ওরা আমাদের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। আমি গোপনে তা সংগ্রহ করেছি। দেখুন কত ভয়ঙ্কর তার ছবি। তাকে জীবিত দেখলে কে ভয় না পাবে স্যার!"

অফিসার ছবিগুলো উল্টে-পাল্টে দেখল। এরপর বলল, "ছবিগুলো আমরা খতিয়ে দেখব। তুমি পরে এসে দেখা করো।"

"স্যার! ছবিগুলো দিয়ে দিন। যেখান থেকে এনেছি সেখানেই লাগিয়ে রাখব।"

"না এগুলো আমাদের কাছে থাকবে।"

"না স্যার! তা হয় না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগুলো নিয়ে এসেছি। শুনেছিলাম তার ছবি যদি কেউ সংগ্রহ করে দিতে পারে তাকে না-কি দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেবে। সে আশায়ই এনেছিলাম। এখন বুঝতে পারলাম এসব আপনাদের ভেল্কিবাজি ও চালাকি।"

"এটা যে খোবায়েবের ছবি তা কি করে বুঝি?"

"আপনি কোনদিন তাকে দেখেননি। যে কোন ছবির ব্যাপারেই তো মন্তব্য করতে পারেন যে, এ ছবি খোবায়েবের কি-না। যারা তাকে দেখেছে এমন যদি কেউ থাকত তবে বলতে পারত এটা ঠিক কি-না।"

"আচ্ছা তুমি আজকের দিন অপেক্ষা কর, আমি এমন একজন ব্যক্তিকে আনব যে খোবায়েবকে কাছ থেকে দেখেছে।"

অতঃপর ওয়ায়েভের নিকট ওয়ারলেছ করে বললেন, "তুমি যেখানেই থাক না কেন বিশেষ প্রয়োজনে আমাদের ঘাঁটিতে চলে আস।"

ওয়ারলেছ পাওয়ার সাথে সাথে ওয়ায়েভ সেনা ছাউনীতে চলে এলেন। তখন বিকাল পাঁচটা। তাদের চার চোখের মিলন হল। কিন্তু ওরা যে একে অপরকে চেনে, এমন কোন পরিচয় দেয় নি। অফিসার পোস্টারগুলো যখন খুলছিল, তখনই ওয়ায়েভ বলে উঠলেন, "স্যার! এতো খোবায়েবের ছবি! এ ছবি পেলেন কোত্থেকে? দেখুন কত ভয়ঙ্কর তার চেহারা! চোখ দু'টি থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে।"

ওয়ায়েভ আরো বললেন, "স্যার! সে সৌভাগ্যশালী কে, যে এ ছবি সংগ্রহ করে দশ হাজার ডলার পুরস্কার পেয়েছে?"

"টাকা এখনো দেয়া হয়নি। এটা অফিসে জমা দিলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। তারপর টাকা পাবে। মহামান্য লেনিন যে ঘোষণা দিয়েছেন তা অবশ্যই পাবে। হয়ত ৪/৫ দিন সময় যাবে।"

উছায়েদ বললেন, "আমি টাকা ছাড়া যাব না। দু-চার দিন থাকতে হয় এখানেই থাকব। বাড়ী ফিরে যাব না।"

অফিসার বলল, 'আরে মিয়া! তুমি বাড়ী যাও। পরে এসে টাকা নিয়ে যেও।"

"স্যার! আমি কিছুতেই আমার গ্রামে আর ঢুকব না। আমি যে ছবি নিয়ে এসেছি তা খোবায়েব বাহিনীর কানে অবশ্যই গিয়েছে। ওরা আমাকে জ্যান্ত রাখবে না। আমি টাকাটা নিয়ে বাদাখশানে মামা বাড়ী চলে যাব।"

অফিসার একটু চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়।"

পরদিন ছবিসহ এক সেনাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দিল সামরিক গোয়েন্দা হেড কোয়াটারে। গোয়েন্দারা ছবি পেয়ে খুবই আনন্দিত। এবার ছবি দেখে দেখে খোবায়েবকে পাকড়াও করে ৩০ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নেবে।

অতঃপর গোয়েন্দা অফিস থেকে দশ হাজার ডলার দিয়ে দিল।

সেনাধ্যক্ষ ফিরে এসে উছায়েদকে নয় হাজার ডলার প্রদান করে বলল, "এক হাজার ডলার খরচ হয়েছে, তা রেখে দিলাম।"

এরপর দু'জনে দু'রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল যেন কেউ কাউকে চেনে না। দু'দিন পর উছায়েদ আবার সেনাছাউনীতে গিয়ে অফিসারকে বললেন, "স্যার! আমি জাতির বহুত বড় খেদমত করেছি খোবায়েবের ছবি সংগ্রহ করে দিয়ে। আমার মাধ্যমে যে ছবিগুলো পেয়েছেন তার একটা সার্টিফিকেট আমাকে দিবেন।

অফিসার বলল, "তুমি বড়ই ভেজাল মানুষ। বারবার বিরক্ত কর এসে।" এই বলে নিজের প্যাডে একটি সত্যায়ন পত্র লিখে দিল। উছায়েদ খুশী খুশী ভাব নিয়ে গির্জায় চলে এলেন। এবার আমি বুঝতে পারলাম উছায়েদের চালাকী।

আমরা প্রতিটি গ্রাম মহল্লায় ঘুরে ঘুরে জিহাদের দাওয়াত দিতে লাগলাম। এতে ৮/১০ জন যুবক আমাদের ডাকে সাড়া দিল। আমরা তাদেরকে গির্জায় এনে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলাম। এবার মুসলিম ছেলেদের সাথে খৃস্টান ছেলেদের আন্তরিকতা সৃষ্টি হতে লাগল। প্রশিক্ষণের ফাঁকে ফাঁকে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, ফাযায়েল, মাসায়েল ও চমকপ্রদ ঘটনাবলী এবং হযরত সাহাবায়ে কেরাম আযমাঈনদের জিহাদের ইতিহাস সুন্দর করে বুঝাতে লাগলাম। শারিরীক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে মানসিক প্রশিক্ষণও সমান তালে চলছে। সকলেই আনন্দিত, উৎফুল্ল। জিহাদ করে শহীদ হওয়ার তীব্র অনুভূতি তাদের হৃদয়ে দোল খাচ্ছে।

একবার ফাদার যোহন ও কয়েকজন পাদ্রী এলেন প্রশিক্ষণ দেখতে। আমি বিশজন ছেলেকে দু'দলে বিভক্ত করে মহড়া দেখালাম। উভয় দলের যুদ্ধ এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, দর্শকরা চোখের পলক ফেলতেও রাজি ছিল না। উক্ত মহড়ায় মেরীসহ আরো কয়েকজন সহচরী ছিল। মহড়া দেখে সবাই আত্মহারা।

রাহেবা মিস্ মেরী গমেজ খুশীতে আত্মহারা হয়ে বলল, "মুসাফির ভাই! আপনার বাহিনীকে সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করতে যত অর্থের প্রয়োজন হয় সব আমি বহন করব। আপাতত ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কাজ আরম্ভ করুন।"

খৃস্টানদের থেকে অর্থ গ্রহণ করতে আমার মন চাচ্ছিল না। কিন্তু উপায় কি? মুফতিদের ফতোয়ার পর মুসলমানরা তো একটি পয়সাও অনুদান দিচ্ছে না। অর্থ ছাড়া সবই তো নিরর্থক। বাধ্য হয়েই মেরীর টাকা গ্রহণ করলাম এবং পোশাক আর অস্ত্র খরিদ করলাম।

॥ এগার ॥

একবার আমি ব্রিগেডিয়ার এস, কে পারসানসকে ওয়ারলেছে বললাম যে, "স্যার! আমরা এখন উজিরাবাদে আছি। এখানে মুজাহিদদের বেশ আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ওরা আপনাদের ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।"

ব্রিগেডিয়ার জিজ্ঞাসা করল। "তোমরা তা কি করে বুঝলে? "

"মুজাহিদরা জানতে পেরেছে আমরা রাসেখবুলীর বাসিন্দা। তাই আমাদের কাছে খুটিয়ে খুটিয়ে রাস্তাঘাট ও আপনাদের অবস্থান, সৈন্য সংখ্যা কত তা জিজ্ঞাসা করেছে। যদিও আমরা সঠিক উত্তর দেইনি, তবু ওরা অনুমানের উপর যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা।"

"এরা কোন্ গ্রুপের তা কি বুঝতে পেরেছ?"

"সম্ভবত এরা খোবায়েব জাম্বুলির গ্রুপ।"

"ওকে পাওনি?"

"তালাশে আছি, এখনো পাইনি।"

"খুব সাবধানে চলবে। আর যদি ধরা পরে যাও, তবে আমাদের ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য দিও না। এতে দেশ ও দশের ক্ষতি হবে।"

আমার ওয়ারলেছ পেয়ে ব্রিগেডিয়ার জরুরী পরামর্শ সভা আহ্বান করল। ব্রিগেডিয়ার নিকটবর্তী ভবিষ্যতের হামলা থেকে বাঁচার জন্য অন্যান্য অফিসারদের নিকট থেকে পরামর্শ তলব করল। একজন মেজর বলল, "স্যার! আমার মনে হয় এখানে কুকান্দুজের পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হবে। নিকটে কোন পাহাড় জঙ্গল নেই, যেখানে লুকাতে পারব। আমার পরামর্শ হল জরুরী ভিত্তিতে আরো সৈন্য

তলব করা এবং যথাসম্ভব এ স্থান ত্যাগ করা।" অন্যসব অফিসাররা একই পরামর্শ দিল।

ব্রিগেডিয়ার কালবিলম্ব না করে আরো ৫০ জন উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসল। অতঃপর স্থান পরিবর্তন করে রাসেখবুলীর দু'কিলোমিটার দূরে এসে ছাউনী ফেলল। সেখান থেকে প্রধান গির্জাও দু'কিলোমিটার হবে। এ সংবাদে আমরা বড়ই চিন্তিত হয়ে গেলাম। কখন কি ঘটে যায় তা বলা যায় না। ওরা গির্জার সংবাদ পেলে অবশ্যই এদিকে আসবে। আর সন্দেহের কারণ হল, এ দুর্গম এলাকায় কিসের গির্জা! ওরা মনে করবে, "এটা মুজাহিদদের আস্তানা। এরা গির্জার আড়ালে নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়।" এ রকম ভাবাটাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। এভাবে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত পোহালাম। মেরী গমেজের খানা পিনা ও ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এখন গির্জার উপাসনাও তার ভাল লাগছে না। আমি তাকে বারবার সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

ভোরে ওয়ায়েভকে সেনা ছাউনীতে পাঠিয়ে দিলাম তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। এদিকে আমি অন্য সব সাথীদেরকে নিয়ে বসে হামলার একটি নক্সা তৈরী করলাম এবং ভালভাবে বুঝিয়ে দিলাম। এটাও বুঝিয়ে দিলাম যে, আমাদের কাজ আরম্ভ হবে রাত নটায়। মেইন আক্রমণ হবে রাত তিনটায়। আক্রমণের ধরন হবে আমরা একশত হারিকেনে তৈল ভরে একেকজনে পাঁচটি হারিকেন নিয়ে দুশমনের ঘাঁটির চারদিকে বিপদমুক্ত স্থানে একযোগে জ্বালিয়ে দেব। তখন দুশমনরা প্রাণভয়ে ভাগার কোন রাস্তা না পেয়ে ফায়ার করতে থাকবে। এতে তাদের মনোবল ও গোলাবারুদ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা তিনটার দিকে আক্রমণ করে পুরো ঘাঁটিটাই হয়ত দখল করে নিতে পারব।

শত্রুপক্ষ লোক মারফত আগেই গির্জার কথা জানতে পেরেছে। ওয়ায়েভ ঘাঁটিতে পা রাখার সাথে সাথে অফিসার বলল, "আব্দুল্লাহ্! আমরা উস্তুবারের গির্জায় যাব। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। ওয়ায়েভ নিরুপায় হয়ে আমার নিকট ওয়্যারলেছে জানাল যে, ১০ জন সৈন্যের একটি টিম গির্জাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। আপনারা যে কোন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখুন। প্রয়োজনে যেন একটা কিছু করা যায়। তা না হয় খুবই অসুবিধায় পরার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমি ও উছায়েদ ওদের সামনে পড়লেই চিনে ফেলবে, তাই আমরা আড়ালে থেকে নতুন সাথীদেরকে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে প্রধান গির্জার অদূরে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে তিন গ্রুপে বসিয়ে দিলাম। ওদেরকে বলে দিলাম, দুশমন আক্রমণ করার সাথে সাথে যেন তিনদিক থেকে একযোগে আক্রমণ করে বসে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল। এখনো ওরা আসেনি। ওয়ায়েভের নিকট বারবার ওয়ারলেছ করেও কোন সংবাদ নিতে পারিনি। এ ধরনের ইতস্তত অবস্থার মধ্যেই চেয়ে দেখি এক ঝাঁক বলসেবিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে গির্জার প্রধান তোরণ অতিক্রম করছে। খৃস্টানদের মধ্যে কেউ গির্জায় আর কেউ রুমে। আবার কেউ কেউ অন্য কাজে মশগুল।

ওরা জুতা পায়ে দিয়েই গির্জায় প্রবেশ করল। সে সময় প্রদান পাদ্রী ক্রুশ সম্মুখে রেখে তিনজন খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল। একজন সিপাহী ফাদার যোহনকে পদাঘাত করে জিজ্ঞাসা করল, "কি হে ধার্মিক! কত ধোঁকাবাজী করে নিরীহ জনগণকে ফাঁকি দিয়ে চলবি? তোরা তো সমাজের বোঝা। কাজ করে খা। বসে বসে হাদিয়া তোহফার আশা ছেড়ে দে। তা না হয়...।"

অন্যসব পূজারীরা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তা অবলোকন করছিল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেনি।

অন্যান্য খৃস্টানদের প্রশ্ন করলে ওরা উত্তরে বলল, "স্যার! ধর্ম কর্ম কি জিনিস আমরা বুঝি না। আগে ছিলাম মুসলমান, এখন তা বদলায়ে হয়েছি খৃস্টান। ধর্মটাই মনে হয় একটি ধোঁকা। ওরা কি বলে না বলে তা কিছুই বুঝি না। এখানে এসে ঘুরাফেরা করলে তিনবেলা উদর পূর্ণ করে খাওয়া পাওয়া যায়। তাই এখানে পড়ে থাকি। এটা যদি আমাদের অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে অন্যায় হবে ফাদারের। আর যদি ভাল করে থাকি তবে তাও সব পাবে ফাদার। এবার বুঝলেন তো স্যার! এখানে কেন পড়ে থাকি?"

রুশী আর্মীরা গির্জা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখতে ছিল। কত মজবুত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো এমারত। একদিকে পুষ্পকানন, অপরদিকে সারি সারি আপেল, আনারসহ নানা ধরনের ফল বাগান। মাঝে মধ্যে রয়েছে পদ্মফোয়ারা। কত চমৎকার ও মনোরম পরিবেশ। এর একটু উত্তর দিক থেকেই আরম্ভ হয়েছে জাবালার গিরি পথ ও কুকান্দুজের বনভূমি। এলাকাটা দুর্গম হলেও লোকের আনা-গোনা কম নয়। গির্জাকে কেন্দ্র করেই হয়ত লোকজন যাওয়া আসা করে। গির্জার অদূরেই রয়েছে বিশাল লাইব্রেরী। ধর্মীয় পুস্তকে ঠাঁসা। এরই একটু দূরে রয়েছে নান ও রাহেবাদের বাসভবন।

আর্মীরা সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কি অপরূপ ইন্দুনিভানন, অসূর্যস্পর্শা গৌরবর্ণের গাভুর গাভুর রাজকুমারী। নয়ন-মন কেড়ে নেয়া অপূর্ব সুন্দরী। তাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে ফাদার বললেন, এসব মেয়েরা আমাদের রাহেবা। তারা কুমারী মরিয়মের মত চিরকুমারী হিসাবে আজীবন কাটাতে চায়। খোদাওন্দ যীশু

তাদেরকে কবুল করেছেন। এবাদত-বন্দেগী ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই।"

মেজর মৃদু হেসে বলল, "এ ধরনের পবিত্র ও সতী-সাধ্বী মেয়েদের আমাদের দরকার। আমরা ওদেরকে নিয়ে আমাদের ছাউনীতে এবাদত-বন্দেগী করব। আপনি এদেরকে নিয়ে আমাদের সাথে চলুন। আর ১৫/২০ জন গাভুরের প্রয়োজন, ওরা আমাদের বাংকার খনন করে দেবে, পাহারাদারী করবে এবং খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করবে। আমরা তাদেরকে পারিশ্রমিক দেব।"

ওয়ায়েভ বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, "স্যার! এদেরকে নিয়ে কাজ হবে না। এরা সারা বছর গির্জায় থাকে গির্জায় খায়। পরিশ্রম কি জিনিস তা তারা বুঝে না। আপনার অনুমতি হলে আগামীকাল বিশজন তরুণ নিয়ে আপনাদের ওখানে যাব। তাদের দ্বারা সব ধরনের কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। এমন কি ঘাঁটিতে আক্রমণ হলে ওদেরকে প্রথম সারীতে পাবেন। ওরা জীবন দিয়ে আপনাদের হেফাজত করার চেষ্টা করবে।"

মেজর ওয়ায়েভের কথা শুনে খুব খুশী হল এবং বলল, "ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ্! আগামীকাল তোমার নির্বাচিত লোকজন নিয়ে যাবে। আর মেয়েদের ব্যাপারে কি করবে?"

"মেয়েদের সেখানে নিয়ে ঝামেলা বাড়ানোর দরকার নেই। মনোরঞ্জন ছাড়া তো তাদের অন্য কোন কাজ নেই। সেখানে নিত্যনতুন হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনারা প্রতি দিন ১০/১২ জন করে এখানে চলে আসবেন। যে কয় ঘন্টা ইচ্ছা সে কয় ঘন্টা আনন্দ-ফূর্তি করে চলে যাবেন। তাতে কেউ বাধা দেবে না। অশান্ত পরিবেশে তাদেরকে নিয়ে শান্তি পাবেন না।"

"আব্দুল্লাহ্! তোমার পরামর্শই যথার্থ। কিন্তু মনে রেখ, এর ব্যতিক্রম হলে কিন্তু পরিণাম দাঁড়াবে এর উল্টো। এখনো সময় আছে ভালভাবে চিন্তা করে নাও।"

"স্যার! আমি চিন্তা ছাড়া কোন কথা বলি না। হতে পারি মূর্খ, গ্রাম্য। কিন্তু বুদ্ধি আমার পাকা। অপকার হবে এমন কোন পরামর্শ কাউকে দেইনি।"

"ধন্যবাদ। আজকের মত আমরা চলে যাচ্ছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। কাল তোমার ওয়াদা পুরা করবে কিন্তু। না হয়...।"

"জি স্যার! যা বলছি আমাকে সে রকমই পাবেন।"

অতঃপর আর্মীরা আস্তে আস্তে সেনা ছাউনীর দিকে চলে গেল।

আমরা রাত্রে বসে অসভ্য বলসেবিকদের আচার-আচরণ নিয়ে সলা-পরামর্শ করলাম। ভোরে বিশজন মুজাহিদ দিয়ে ওয়ায়েভকে পাঠিয়ে দিলাম সেনা

ছাউনীতে। এদেরকে পেয়ে আর্মীরা খুব খুশী হল। তাদেরকে বাংকার খননের কাজে লাগিয়ে দিল। মেজর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাংকারের ডিজাইন দেখাচ্ছে। কত ফুট গর্ত, কত ফুট চওড়া তার দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। এরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজের মন-মানসিকতা দেখে আর্মীরা খুবই খুশী। সারাদিন একটানা কাজ করল। রাত্রে লাঠি দিয়ে তাদেরকে পাহারারাদির কাজে লাগিয়ে দিল। এরা পালাক্রমে সারারাত পাহারাদারী করল।

রাত্রে আর্মীদের মধ্যে রাহেবাদের নিয়ে কানাঘুষা চলছিল। যারা গির্জায় গিয়েছিল তারাই একে অপরকে জানিয়ে দিল গির্জার সুন্দরী মেয়েদের কথা। এ সংবাদে আর্মীরা ক্ষুধার্ত কুকুরের মত অস্থির হয়ে গেল। এদের মন এখনই ছুটে গেছে গির্জার রাহেবাদের বাসভবনে। এক মতো অস্থিরতার মধ্য দিয়ে তারা রাতের সময়টুকু পার করল।

সেনা অফিসার ওয়ায়েভের নিকট ওয়ারলেছে কথা বলল যে, চিত্তরঞ্জনের জন্য কখন কতজন সৈন্য আসবে তা যেন যথাযথভাবে জানানো হয়।

ওয়ায়েভ বললেন, "স্যার! সব তো এক সাথে আসা যাবে না। তাই সকালে পাঁচজন আর বিকালে পাঁচজন পাঠান।"

"না! দশজন করে পাঠানো হবে। প্রথমে আসবে অফিসার পদবীর দশজন, তারপর দশজন করে সিপাহীরা আসবে।"

"আচ্ছা স্যার! ঠিক আছে। আপনারা এগার টার দিকে গির্জায় উপস্থিত হবেন। আমি সব ঠিকঠাক করে রাখব।"

"তুমি এসে আমাদেরকে নিয়ে যেও।"

"স্যার! আমি আপনাদের আপ্যায়নের এন্তেজামে ব্যস্ত। আমার দেয়া বিশজন সাথী থেকে কোন একজনকে নিয়ে আসলেই হবে।"

"ধন্যবাদ! আমরা তাই করব।"

অফিসারের সংবাদ পেয়ে আমরা তাদের আপ্যায়নের জন্য ফল-মূল, পানীয় ও মদের ব্যবস্থা করলাম। পেপসি ও মদের বোতলে ২/৩ দানা করে বিষ ঢুকালাম। বেলা এগারটার মধ্যেই আর্মী অফিসারসহ দশজন সৈন্য গির্জায় এসে হাজির হল। আমি বেছে বেছে দশজন সুন্দরী রাহেবাকে তাদের করণীয় কি তা বুঝিয়ে দিলাম। রাহেবাদের হল রুমে সোফায় বসানো হল। রাহেবারা মনোহরী সাজে সুসজ্জিত হয়ে শরীরে সুগন্ধি মেখে তাদের সামনে এসে অভিবাদনপূর্বক হাল পুরাস্তি করল। তারপর ফল-ফ্রুট পরিবেশন করল। ওরা মনের আনন্দে উদর পূর্ণ করতে লাগল। সকলের সামনেই এক গ্লাস করে পেপসি ও এক গ্লাস করে মদ রাখা হল। সবাই ইচ্ছে মতো কয়েক ঢোকে সব পান করে নিল। ব্রিগেডিয়ার

এস, কে, পারসানস ছাড়া সবাইকে এক ধরনের পানীয় পান করানো হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা চিরনিদ্রায় চলে গেল। কেউ সোফায় আর কেউ মেঝেতে এলোপাথাড়িভাবে পড়ে রইল। আমি তাদের অস্ত্রগুলোর হেফাজতের জন্য রাহেবাদেরকে নির্দেশ দিলাম। রাহেবারা অস্ত্রগুলো তুলে এনে অন্য একটি রুমে রেখে দিল।

ব্রিগেডিয়ার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ডাগর দুটি আঁখি মেলে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল। কি থেকে কি হয়ে গেল তা কিছুই বুঝতে পারেনি। চোখের সম্মুখে নয়জন সেনা অফিসারের নারীর খাহেস চিরতরে মিটে গেল।

এবার আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে বললাম, স্যার! আপনি আরো দশজনকে এক সাথে আসার জন্য ওয়ারলেছে বলে দিন। তারা যেন দু'টার মধ্যে এসে পৌছে। তাদের এন্তেজামও করে রেখেছি। অফিসার নিরুপায় হয়ে ওয়ারলেছে দশজনকে আহ্বান করল। ওরা বেলা দু'ঘটিকায় এসে হাজির হল। এদেরকে অন্য একটি রুমে বসিয়ে আপ্যায়ন করা হল। তারপর বিকালেও আসল দশজন। সন্ধ্যার আগেই ৩৯জন আর্মীকে নারীর ইজ্জত হরণের মজা চাকিয়ে জাহান্নামে প্রেরণ করা হল।

॥ বার ॥

পরদিন ব্রিগেডিয়ারের দ্বারা ওয়ারলেছ করিয়ে ক্যাম্পে বলে দেয়া হল, "আমরা আরো তিনদিন এখানেই অবস্থান করব। তোমরা যদি ইচ্ছা কর তবে পাঁচজন করে আসতে পার। ওয়ারলেছ পেয়ে পাঁচজন সিপাহী গির্জার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। আমি উছায়েদকে নিয়ে অস্ত্রসহ বনের ভিতর এ্যামবুশ লাগালাম। আমাদের নিকট আসার সাথে সাথে দু'দিক থেকে ব্রাশফায়ারে তাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম। এভাবে পনেরজনকে হত্যা করলাম।

আমাদের ফায়ারের শব্দ পেয়ে সেনা ছাউনীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে, যারা গির্জায় গিয়েছে কেউ আর জীবিত নেই। সবাই খোবায়েব বাহিনী কর্তৃক নিহত হয়েছে। কেউ কেউ বলছিল, "আমি তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছি। ক্যাম্প থেকে বারবার ব্রিগেডিয়ারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। ওরা সন্দেহ করে আমাদের দশ সাথীকে গ্রেপ্তার করেছে আর বাকি দশজন পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এ সংবাদ আমাদের নিকট পৌছল রাত নয়টায়। আমরা সাথে সাথে রণসাজে সুসজ্জিত হয়ে বিপুল পরিমাণ গোলা-বারুদ নিয়ে রাত দুটোয় ক্যাম্পে আক্রমণ করে বসলাম।

আমাদের পালিয়ে আসা দশ সাথীর জানা ছিল বন্দীদের কোথায় রেখেছে। কোন বাংকারে কতজন থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে হিসাবেই আমরা আক্রমণ করলাম। ওরাও মরিয়া হয়ে আমাদের দিকে গোলা বর্ষণ করতে লাগল। রাত পোহানোর আগ পর্যন্ত একটানা ফায়ার চলছিল। সকালে উভয় পক্ষের ফায়ার থেমে গেল। এর মধ্যে বন্দীরা অক্ষত অবস্থায় বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে আসল। কিছুক্ষণ পর একজন সৈনিক সাদা নিশান উড়িয়ে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসলে আমরা তাকে স্বাগত জানালাম। উভয় পক্ষের মত বিনিময় হল এবং কয়েকটি শর্তের উপর যুদ্ধ বিরতির স্বাক্ষর হল। এর মধ্যে গনিমতের অর্ধেক অস্ত্র আমাদের থেকে নিয়ে যাবে। আর অর্ধেক আমাদের জন্য থাকবে। আর লাশগুলোও নিয়ে যাবে। অতঃপর ট্রাক বোঝাই করে লাশ আর অস্ত্র নিয়ে এলাকা ত্যাগ করল। রাতের গোলাগুলিতে আমাদের পাঁচজন মুজাহিদ ও দুইজন খৃস্টান সৈন্য নিহত হল। আর বলসেবিকদের নিহতের সংখ্যা পঁয়ত্রিশজন। তাদের সর্বমোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৯ জনে। ব্রিগেডিয়ার সহ ৯০ জন। আমাদের হাতে এ এলাকায় যে মার খেয়েছে, জিন্দেগীতে তা ভুলবে না। এ এলাকায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে কোন সৈন্যও পাঠাবে না তা নিশ্চিত। আমরা শহীদদের লাশ দাফন করে গির্জায় ফিরে এলাম।

এসে দেখি ফাদার, পাদ্রী, সিস্টার, রাহেব-রাহেবা ও নানরা গির্জায় প্রার্থনায় রত। সকলেরই ধারণা খোদাওন্দ যীশুর কৃপা দৃষ্টিতে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। মেরীর গির্জা থেকেও উপাসকগণ বড় গির্জায় এসে অর্চনা করছে। আবার উভয় গির্জা থেকে কিছু খৃস্টানরা পলায়ন করেছে।

আমরা গির্জায় ঢোকার সাথে সাথে খানা-পিনার ব্যবস্থা করা হল। শ্রমক্লান্ত মুজাহিদরা খানাপিনা সেরে গির্জার এক পার্শ্বে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন ও গড়াগড়ি খাচ্ছেন। অন্যদিনের চেয়ে আজকের এবাদত একটু ভিন্ন প্রকৃতির। একটু পর পর একেক জন পাদ্রীরা আসেন আর ওয়াজ নছিহত করেন। বিশেষ বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন ফাদার যোহন ও রাহেবা মিস মেরী গমেজ।

মেরী তার সহচর ও উপাসকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, "প্রিয় খৃস্টান ভাই ও বোনেরা! খোদাওন্দ যীশু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। আমরা তাঁরই বান্দা, তাঁর উপাসনা করি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব। যতদিন আমরা দুনিয়াতে থাকব, ততদিন খৃস্টধর্মের তাবলীগ করে যাব। একজন কাফেরকে (মুসলমান) যদি বুঝিয়ে ছমজায়ে হাতে-পায়ে ধরে, টাকা-পয়সা দিয়ে ধর্মে আনতে পারি তবে প্রভু যীশু খুশী হয়ে জান্নাত দান করবেন। দেখ! আমাদের গির্জায় আজ কদিন যাবত তিনজন কাফির আশ্রয়

নিয়েছে। ওরা কতই না ভালো মানুষ। ওরা জীবন বিলিয়ে দিয়ে আমাদের মান-ইজ্জত ও গির্জা বলসেবিকদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। যত নেক আমলই করুক না কেন ঈমান না থাকার কারণে জাহান্নামে যাবে। এস আমরা সবাই মিলে এ তিনজন কাফেরের জন্য প্রভু যীশুর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন নিজ দয়াগুণে তাদেরকে ঈমান গ্রহণের সুমতি দান করেন।”

এই বলে সবাই একযোগে যীশুর প্রস্তর মূর্তির সামনে মাথা নত করে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। আমি অঘুম নয়নে তাদের কীর্তিকলাপ দেখে হাসছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পর হাততালির আওয়াজ এল। সবাই কান্না থামিয়ে মূর্তির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

আমি আস্তে আস্তে শয্যা ত্যাগ করে মেরীর দিকে এগিয়ে গেলাম। মেরী মুখভরা হাসি হেসে আমাকে নিয়ে তার চেয়ারে বসিয়ে সে অন্য একটি চেয়ার আসন গ্রহণ করল। সে হয়ত ভাবছিল তাদের প্রার্থনা কবুল হয়েছে। আমি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে গিয়েছি। তাই এত সম্মান প্রদর্শন করল।

আমি কিছু বলার ইচ্ছা করায় গির্জায় পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। অতঃপর খুব নম্রসুরে বললাম, “হে ধর্মজাযক রাহেবা বোন মেরী! আমাদের পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যীশুর সমীপে আমাদের ঈমান নছিবের জন্য প্রার্থনা করেছ। সত্যি তোমরা আমাদের মঙ্গলকামী। তা না হয়, এত কান্নাকাটি করতে না। খৃস্টধর্মে ঈমান আনতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু কিছু বিষয় জানতে ইচ্ছে করে, যদি সমাধান পাই তবে...।”

“(গালভরা হাসি হেসে) বলুন, মুসাফির ভাই কি প্রশ্ন বলুন?”

“(ক) একটু আগে তুমি বলেছ, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য খোদা আপন ছেলে যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছেন। এখানে প্রশ্ন হল পাপ করল আদম আর শাস্তি ভোগ করল খোদার পুত্র ছোট খোদা। এটা কি করে হয়? তিনি তো পারতেন অন্য কোন মানুষকে ক্রুশ বিদ্ধ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে বা নিজের সন্তানকে জীবিত রেখে নিজ দয়াগুণে মাফ করে দিতে অথবা এমন একটি নেক আমল বাতায়ে দিতে যা আমল করলে পাপ মাফ হয়ে যেত। এখানে তোমাদের খোদা বে-ইনসাফ করেছে। একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে ক্রুশ বিদ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তোমাদের খোদা অবিচারী ও নিষ্ঠুর।

(খ) আদম সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পরে পাপমোচনের জন্য নিজ পুত্রকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করলেন, এর আগে যে সব নবী, রাসূল ও সাধারণ মানুষ অতিবাহিত হয়েছে, তারা তো সবাই পাপী হিসাবে রয়ে গেল। তাদের উপায় কি হবে?

(গ) খোদাওন্দের যদি ন্যায় বিচার থাকত, তার সমস্ত বান্দার প্রতি দয়া থাকত তবে আদম (আ.)-এর সময়ই এ ক্রুশ বিদ্ধের কাজটি সমাধা করার দরকার ছিল। তাহলে সে সব কোটি কোট বান্দারাও পাপ থেকে মুক্তি পেত। তা তিনি করলেন না কেন?

(ঘ) জন্ম মৃত্যুর অধীনে যে, সে আবার খোদা বনে যায় কিভাবে? যীশু মরিয়মের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, ইহুদীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে। দুশমনের হাত থেকে যে নিজকে রক্ষা করতে পারেনি সে অন্যকে রক্ষা করবে কি করে? খোদা কি এমন দুর্বল হলে চলবে?

(ঙ) সন্তানের চেয়ে পিতামাতার মর্যাদা অনেক বেশী। সে হিসেবে যীশুর মাতা মরিয়মের মর্যাদা বেশী দেয়ার দরকার কারণ তিনি খোদার মা।

(চ) যীশু যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়ে থাকেন তবে এখন আর উপাসনার দরকার কি? পাপ করলেও তো কোন চিন্তা নেই। তাই নয় কি?

বোন মেরী! আশা করি তোমার পক্ষ থেকে সুন্দর উত্তর পাব।"

"খোদাওন্দের হেকমত বুঝার সাধ্য বান্দার নেই এবং ভুল ধরারও অধিকার নেই; তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।"

"বোন! সুন্দর উত্তর পাইনি।"

"পাপীর দ্বারায় প্রায়শ্চিত্ত হয়নি বিধায় নিজের ম্যাছুর পুত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত নিয়েছেন।"

"বোন মেরী! তোমার উত্তর সঠিক নয়। কারণ বাইবেলের আয়ুব খণ্ডে ১৪ ঃ ১৫ পদে লিখিত রয়েছে, "নারী থেকে যার জন্ম হয়েছে সেই পাপী। যীশু নারী থেকে জন্ম নিয়েছে বিধায় তিনি পাপী। আর পাপী দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হয় না। সে হিসাবে ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণই ভুল।

তাছাড়া বাইবেলের রোমীও ২৩ ঃ ৬ পদে লিখা আছে, "পাপের মুজুরী মৃত্যু" অর্থাৎ যার মৃত্যু হয় সে যে পাপী ছিল, মৃত্যুই তার প্রমাণ। এখন তোমার কথা বিশ্বাস করব না তোমাদের আসমানী কিতাব বাইবেলের কথা বিশ্বাস করব? বল কোন্‌টি বিশ্বাস করব?"

মেরী নিরুত্তর। জনতা খামোশ।

আবার বললাম, "প্রিয় বোন মেরী! তোমরা তো শরীয়তের উপর (আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান) আমল কর না।"

"কে বলেছে? আমরা পূর্ণ শরীয়ত মেনে চলি।"

"শরীয়ত মেনে চললে চুরি-ডাকাতি করতে হবে। জিনা-ব্যভিচার করতে হবে, সুদ-ঘুষ খেতে হবে, মিথ্যা-গীবত, পরনিন্দা করতে হবে। পিতামাতাকে ও

পড়শীকে কষ্ট দিতে হবে। কারণ এসব অন্যায় থেকে বিরত থাকার নাম শরীয়ত। আর বাইবেলের ইউহান্না ৩য় অধ্যায়ের ২১ নং পদে খোদাওন্দের প্রেরিত পল তাঁর একপদে লিখেছেন, "শরীয়ত একটি অভিশাপ।"

পলের কথায় যদি শরীয়ত অভিশাপ হয় তবে উক্ত অন্যায়গুলো না করা হল শরীয়ত। যারা অভিশাপের উপর আমল করবে, তারা হবে অভিশপ্ত। তাহলে কি করে বললে, 'আমরা শরীয়ত মেনে চলি?

অর্থাৎ শরীয়ত মেনে চললে হবে অভিশপ্ত। আর শরীয়ত পালন না করলে, উল্লেখিত অন্যায়গুলো করতে হবে। বল তোমরা কোন্‌টা পালন কর?"

সভাসদ নীরব নিস্তব্ধ। আমার আলোচনার কোন্ ফাঁকে ফাদার যোহন এসে তাঁর আসন দখল করে বসেছে তা বুঝতে পারিনি না। দর্শকমণ্ডলী একবার আমার দিকে, আর একবার মেরী ও ফাদারের দিকে তাকাচ্ছিল।

তারপর আমি বললাম, প্রিয় বোন মেরী! তোমরা নবী-রাসূলগণের উপরও মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছ।"

"না, আমরা এ ধরনের জঘন্য অন্যায় করিনি।"

"কেন মথির ইঞ্জিল ১২:৪৬-৫০ এবং লুক ৮:১৯-২১ পদে হযরত মরিয়ম (আ.)-কে খোদাদ্রোহী বলা হয়েছে। আর ইসলামে তাঁকে সিদ্দীকা অর্থাৎ খোদার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস স্থাপনকারিণী এবং সতী-সাধ্বী ও মোমেনা বলা হয়েছে। মথির ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.) কে দুর্দান্ত, মায়ের সাথে অসৎ ব্যবহারকারী বলা হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, "আমি আমার মায়ের অনুগত এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।" আবার তোমাদের গালাতীয় ৩ ঃ ১৩ পদে যীশুকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে এবং এ কারণেই তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তাকে রুহুল্লাহ, কালিমাতুল্লাহ বলে খেতাব করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এও বলা হয়েছে যে, তিনি খোদা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন পুতঃপবিত্র মানুষ। একজন পাপী খোদার চেয়ে একজন নিঃষ্পাপ মানুষ তো হাজার গুণে উত্তম। তাছাড়া যীশু যদি খোদা হন তবে আদম (আ.) থেকে নিয়ে সমস্ত মানুষই খোদা হওয়ার দরকার ছিল। এ ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি?" সকলেই নীরব!

প্রিয় মেরী! তোমরা বলে থাক তোমাদের ধর্মের সার মহব্বত। তাই খোদাকে বলে থাক মহব্বত। পিতা যেমন তার সন্তানকে খুব বেশী আদর করে সে হিসাবে তোমরা খোদাকে পিতা বলে আখ্যায়িত কর।

দেখ! ইসলামের সার হল তাওহীদ, একত্ববাদ। কিন্তু কোথাও পিতা বলা হয় নাই বরং বলা হয়েছে "রব"। যিনি সৃষ্টি থেকে নিয়ে অন্ত পর্যন্ত সময়

উপযোগী খাদ্য-পানীয় এবং বাঁচার উপকরণ দিয়ে পালা-পোষি করেন, তিনি হলেন "রব"।

পিতা-মাতা সন্তান পালা-পোষি করেন তা সত্য কিন্তু রোগ-ব্যাধি, বালা-মুসিবত দূর করতে পারেন না। আবার বৃদ্ধ বয়সে দেখা যায় সন্তানরা বৃদ্ধ পিতামাতাকে পালা-পোষী করে। পিতা তখন সন্তানের মুখাপেক্ষী হন। তাহলে তোমরা খোদাকে পিতা ডেকে খাটো করেছ। এ ব্যাপারে কোন যুক্তি পেশ করতে পারবে কি?'

সকলেই নীরব।

প্রিয় মেরী! আর একটি প্রশ্ন করি মনে কিছু নিও না। প্রশ্নটা হল প্রসব বেদনা হল একজনের আর সন্তান প্রসব হল অন্যজনের। তুমি টাকা পাও একজনের নিকট আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছি যে, টাকা দেয়া লাগবে না। আঘাত লেগেছে পিঠে, অন্ধ হল চোখ। এসব কথার কোন যুক্তি আছে?"

"অবশ্যই না। এগুলো অবান্তর, মিথ্যা, কাল্পনিক।"

"তোমাদের ধর্মে তা আছে। যেমন তোমরা মনগড়া ইনকুইজিশন ডিপার্টমেন্ট তৈরী করে একজনকে ইনচার্য দিয়েছ। প্রতি রবিবারে বড় গির্জায় তিনি গোনাহ্ মাফ করে থাকেন। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, ইনচার্জ একজন একজন করে এক সপ্তাহে কে কি গোনাহ করেছে তার স্বীকারোক্তি জবানবন্দী শুনে মাথায় হাত রেখে বলে খোদাওন্দ যীশুর বরকতে তোমার স্বীকৃত সম্পূর্ণ গোনাহ ক্ষমা করা হল। এখানে আমার প্রশ্ন হল, পাপ করল বান্দায় আল্লাহ্র হুকুম না মেনে, আর ক্ষমা করল অন্য এক মানুষে। এ অধিকার তাকে কে দিয়েছে? আমাদের গোনাহ্ হয়ে গেলে আমরা চুপি চুপি আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি ক্ষমা করে দেন। আমি যে পাপ করেছি তা অন্য কেউ জানল না এবং পাপী হিসাবে আমাকে তিরস্কারও করল না। আর তোমরা সারা সপ্তাহ কে কি অপকর্ম করেছ তা সবাই জানে। অতঃপর পাপ করারও আগ্রহ পয়দা হয়। ইনচার্জ বললেই পাপ ক্ষমা করে দেয়। ছিঃ কত নোংরামী!"

"পাদ্রীগণ হলেন পিতরের স্থলাভিষিক্ত। (পিতর হল যীশুর প্রধান শিষ্য ও ইঞ্জিলের সংকলক) তাই পাদ্রীগণ পাপ ক্ষমা করার অধিকার রাখেন।"

"পিতর ছিল এক নম্বর ইতর। কারণ শত্রুগণ যখন যীশুকে গ্রেপ্তার করতে চাইল তখন সে শত্রুর দলের ভিতর প্রবেশ করে এ বিশুদ্ধ মিথ্যা কথাটি বলে দিল যে, "আমি যীশুকে চিনি না।" শত্রুগণ যখন তাকে চিনে ফেলল এবং পাকড়াও করতে উদ্যত হল তখন তিনবার যীশুকে অভিসম্পাত করেছিল। যে

খোদাওন্দকে গালী দেয় এবং খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে ইতর ছাড়া কি হতে পারে?"

বাইবেল-মার্ক ১৪ ঃ ৬৮-৭১। যোহন ১৮ ঃ ১৭-২৭ পদ

বাইবেল মথি ২৬ ঃ ৭০-৭৫। লুক ২২ ঃ ৫৭-৬১ পদ।

তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এ লম্পট পিতর কি করে অন্যের পাপ ক্ষমা করে? এ চৌকিদারী কোথায় পেল?

সকলেই নিরুত্তর।

আমি আরো বললাম, "বোন মেরী! তোমাদের গ্রন্থের যেসব স্থানে পুতঃপবিত্র নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধে গালি ও মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে সেসব স্থান উল্লেখ করে দিচ্ছি, দয়া করে তা পাঠ করে দেখে নিও। বাইবেল আদিপুস্তক ১৮ অধ্যায় ৩২ পদ। শামুয়েল ২ অধ্যায় ৪-১১ পদ। শামুয়েল ৫ অধ্যায় ১৩ পদ। ২ শামুয়েল ১১ অধ্যায় ২-২৭ পদ। বাইবেল বিচারক কর্তৃগণের বিবরণ ১৬ অধ্যায় ১-৪ পদ। ১৪ অধ্যায় ১২-৯৯ পদ। বিচার কর্তৃগণের বিবরণ ১৬ অধ্যায় ১০-১৫ পদ। ১ম রাজাবলি ১৩ ঃ ১৮ পদ। ১ম রাজাবলি ২০ অধ্যায় ১ম রাজাবলি ২২ ঃ ১৫-২৩ পদ। যিরমিয় ৩৮ ঃ ২৪-২৭ পদ।"

উপস্থিত সভ্যগণের পক্ষ থেকে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রিয় বন্ধুরা! আমার আলোচনায় মনে হয় তোমরা রাগ করছ, তাই এখানেই আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই।" এতটুকু বলার সাথে সাথে সমবেত কণ্ঠে বলল, "বলুন! বলুন! আরো বলুন।"

অতঃপর আমি আবার বলতে লাগলাম, "হে আমার খৃস্টান বন্ধুরা! আজ আমি পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা যদি খৃস্টধর্মের বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তবে ছয়টি মুজিযা থেকে যে কোন দু'একটি মুজিযা দেখান। তাহলে বিশ্বাস করব আপনারা সত্যি খৃস্টান। তা না হয় আপনাদেরকে খৃস্টধর্মের মিথ্যাদাবীদার হিসাবে সাব্যস্ত করব। ছয়টি মুজিযা হল, মৃত্যুকে জীবিত করা, বদরূহসমূহ বের করা, শিক্ষা ছাড়া নতুন নতুন ভাষায় কথাবলা, বিষধর সর্প ধরা, বিষ পানে কোন ক্ষতি না হওয়া, রোগীর রোগ মুক্ত করা ও পাহাড়কে ইশারা দিয়ে অন্য স্থানে সরিয়ে দেয়া। কেননা আপনাদের পবিত্র বাইবেলের মার্কাস ১৬ অধ্যায়ের ১৭-১৮ পদে বলা হয়েছে যে, "যারা খৃস্টধর্মে ঈমান রাখবে তাদের মধ্যে উল্লেখিত ছয়টি মুজিযা পাওয়া যাবে।" আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, "যদি তোমাদের মধ্যে সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান থাকে তবে তোমরা পাহাড়কে বলবে যে এস্থান হতে ঐ স্থানে সরে যাও। তখন পাহাড় চলে যাবে।"

প্রিয় বন্ধুরা! আমার প্রশ্ন হল বাইবেলের এসব উক্তি যদি সঠিক হয়ে থাকে আর আপনারা যদি সত্যি খৃস্টধর্মের বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তবে এসব মুজিযা অনায়াসে দেখাতে পারবেন। আর যদি দেখাতে না পারেন তবে হয়ত বাইবেল মিথ্যা হবে না হয় আপনারা খৃস্টধর্মের মিথ্যা দাবীদার। বলুন, কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা?"

এবারও সবাই নীরব। উপস্থিত জনতার নীরবতা দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। এত বড় বড় পাদ্রী, ফাদার আর রাহেবগণ থাকতে কেউ আমার কথায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। তাই আমি আরো বললাম—

"হে আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা! আপনারা যীশুর মুজিযা দেখে জোর করে তাকে খোদার আসনে বসিয়ে দিলেন। অথচ তিনি নিজেকে কোনদিন খোদা দাবী করেননি। তিনি ছিলেন আমাদের মতই মানুষ জাত। অনেক বিষয়ে তিনিও ছিলেন অক্ষম। একজন দুর্বল ব্যক্তিকে খোদা মানা কতই না লজ্জার কথা, কত বড় কুফরী। দেখুন আপনাদের যোহন ৫ম অধ্যায়ের ৩০ পদে যীশু নিজেই বলেছেন, "আমি আপনা হতে কিছুই করতে পারি না। যেরূপ শ্রবণ করি সেরূপ বিচার করি। আর আমার বিচার ন্যায্য।"

এখানে তিনি নিজেই অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তাহলে এমন দুর্বল ব্যক্তিকে কেন জোর জবরদস্তি করে খোদা বানালেন? যোহন পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৮ পদে তিনি আরো বলেন, "আমি আকাশ থেকে অবতরণ করেছি এ জন্য নয় যে, আপন খুশী মত কাজ করব; বরং এজন্য যে, আপন প্রেরকের খুশীমত কাজ করব।"

অতএব একথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যীশু অন্যান্য মানুষের মত অক্ষম এবং পর মুখাপেক্ষী ছিলেন। আর অক্ষম ও পরমুখাপেক্ষী কখনো খোদা হতে পারে না।

আমি আরো বললাম, আপনাদের ধর্মে আরো একটি বিষয় এমন আছে যা মানব প্রকৃতির বিরোধী। মানব তদনুযায়ী চলতে অক্ষম। যেমন আজীবন বৈবাহিক বন্ধন থেকে বিমুখ। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা যৌবন দান করেছেন এবং যৌবনের উন্মাদনা হ্রাস করার জন্য বৈধ পন্থাও বাতায়ে দিয়েছেন। যৌবনের পাগলামীতে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। তাই বিবাহ প্রথা বাতলিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়াতে মানুষ আগমনের রাস্তা এটাই। আপনারা স্বেচ্ছায় বিবাহ-শাদী বাদ দিয়ে সংসারত্যাগী হয়ে যান। তখন রাহেব বা নান নাম ধারণ করে গির্জায় থাকেন। এসব সংসারত্যাগী যুবক রাহেব ও রাহেবাগণ যখন একত্রে উঠাবসা করেন, আর যা সংঘটিত হয় তা কার অজানা আছে? এখানে

এমন কোন রাহেব আছেন কি যিনি কুমারী নারীকে ধর্ষণ করেননি? যদি থাকেন তবে হাত তুলে পরিচয় দিন! উক্ত মজলিসে কোন একটি হাত উঠেনি। অতঃপর আমি আর সামনে না বেড়ে বললাম, জনাব পাদ্রী মহোদয়গণ! আমার এসব জিজ্ঞাসার জবাব আশা করি আপনাদের থেকে পাব। সে আশা রেখে আজকের আলোচনার সমাপ্তি টানলাম। এতটুকু বলে আমি চেয়ার ছেড়ে অন্যসব খৃস্টানদের সারিতে এসে বসলাম।

শ্রোতামণ্ডলী অপলক নেত্রে প্রধান পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। পাদ্রী লজ্জা ও অনুশোচনায় কি বলবে না বলবে তা ঠিক করতে পারছেন না। তিনি একটু আম্‌তা আম্‌তা করে গলা খাকড়িয়ে বললেন, "প্রাণাধিক মুসাফির মিয়া! তোমার উপর খোদাওন্দ যীশুর রহমত বর্ষিত হোক। তাঁর কৃপা দৃষ্টিতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হোক। তার ভেদ বোঝার তওফিক দান করুক।

প্রিয় বৎস! তুমি যেসব প্রশ্ন পবিত্র বাইবেল থেকে করেছ, তা সবই সত্য। এক একটি প্রশ্ন বুঝতে হলে যুগ যুগ সাধনা করতে হয়। খোদাওন্দের ভেদ অত সহজে বোঝা যায় না। আশা করি তুমি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে চরম সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে। তারপর তোমার এলেমের রুদ্ধদ্বার খুলে যাবে। তখন সবকিছুই বুঝতে পারবে।

পাদ্রী সাহেবের কথা শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আপনারা এত বৎসর সাধনা করে কি কিছু বুঝেছেন? আপনারা সাধনা করে যা বুঝেছেন আর আমি সাধনা ছাড়াই তার চেয়ে বেশী বুঝি। অযথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনাদের যদি হিম্মত থাকে তবে আমার ধর্মের সরিষা পরিমাণ ভুল ধরে দিন। আমার ধর্ম নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে করুন। বিলম্ব না করে এখনই সমাধান দিয়ে দেব। এসব প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে খৃস্টধর্মের তাবলীগ করুন এতে কোন আপত্তি নেই। ধর্মের নামে ধোঁকাবাজি ছেড়ে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করুন। এতে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পাবেন।" এতটুকু বলে আমি শয্যা গ্রহণ করলাম।

পাদ্রীগণ আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিতে পেরে দিলের মধ্যে শত শত খটকা নিয়ে আপন আপন কক্ষে গিয়ে বাকি রাত শুধু চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে কাটিয়ে দিল।

॥ তের ॥

সুবহে সাদিকের সূর্য নূরে পূর্বাকাশ রাঙ্গা হয়ে উঠছে। পাখ-পাখালীর কলরবে রাতের নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছে। প্রভাতের শীতল হাওয়া ঝির ঝির করে বইছে। পুষ্পডালে বুলবুলিরা নাচানাচি করছে আর শীষ দিচ্ছে। মোরগ ডাকছে,

কেকা-কেকি পালক মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুভ্র বর্ণের মেঘ খণ্ডরা আকাশতলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যান্য পাখ-পাখালীরা ভোরের আগমন, রাতের পলায়ন গান জুড়ে দিচ্ছে।

অন্যদিনের মত কোন পূজারী গির্জার গেটে ঝুলানো বড় ঘন্টায় আঘাত হানছে। ঢং ঢং আর্তনাদে খৃস্টানদের জানিয়ে দিচ্ছে ঘুম থেকে জেগে ওঠ! হাতমুখ ধুয়ে গির্জায় এসে প্রার্থনায় রত হও। এখন আর ঘুমের সময় নেই। আমরা শয্যা ত্যাগ করে অজু এস্তেঞ্জা সেরে নামায আদায় করলাম। তারপর তাছবিহাত আদায় করে এদিক-ওদিক পায়চারী করতে লাগলাম। চেয়ে দেখি অন্যদিনের মত গির্জায় ভীড় নেই। নেই পূজারীদের কোলাহল। দু'একজন পাদ্রী মনমরা অবস্থায় বসে বসে কি যেন ভাবছে। মনে হয় যেন উপাসকদের অনুপস্থিতিতে গির্জাটি নীরব ভাষায় বিলাপ করছে। গির্জার এ করুণ দশার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ মনে পড়ল রাতের বহেছের কথা। ভাবলাম পাদ্রী সাহেবগণ আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে বোধ হয় লজ্জায় গির্জায় আসেনি। ঘরে বসে হয়ত এবাদতে লিপ্ত আছে। আমি চলে গেলে হয়ত গির্জায় ফিরে আসবে। রাহেবা মিস্ মেরী গমেজও গির্জায় অনুপস্থিত। আমরা তিনজন ফাদারের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মেরীর গির্জার দিকে পা বাড়াচ্ছি। এমন সময় চেয়ে দেখি ব্লু-পাইরের শ্বেতবর্ণের কাপড় পড়ে এবং চপ্পল পায়ে দিয়ে মেরী গমেজ আমাদের পিছু পিছু চলছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর গির্জায় এসে পৌছলাম।

আমি সেখান থেকে চলে আসার পর জানতে পারলাম, সেখানকার রাহেব, রাহেবা ও নানদের মধ্যে পরস্পর গুঞ্জরিত হচ্ছিল আমার আলোচনা নিয়ে। কেউ বলছে, "এতগুলো বড় বড় পাদ্রীর সম্মুখে ছেলেটি অনর্গল খৃস্টধর্মের দোষগুলো বর্ণনা করে গেল, আর আমরা হাবার মত মুখ বন্ধ করে শুধু শুনেই গেলাম। কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করার সাহপ পেলাম না।"

কেউ বলেছে, "আরে! ছেলেটি যা বলছে তা তো সম্পূর্ণই সত্য বলেছে, পবিত্র বাইবেল ছাড়া একটি শব্দও বলেননি। তার একটি প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত কোন পাদ্রী দুনিয়াতে আছে বলে মনে হয় না। আসলেই আমরা মিথ্যার উপর হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তা কোন পাদ্রী সাহেব বুকে হাত রেখে আমার সামনে বলতে পারবে কি?"

অন্য একজন রাহেবা বলল, "আমরা বিবাহ-শাদী বাদ দিয়ে সংসার ত্যাগ করে বিবি মরিয়মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গির্জায় আশ্রয় নিয়েছি। আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের যৌনাঙ্গ হেফাজত করতে পেরেছি? সতীর তালিকায় কি আমাদের নাম রয়েছে? রাহেবগণ রবিবারের ক্ষমার আশায় আমাদের সাথে

অহরহ ব্যভিচার করে চলছে, আর সাধারণ খৃস্টানরা আমাদের সতী-সাধ্বী মনে করছে। এ যৌন খেলার নামই কি সাধনা?"

অপর একজন পাদ্রী বলল, "আরে! তোমরা যা কিছুই বল না কেন, গোমর ফাঁক হয়ে গেছে। সত্যের আলোতে মিথ্যা প্রকাশ পাচ্ছে। দেখ না দু'চার দিনের মধ্যে কতজন খৃস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। গির্জায় বসে বসে আর ডালভাত জুটবে না। গোটা রাজ্যে গতরাতের কর্মকাণ্ডের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা এতগুলো পাদ্রী যে একজন ছেলের নিকট চরমভাবে পরাজিত হয়েছি তা সকলের কানেই পৌঁছেছে। সাধারণ খৃস্টানদের পক্ষ থেকে হাদিয়া তুহফার পরিবর্তে পাব থুথু আর গালি। এমন কি লাঠিও ভাগ্যে জুটতে পরে।" অন্য একজন বয়স্ক রাহেব বললেন, "আমাদের প্রধান পাদ্রী বা ফাদার যে কয়টি কথা বলেছেন, তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি? তিনি যদি চুপ থাকতেন তবু আমরা চুপ থাকাটার একটি তাবিল করে পরিস্থিতি অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করতাম। তিনি মুখ খুলে তো আমাদের চরম দুর্বলতা ও ব্যর্থতা প্রকাশ করে দিলেন।"

অন্য একজন বলল, "আরে, সত্যের বিজয় একদিন হবেই হবে। প্রধান পাদ্রীকে দোষারোপ করে লাভ নেই। যে ধর্মে এত সব মিথ্যা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ভণ্ডামি, যেসব প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না, এটা আবার ধর্ম হল কিভাবে? ধিক্কার এ ধর্মের। ধিক্কার মানব রচিত ইঞ্জিল আর বাইবেলের উপর। আজ থেকে এ ধর্মের মাথায় পদাঘাত করে বেরিয়ে গেলাম।"

অপর একজন বলল, "এটা যে মিথ্যা আর কাল্পনিক ধর্ম তা আগেও জানতাম। কিন্তু বাপ দাদারা এ ধর্মে জীবন কাটিয়ে গেছে বিধায় আমিও ছিলাম। যুগ যুগ সাধনা করে কি পেলাম? উত্তর আসবে কিছুই না। অতএব এ ধর্মের মুখে চুনকালি মেখে আমিও বিদায় নিলাম। এখন থেকে আমাকে ব্যভিচারের আড্ডাখানায় আর দেখবে না। আমার বই পুস্তক আগুনে জ্বালিয়ে, বেডিং পত্র গুছিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির পথে পা বাড়াব।"

একজন অল্প বয়স্কা নান বলল, "এতগুলো খৃস্টান এখানে মওজুদ থাকতে ভিনদেশী অপরিচিত তিনজন যুবক জীবন বাজি রেখে বলসেবিকদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। রক্ষা করেছেন আমাদের মান-ইজ্জত ও গির্জাকে। এটা কত বড় কথা? আমরা এসব যুবকদের কাছ দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি, একটিবার তারা আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। তাদের নজর সব সময় নিম্নদিকে দেখেছি। এরা যে কত পুতঃপবিত্র তা কল্পনা করতেও অবাক লাগে। আমরা কত মিথ্যুক আর ধোঁকাবাজ তা প্রধান পাদ্রী সাহেবের পরামর্শ দ্বারাই

বোঝা যায়। গত ক'দিন আগে মাননীয় ধোঁকাবাজ, দাগাবাজ ও বাটপার প্রধান পাদ্রী সাহেব আমাকে সহ আমার তিন সহচরীকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে বলল, "সিস্টার! তোমাদের উপর প্রভু যীশুর করুণা মুষলধারে বর্ষিত হোক। তোমরা সবাই মিলে নবাগত তিন মুসাফিরকে তোমাদের রূপের জালে আটকে ফেলবে। তোমাদেরকে খোদাওন্দ যীশু যে রূপ-লাবণ্য এবং স্বাস্থ্য দান করেছেন এ রূপ-লাবণ্য আর যৌবন উজার করে দাও। এতে যীশুর সন্তুষ্টি পাবে। তিনি আরো বলেছিলেন, "তোমরা পরীর সাজে সেজে গুজে এমনভাবে তাদের নিকট যাবে এবং এমন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করবে যে, ওরা যেন ঠিক থাকতে না পারে। যৌন উন্মাদনায় অস্থির হয়ে যেন তোমাদের দেহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথবা তোমরা নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়বে। দু'একবার এরকম করতে পারলে তোমাদের ফাঁদ থেকে আর বেরিয়ে যেতে পারবে না।"

ফাদারের নির্দেশে আমরা বহুবার নিরবে, নির্জনে, দিনে ও রাতে এ কৌশল অবলম্বন করেছি। কিন্তু সেসব সাধু যুবকদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাইনি। আমাদের পীড়াপীড়ি, আর বাড়াবাড়ির কারণে তাদেরকে দেখেছি শয্যা ত্যাগ করে অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতে। তাদের হাত, তাদের চোখ আমাদের দিকে আসেনি। একবার আমাদের আচরণে অতিষ্ট হয়ে গভীর রাতে আমাদেরকে এক জায়গায় বসিয়ে একজন বললেন, "দেখ বোন! আমরা মুসলমান, তোমরা আমাদের থেকে যা চাচ্ছ তা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এটা আমাদের ধর্মে মহাপাপ। এটা তোমাদের ধর্মে থাকলেও আমাদের ধর্মে নেই। আমরা সব সময় ধর্মের অনুশাসন মেনে চলি।" তখন আমি বললাম, "প্রিয়তম! এ গভীর রাতে, অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আমরা আনন্দ-ফূর্তি করলে তা কেউ দেখবে না। তাহলে অমত হচ্ছেন কেন?" তিনি আমার কথার উত্তর এভাবে দিলেন, "বোন! তোমার কথা সত্য, এখানে আমরা যা করি তা কেউ দেখবে না। কিন্তু আমার আল্লাহ্ তো সবখানেই আছেন, সবকিছুই দেখেন, তিনি তো ঘুমাননি। আল্লাহ্র দৃষ্টির আড়ালে যদি নিয়ে যেতে পার তবে চল, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। তিনি আরো বললেন, "স্বেচ্ছায় যদি কেউ কামভাব নিয়ে অন্য নারীর প্রতি তাকায়, তাহলে কাল কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। আমরা যুবক, যৌবন আমাদের কানায় কানায় ভরা। তোমরাও যুবতী, যৌবন জোয়ার ঢেউ খেলছে তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। যদি আল্লাহ্র বিধান থাকত, তবে তোমাদের বিমুখ করতাম না। আমরা যদি এখানে স্থায়ী হতাম তাহলে বলতাম, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর আমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও, তারপর...।"

এসব কথা শুনে লজ্জায় ও অনুশোচনায় মাথা নত হয়ে গেল। তখন আমি ভাবছিলাম, আমাদের লম্পট ফাদারের কথা। এ ঘটনার দ্বারা আপনারাই বিচার করুন, মুসলমান আর খৃস্টানের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? সে ঘটনার পর থেকে আমি ইসলামকে মনে প্রাণে ভালবাসি ও সত্য বলে জানি। আর খৃস্টধর্মকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি এবং ঘৃণা করি খৃস্টানদের। তোমরা কে কি কর, কার দৌড় কতটুকু আর কে কত পবিত্র তা আমার জানা। আমাদের প্রধান পাদ্রী, আধ্যাত্মিক পিতা যোহনকেও আমি চিনি, যার কাছ থেকে তার নিজের কন্যাও...।"

আমার আখেরী নছিহত এটাই, তোমরা ভণ্ডামি ছেড়ে দিয়ে সরল সঠিক পথ বেছে নাও। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে ইসলাম কবুল কর।" এই বলে মেয়েটি রাহেবদের বাসভবন থেকে প্রধান পাদ্রীকে না বলে বেরিয়ে গেল। তার সাথে তার ১০/১২ জন অনুসারীও চলে গেল। এভাবে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে দু'চারজন করে গির্জা ত্যাগ করতে লাগল। খৃস্টধর্মের ভীত নড়ে গেছে ভূ-কম্পন আরম্ভ হল।

৪/৫ দিনে ৭/৮জন পাদ্রী ছাড়া সবাই গির্জা ছেড়ে চলে গেল এবং ছোট গির্জায় এসে আমার নিকট ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। মেয়েদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে পর্দা করার হুকুম দেই। যারা ইসলাম গ্রহণ করতেছিল তারা সবাই ছিল উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞানীগুণী। যে কোন বিষয় তারা অতি সহজে বুঝে ফেলে। প্রাথমিক অবস্থায় তাদের আকিদাগত এলেমের জ্ঞান খুবই জরুরী হয়ে পড়ে। তাই নিয়মিত আকিদা, পাক-নাপাক, হালাল-হারামের উপর আলোচনা চলল। মেরীর গির্জাটি এখন মাদ্রাসায় পরিণত হয়ে গেল। মেরীও মাঝে মধ্যে আমাদের মজলিসে বসে, আবার দূরে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনে। কিন্তু মেরীর পক্ষ থেকে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না। আমিও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। দিন রাত তালিম চলছে। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গির্জা এখন সকাল সন্ধ্যায় জিকিরে মুখরিত হয়ে উঠে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমরা গির্জায়ই আদায় করি। খৃস্টানদের কেউ নেই যে গির্জায় মাথা ঠুকবে।

॥ চৌদ্দ ॥

রাহেবা মিস্ মেরী গমেজ, প্রধান গির্জার প্রধান ফাদার যোহনের একমাত্র ষোড়ষী কন্যা। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা। বাপবেটি ইংল্যান্ড থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে উস্তুবারে এসে দুর্গম এলাকায় গির্জা স্থাপন করে নিরীহ মানুষদেরকে টাকা পয়সা ও নারী-গাড়ীর লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। মিশনারীর নামে প্রচুর অর্থ আসে ইংল্যান্ড থেকে।

উস্তুবারের মানুষ খুব সরল-সোজা। লেখাপড়া অত জানে না। ধর্মকর্মের দিক দিয়েও উদাসীন। চাষাবাদ ও পশুপালনই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। মিশনারীরা সুকৌশলে উস্তুবারের কৃষকদেরকে কিছু কিছু করে ঋণ দিত। এক সময় ঋণের বোঝা এমন বেড়ে যেত, তা আর কিছুতেই পরিশোধ করতে পারত না। তখন সে সব কৃষকদের কাছ থেকে নামে মাত্র অর্থের বিনিময়ে তাদের জমি ইজারা হিসাবে বন্দোবস্ত করে নিত। সে সব জমিতে গম, ভুট্টা ও আলু চাষ করত। অল্প পারিশ্রমিকের দ্বারা কৃষকদের শ্রম নিত। এভাবে হাজার হাজার পরিবার দেউলিয়ায় পরিণত হয়। সেসব কৃষকরা গির্জাওয়ালাদের নিকট রীতিমত জিম্মি হয়ে যায়। ফাদারের নির্দেশ ছাড়া কিছুই করতে পারে না তারা।

খৃস্টানদের মধ্যে যখন এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, তখন নিরীহ কৃষকগণ গির্জাবাসীদের পক্ষ ত্যাগ করে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এরাও দলে দলে ইসলাম কবুল করতে লাগল। আমরা তাদের দুরবস্থার কথা শুনে কৃষকদের ডেকে বলে দিলাম, জমি আগে যার ছিল, এখন তারই থাকবে। গির্জাবাসীদের ভাগ দেয়া লাগবে না। ওদের ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে। কেউ যদি ভাগ দাবী করে তবে সকল কৃষক মিলে তার বিচার করবে। অন্যথায় আমাদের কাছে বিচার দায়ের করবে। আমরা তার উচিৎ বিচার করে দেব। আমার ঘোষণার পর কায়েমী স্বার্থবাদী খৃস্টানরা আমার বিরুদ্ধে লেগে গেল। কি করে আমাকে এ এলাকা থেকে তাড়ানো যায় বা জীবনে শেষ করে দেয়া যায় তা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগল। এ সংবাদ আমরা কেউ জানতাম না। এ ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক স্বয়ং ফাদার।

আমি ২৪ ঘন্টা নওমুসলিমদের তালিম তরবিয়ত নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ওয়ায়েভ ও উছায়েদ ওরা দু'জন নিয়মিত জিহাদের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্র ও গোলা বারুদ ওরাই হেফাজত করছে। মেরীর খাদেম খুদ্দামরা পূর্বের ন্যায়ই আমাদের দেখা-শোনা ও খায়-খেদমত করে যাচ্ছে। মেরীর গির্জার অধিকাংশ যুবকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। অন্যরা গির্জা থেকে পালিয়ে গিয়েছে। পালিয়ে যাওয়া যুবকরা হয়ত মিস্ মেরীর অনুগ্রহ, দয়া ও ভালবাসা পাওয়ার জন্যই এখানে পড়ে থাকত। আমার এ ধারণাটা একেবারে অমূলক নয়। কারণ সুন্দরীর দেহরত্ন অপরূপ যৌবন গরিমায় লাবণ্যমণ্ডিত। প্রস্ফুটিত কুসুমের সুরভিত সুষমায় তনু দেহ অপার্থিব মহিমায় গৌরবান্বিত। চঞ্চলা হরিণীর এক জোড়া চক্ষু যেন ধার করে এনেছে। বাঁকা চোখের চাহনীতে প্রেমিকের মন কেড়ে নেয়। ললিতাঙ্গের লীলায়িত গতিছন্দে প্রিয়জনের হৃদয় তন্ত্রীতে মধুর ঝংকার তুলতে থাকে। কোকিলকণ্ঠি, বিনিন্দিত সুধাময় সুর লহরীতে প্রেমিকের প্রাণে

মোহের আবেশ জাগিয়ে তুলে। চিরল চিরল শুভ্র দন্তপাটির মুচকি হাসি দেখতে খুবই ভাল লাগে। তার উজ্জ্বল গৌরকান্তি ও অনুপম গঠন সৌষ্ঠব প্রেমিকের নয়ন-মন হরণ করে বিরহী প্রাণে প্রেমের মূর্ছনা জাগায়। কোন বৃদ্ধ লোকও যদি তার দিকে এক নজর তাকায় তাহলে তার হৃদয়াকাশে যৌবন তড়িৎ খেলা করতে থাকবে। ইংল্যান্ড দুলালী হওয়ার কারণে তার কুন্তল গুচ্ছ কিছুটা ফ্যাকাশে দেখায়। এতে তার সৌন্দর্যের কোন ভাটা পড়েনি। এ যেন আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি। রাহেবা মিস্ মেরী গমেজের সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক লেখকের কলম থেমে যায়। যে যত ভাষা প্রয়োগ করে তার অপূর্ব সুন্দরের বর্ণনা করুক না কেন, তার চেয়েও সে সুন্দর। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতির দিক দিয়েও তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। বুক ভরা দয়া, কপটতা মুক্ত অন্তর তার। খৃস্টান ঘরে জন্ম নিলেও অনেক গুণ আছে তার। সত্য-মিথ্যা আর হক-বাতেলের পার্থক্য করতে জানে।

রাতের আলোচনার পর তার হৃদয়ে সত্যের জ্যোতি চমকাচ্ছিল। বহুদিন ত্যাগ সাধনার পর যেন তার হৃদয়াকাশে সত্যের সূর্য উদিত হল। ছোটবেলা থেকে ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেও হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন করতে পারেনি সে। কেমন যেন গোলক ধাঁধাঁ আর ধূম্রকুণ্ডলীতে বারবার আছড়িয়ে পড়ছিল। শত সহস্র প্রশ্ন প্রশ্ন আকারেই রয়ে গেল। তার কোন জবাব মেলেনি ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে। পাদ্রীদের প্রশ্ন করলে এক ধমকে বসিয়ে দিত এবং বলত এগুলো খোদার ভেদ। তা বোঝার দরকার হয় না। আজ তার হৃদয়ের দ্বার খুলেছে। সে আজ আনন্দিত, উৎফুল্ল ও গৌরবান্বিত।

দু'তিন দিন পর ফাদার যোহন জানতে পারল, মেরী গমেজের গির্জা মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে। মেরী পূর্বের মত সেবা করে যাচ্ছে। তার পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে না। এ সংবাদে যোহনের মাথার উপর দিয়ে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। চোখে দেখছে যীশুর নূর। ঘুম, নাওয়া-খাওয়া পালিয়ে গেছে কোন সুদূরে। চোখের সামনে যা ঘটছে এগুলো অশুভ সংকেত বলেই মনে হচ্ছে।

ফাদার যোহন তার দু'চারজন হাওয়ারিযীনদের ডেকে পরামর্শে বসল। সে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, "প্রিয় পাদ্রী মহোদয়! আজ আমাদের ধর্মাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। বজ্র নিনাদে ধর্মের ভীত কেঁপে উঠছে। এতদিন পর্যন্ত যাদেরকে নিয়ে মিশন চালাচ্ছি, যাদের পিছনে অকাতরে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছি, তারা সবাই কাফের হয়ে গেছে। ধর্ম ত্যাগ করেছে। যাদেরকে আমরা অসহায় হিসাবে গির্জায় আশ্রয় দিয়েছি তারাই আজ সর্বনাশ করে দিয়েছে। শুনেছি আমাদের চাষীরাও মুসলমান হয়ে এক জোট হয়ে গেছে। এখন

থেকে ওরা নাকি আমাদের ভাগ দেবে না। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমাদের কি করণীয় তা আপনাদের কাছে জানতে চাই।"

এক পাদ্রী কপাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "হুজুর! আমরা তো আজ তিনদিন যাবৎ উপোস থেকে খোদাওন্দ যীশুর উপাসনা করছি ও প্রার্থনা করছি। কোন একটি দোয়াও কবুল হয়নি। এত বৎসর তপস্যা করে কি পেলাম? মানুষের উপর সুকৌশলে কম নির্যাতন করিনি। তা কে না জানে? আমরা সবাই মিলে যুবকের একটি কথারও উত্তর দিতে পারিনি। এরচেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে? আমরা ও আমাদের ধর্ম যে অলীক, তা সবাই বুঝে নিয়েছে। এখন আর আমাদের করণীয় কিছুই নেই। চলুন, তল্পিতল্পা গুছিয়ে ইংল্যান্ডের দিকে পাড়ি জমাই। এদেশে আর থাকা যাবে না।

অন্য এক পাদ্রী বলল, "জনাব! এদেশে থাকা যাবে না তা সত্য। তবে যাবার আগে নবাগত মুসলমাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। ওদের কারণেই আমাদের এ দুর্দশা। যে কোন মূল্যে তাদেরকে এ এলাকা থেকে উৎখাত করতে হবে। এটাই আমার পরামর্শ। এখন ফাদার যা মনে করেন।"

ফাদার বলল, "আপনার চিন্তার সাথে আমিও একমত। তবে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত, সে পরামর্শ চাই।"

পাদ্রী বলল, "ওদের সাথে শক্তি ও তর্কে আমরা পারব না তা সত্য, কিন্তু কূটনীতির দিক দিয়ে ওরা আমাদের সাথে কিছুতেই টিকবে না। আমার মনে হয় সে পথে পা বাড়ালে আমরা সফল হব।"

ফাদার বলল, "সে পদ্ধতিটা কি হবে সেটাই তো জানতে চাচ্ছি।"

পাদ্রী বলল, "ওরা হল গোড়া মুসলমান আবার মুজাহিদ। আমরা যদি বলসেবিকদের সাথে আঁতাত করে তাদেরকে ধরিয়ে দেই, তাহলে ফায়দা হবে দুইটা। একদিকে আমাদের দুশমন নিপাত হল, অপরদিকে দুশমনের অপর পক্ষ বন্ধু হল।"

ফাদার বলল, "বলসেবিকরা যে মার খেয়েছে দু'চার বৎসরে ওরা এদিকে আসবে না। দেখলেন তো সেদিন মাত্র কয়জনে লাশের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছিল।"

অপর পাদ্রী বলল, "মুজাহিদরাও আমাদের শত্রু আবার বলসেবিকরাও শত্রু। আমার মতে মুজাহিদরা ভাল বলসেবিকদের থেকে। কারণ, ওরা কোন গির্জা ধ্বংস করেনি, কোন খৃস্টানদের হত্যা করেনি, বরং আমাদের উপকারই করেছে।"

ফাদার বলল, "উপকার করেছে তা ঠিক, কিন্তু ধর্মের তো বারটা বাজিয়ে ছাড়ছে।"

"পাদ্রী বলল, "সে দোষ তাদের নয়, আমাদের। আমরা তার একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিনি।"

ফাদার বলল, "সে যাই হোক, ওকথা বাদ। এখন বলসেবিকদের দ্বারাই তাদের বিচার করতে হবে। তোমরা আজই মেরীকে ডেকে পাঠাও। তার সাথে একটু বোঝাপড়া করে সেখানকার অবস্থা জেনে নেই। তারপর আগামীকালই তোমাদেরকে ওয়াযদুনে পাঠাব। ওয়াযদুন শহরে তাদের বিশাল ঘাঁটি রয়েছে। সেখানে খবর দিলেই হাজার হাজার ফৌজ এসে যাবে।"

পাদ্রী বলল, "এ সংবাদ যদি মুজাহিদদের কানে পৌঁছে তাহলে আমাদের কিন্তু রক্ষা নেই।"

ফাদার বলল, "সে সংবাদ প্রকাশ হবে কেন? আমাদের পক্ষ থেকে যদি প্রকাশ না হয় তাহলে কেউ জানবে না।"

পাদ্রী বলল, "আমাদের যারা ছিল, ওরাইতো আজ দুশমনে পরিণত হল। সংবাদ ছাপি থাকে না।"

ফাদার বলল, "এতসব চিন্তা করে কাজ করা যাবে না। যাও এক্ষুণি গিয়ে মেরীকে নিয়ে আস। ওর সাথে যেন অন্য কেউ না আসে। যাও জলদি যাও।"

॥ পনের ॥

ফাদার যোহনের সংবাদ পেয়ে মেরী গমেজ চলে গেল পিতার গির্জায়। খাদেমদেরকে গোপনে বলে গিয়েছিল আমাদের খানা-পিনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে। সে পিতার সান্নিধ্যে চলে গেছে তা আমি জানতাম না। সে ছিল আমার দরসের অন্যরকম একজন শ্রোতা। তার অনুপস্থিতিতে মনে হচ্ছিল দরসগাহের এক অংশ যেন কি হয়ে গেল। মেরীর অনুপস্থিতিতে আমার খারাপ লাগায় পাঠক হয়ত অন্য কিছু মনে করতে পারেন, আসলে তা নয়। সে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো অপ্রকাশ্যে আমার তালিম শুনত। এ লুকোচুরির মধ্যেই সে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছে। হৃদয় আকর্ষণের অর্থ এই নয় যে, আমি তার প্রেমের ফাঁদে আটকে গিয়েছি। আসল কারণ এটাই যে, এমন একজন অপূর্ব সুন্দরী তরুণী জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে, তা আমার মন মানতে পারছিল না। আমার একান্ত অভিপ্রায় এটাই ছিল যে, সে ঈমান এনে মোমেনা হয়ে যাক। তার দ্বারা ইসলামের যে খেদমত হবে তা অন্য দশজনের দ্বারা হবে না। আমার আলোচনাগুলো বেশীর ভাগ তাকে লক্ষ্য করেই হত। সে কিছুই না বলে হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। বিকালেও নেই, সন্ধ্যায়ও নেই। কারো কাছে জিজ্ঞাসা করাও লজ্জার কারণ ছিল। অনেকেই হয়ত অন্যকিছু ধারণা করে বসবে।

রাত দশটায় রাতের তালিম বন্ধ করে এশার নামায আদায় করে খানাপিনা সেরে সবাইকে ঘুমানোর নির্দেশ দিলাম। সবাই গির্জা অলিন্দে আর অন্য সব কক্ষে শয্যা রচনা করে শুতে গেল। আমিও অন্যদিনের মত মেরীর বিশাল কক্ষের একটি খাটে শুতে গেলাম। রাত গভীর থেকে গভীরে পৌছেছে এখনো মেরীর কোন সাড়া শব্দ নেই। সে যেখানেই যাক না কেন আমার কাছে না বলে যাওয়ার কথা না। তাহলে এমনটি কেন করল সে! এসব নিয়ে কেবলই ভাবছি আর ভাবছি। আবার এও দিলে উঁকি ঝুঁকি মারছিল যে সে তো এখনো ঈমান গ্রহণ করেনি। খৃস্টানরাতো আমাদের প্রকাশ্য শত্রু, জাত শত্রু। নাকি তার ভিতরে দুরভিসন্ধির বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে? আমাদের ক্ষতি সাধনের চিন্তা করছে? এসব নিয়ে ভাবছি। চোখে ঘুম নেই। সে শুধু একাই যায়নি, সঙ্গে নিয়ে গেছে আমার আরাম, চাইন ও নিদ্রা।

ওয়ায়েভকে ডেকে বললাম, রাতের পাহারা জোরদার করতে এবং সতর্ক অবস্থায় থাকতে। কে জানে কোন অঘটন সংগঠিত হয়। ওয়ায়েভ সবাইকে ডেকে সশস্ত্র অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেয় এবং পাহারাদারীতে লোক বৃদ্ধি করে।

আমি বিছানায় কখনো বসছি আবার কখনো শয্যা গ্রহণ করছি। অঘুম নয়নে ছটফট করছি। মেরীর সংলগ্ন রুমে ৮/১০ জন পরিচারিকা থাকে। ওদের প্রধান উনাইছা। দেখতেও সুন্দরী, বুদ্ধিও পাকা। মেরী তাকেই বেশী সঙ্গ দিয়ে থাকে। বেশী পরামর্শ তাকে নিয়েই করে। অন্যদের তুলনায় সে একটু লাজুক প্রকৃতির। কথাবার্তাও কম বলে। কথাবার্তা কম বললেও দু-তিনদিন দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি ও মুজাহিদদের কর্ম তৎপরতা নিয়ে বেশ আলাপ হয়েছে। সে থেকেই তাকে বুদ্ধিমতি হিসাবে চিহ্নিত করেছি। সে অনেক সময় আমার খানা পরিবেশন করেছে।

রাত গভীর। বিশ্ব প্রকৃতি ঘুমে অচেতন। আমার রুমের প্রদীপ এখনো আলো বিচ্ছুরিত করছে। হঠাৎ কোন দরজা খোলার সামান্য আওয়াজ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। এতে বিচলিত হইনি। কারণ অন্য কোন মাথা ব্যথা নেই আমার। আমি অন্যমনস্ক। তাকিয়ে আছি উপর দিকে। হঠাৎ অনুমান করলাম কার যেন পা আমার খাটের নিকট এসে থেমে গেল। আমি হতচকিত হয়ে এদিকে তাকিয়ে দেখি যে সে আর কেউ নয়, মেরীর প্রধান সেবিকা উনাইছা। এত গভীর রজনীতে কেন তার কামরা ছেড়ে আমার কামরায় আগমন, তা ভেবে পাচ্ছি না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম, "উনাইছা! তুমি এখানে?"

"হ্যাঁ ভাইয়া! আপনার সাথে জরুরী আলাপ আছে তাই।"

"হঠাৎ এত কি জরুরী আলাপ?"

"অবশ্যই জরুরী, বললে শুনবেন?"

"আরে, আমি ভাবছি আমি একাই বুঝি রাত জেগে আছি। এখন দেখি আরো আছে। আচ্ছা বল বোন, তোমার কি কথা আছে?"

"এখানে নয়, বাইরে যেতে হবে, নিরিবিলিতে।"

"শীত যে খুব বেশী।"

"দেখুন না, আপনার জন্য সাহেবার (মেরীর) কম্বল নিয়ে এসেছি। এর ভিতর ঢুকলে আর...।"

"কোথায় যাবে?"

"ঐ তো পাশের বাগানে।"

"চল।"

আমরা দরজা খুলে বাইরে আসার সাথে সাথে দু'জন প্রহরী দৌড়ে আসল। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "হযরত! কোনকিছুর প্রয়োজন আছে কি?" আমি বললাম না, একটু বাগানে যাব। প্রহরী দু'জন চলে গেল। আমরা পুষ্পকাননের এক কোণে বাদাম তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে গেলাম। শিশিরগুলো তুষার কণায় পরিণত হয়ে বৃক্ষপল্লবের গা ছুঁয়ে নিচের দিকে পড়ছে। আমি উনাইছাকে লক্ষ্য করে বললাম, "কি বলতে চাচ্ছ বোন, বল। নির্ভয়ে বলতে পার।"

উনাইছা কোন ভূমিকা না টেনে বলল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে আমাদের সাহেবা পিতার নিষ্ঠুর কারাগারে বন্দী।"

"তোমার সাহেবা মানে কে?"

"আপনার সে ব্যক্তিটি, যাকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।"

"আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি! সে আবার কে? আমার কাছে সবাই তো এক সমান।"

"তা বটে! তবে যাকে খেতাব করে দরসের মধ্যে বেশী আলোচনা করেন, সে ব্যক্তি।"

"আমাকে অহেতুক দোষারোপ করো না; পেরেশানে ফেল না, খুলে বল সেই কোন জন?"

"আমি তার মুখেই আপনার ভূয়যী প্রশংসা শুনেছি। সেই বলেছে, এক আজনবী মুসাফির আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। আমার মনপ্রাণ সে চুরি করে নিয়েছে। তার পদতলে আমার জীবন বিলিয়ে দিয়ে তার মুখ থেকে ইসলামের অমীয় বাণী গ্রহণ করেছি। সে অন্যদের সাথে সাথে চুপি চুপি ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ সংবাদ হয়ত তার পিতাজির কর্ণগোচর হয়েছে।

তাই সংবাদ দিয়ে নিয়ে গেছে। যাওয়ার পথে গোপনে বলে গেছে সে যদি খৃস্টানদের হাতে বন্দী হয় তাহলে উদ্ধার করতে হবে।"

"সত্যিই কি মেরী ইসলাম গ্রহণ করেছে?"

"হ্যাঁ, সে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছে। তার সহায় সম্পদ সবই ইসলামের খেদমতে বিলিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছে।"

"উনাইছা! আমি তোমার কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছি। এখন সে আমাদের বোন, তার ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা করা শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। সে যেখানেই বন্দী থাকুক না কেন, আমরা তাকে উদ্ধার করবই করব ইনশাআল্লাহ্! তুমি আগামীকাল ভোরে বড় গির্জায় গিয়ে সবকিছু বিস্তারিত জেনে আসবে। তারপর আমরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেব।"

"আপনি বললে আমি যাব, কিন্তু ফলপ্রসূ হবে কি-না তা বলতে পারি না। কারণ, ওরা তো থাকে অন্দর মহলে। আমরা সেখানে যেতে পারি না। আমরা হলাম তাদের চাকরানী, ভিতরে ঢোকার অনুমতি নেই।"

"তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকুই চেষ্টা কর, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন।"

॥ ষোল ॥

সন্ধ্যার একটু আগে মেরী বড় গির্জায় পৌঁছল। সন্ধ্যার ঘন্টা বাজার সাথে সাথে ৮/১০ জন পাদ্রী গির্জায় প্রবেশ করল। ওদের সাথে রয়েছে ফাদার। বেশ কিছুক্ষণ তপ্ যপ্ করে গির্জার মধ্যে স্থাপিত যীশুখৃস্টের প্রস্তর নির্মিত মূর্তির সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসল। অন্যদিনের মত মেরী প্রার্থনায় শরীক ছিল না। এটা সকলের নজরেই চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। তার এহেন আচরণে সবাই ধারণা করে নিয়েছে যে, সত্যিই সে ইসলাম কবুল করেছে। ফাদার যোহন মেরীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, "বলত মা! তোমার গির্জার কি অবস্থা?"

"শ্রদ্ধেয় পিতাজি! আমার এখানকার অবস্থা নিশ্চয়ই আপনি অবগত হয়েছেন। যেহেতু জিজ্ঞাসা করেছেন সেহেতু বলতেই হয়। আমার এখানকার সবগুলো রাহেব, রাহেবা, নান ও পাদ্রীগণ ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছে।"

"বেটি! ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে না কাফির হয়েছে, তা বুঝে শুনে বল।"

"কাফির হয়েছে তা বলিনি, বলেছি ধন্য হয়েছে।"

"ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বল। যেখানে সবাই বেঈমান হয়ে গেছে সেখানে তোমার ভূমিকা কতটুকু?"

"আমার ভূমিকার আগে আপনার ভূমিকার প্রতি নজর দিন। আপনার গির্জার বড় বড় পাদ্রীরা আজ কোথায়? যে গির্জা থাকত লোকে লোকারণ্য, তা আজ বিরাণ কেন? ওরা আজ কোথায়?"

"মা! তুমি তো উত্তেজিত হয়ে কথা বলছ। যা প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দাও।"

"শ্রদ্ধের পিতাজি! আমি ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছি, উত্তেজিত হইনি। আমার প্রশ্নবোধক বাক্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে।"

"তাহলে আমার উপরও তোমার আপত্তি আছে তাই না?"

"আপত্তির কি আছে? আমি কি চার্জ করেছি?"

"মা! ঠাণ্ডা মাথায় কথা বল, তোমাকে ডেকে এনেছি পরামর্শ করার জন্য, বলত বর্তমানে যা হচ্ছে তার কারণ কি?"

"এগুলো খোদাওন্দ যীশুর গোপন ভেদ। এগুলো কেউ বুঝতে পারবে না। তবে চরম সাধনার মাধ্যমে বুঝতে হবে।" (অন্য সব পাদ্রীগণ মেরীর কথায় হাসল)

"এর কোন প্রতিকার নেই?"

"এ ব্যাপারে পেট ব্যথা যার সে যদি প্রতিকার না করেন, তাহলে আমার আপনার পেট ব্যথায় কি আসে যায়?"

"এ ব্যাপারে কার পেট ব্যথার দরকার ছিল?"

"খোদাওন্দ যীশুর। তার বান্দা অন্যরা নিয়ে যাচ্ছে, তিনি ভেদের ভাণ্ড তালা দিয়ে লুকিয়ে আছেন। তাঁর ভেদগুলো যদি আমাদের বুঝিয়ে দিতেন তাহলে আজ এ ভরাডুবি হত না।"

"তুমি তো দেখি আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিলে।"

"শ্রদ্ধেয় পিতাজি! আমি আপনার সাথে তর্ক জুড়ে দেইনি। সত্য যা তাই বলছি। ভেদের ভাণ্ড না খোলা পর্যন্ত এর কোন নিরসন হবে না। আর এটাও সত্য যে, কিয়ামতের ভোর পর্যন্ত ভেদের ভাণ্ড খোলা হবে না। আমি যে কথা বলছি এটাও ভেদ, আপনি যে জিজ্ঞাসা করতেছেন এটাও ভেদ। মিথ্যা, কাল্পনিক বানোয়াট যা আছে সবই ভেদ। যা বুঝে না আসে সেটাও ভেদ। যীশু ভেদ, পাদ্রী ভেদ দুনিয়ার সব ভেদই ভেদ।"

"মেরী! তুমি চরম বেয়াদব বনে গেছ। তুমি শুধু পিতার সাথে বেয়াদবী করেই ক্ষান্ত হওনি। তুমি খোদাবন্দ যীশুর উপরও মন্তব্য করে বসছ। প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু ভেদ থাকে। সেদিন আমি সে কথাটি বলেছি। এখন তুমি বার বার ভেদ ভেদ উচ্চারণ করছ!"

"পিতাজি! আপনি আমার জন্মদাতা পিতা ও শিক্ষাগুরু। আপনি যদি রাগ করেন তাহলে আমরা শিখব কোথায়? যে ধর্মে হাজার হাজার ভেদ রয়েছে, ভেদের কারণে এক পা সামনে অগ্রসর হওয়া যায় না, এ ভেদের জঞ্জালে কে যাবে? যে ধর্মে এত ভেদের বেড়াজাল নেই, সরল সোজা মানুষ এখন সেদিকেই যাচ্ছে। এদেরকে আর বাধা দিয়ে রাখা যাবে না।"

"তাহলে তুমিও কি ভেদের জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়েছ না-কি তা পরিষ্কার করে বল।"

"পিতাজি! রাগ করবেন না, সত্য কথাই বলছি। সেদিন একজন ভবঘুরে ছেলের সম্মুখে কয়েকডজন পাদ্রী থাকতে তার একটি যুক্তিও খণ্ডন করতে পারেননি। তিনি খৃস্টধর্মকে মিথ্যা, কাল্পনিক, বানোয়াট বলে খৃস্ট ধর্মগ্রন্থ দ্বারাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আপনাদের নীরবতার কারণে এখন আমাদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করছে যে, পাদ্রীরা ধোঁকা দিয়ে এতদিন আমাদের শোষণ করেছে। আজ সত্যের আগমনে মিথ্যার অবসান ঘটছে। এসব কথা প্রায়ই শুনতে হয়। যে ধর্মে সমস্যার সমাধান নেই সে ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়ানোটাই সঙ্গত মনে করি। বর্তমানে আমার অন্তঃকরণ ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।"

"হায় হায়! একি বললি মেরী, একি বললি! তোর কারণে আমাদের চৌদ্দ গোষ্ঠী জাহান্নামে যাবে।"

"অন্যায় করেছি আমি, আর জাহান্নামে যাবে চৌদ্দ গোষ্ঠী, এটা কি অবিচার নয়? এমন অবিচারক খোদার অধীনে আমি আর নেই। আপনার খোদা কি বর্তমানে খোন্‌ছা হয়ে গেছেন? আর একটি সন্তান জন্ম দিয়ে আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিলেই তো পারেন। আপনাদের এত চিন্তা কিসের?"

মেরীর কথা শুনে পিতা যোহন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে, চোখ দুটি কপালে তুলে গর্জে উঠে বলল, "কোথায় খোদাওন্দ যীশুর মনোনীত পাদ্রী মহোদয়গণ! হারামজাদী মেরী ইসলাম কবুল করে কাফির হয়ে গেছে। তোমরা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখ। আগামীকাল এর ফায়সালা হবে।"

ফাদারের হুকুম পেয়ে উপস্থিত পাদ্রীগণ নির্মমভাবে হাত পা বেঁধে প্রহার করতে লাগল। প্রহারে প্রহারে তার যবান থেকে বেরিয়ে আসছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্!" এক সময় সে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পাদ্রীগণ তাকে ধরাধরি করে পাতাল পুরীতে নিয়ে গেল এবং দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন আবার পরামর্শ সভা ডাকা হল। পাদ্রীরা সেদিনের মত গির্জায় এসে জমা হল। এখন পাদ্রীর সংখ্যা মাত্র ৪/৫ জন। বাকিরা রাত্রেই পলায়ন করেছে।

ফাদার যোহন সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, "প্রিয় পাদ্রী মহোদয়গণ! আমার মেয়ে কাফির হয়ে গেছে বলে বিচার থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তাকে তোমরা অন্ধকার কুঠুরিতেই হত্যা কর। এটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে মুসলমানগণ আমাদেরকে ছাড়বে না। যাও, জলদি কাজ সমাধা কর।

একজন পাদ্রী বলল, "মাননীয় ফাদার! ওকে হত্যা করা কোন ব্যাপার নয়, খুবই সহজ। আমরা আর একটু চেষ্টা করে দেখি দ্বীনে ফিরিয়ে আনা যায় কি-না।"

"এটা যদি তোমাদের বিশ্বাস হয় যে, দ্বীনে ফিরে আসবে তাহলে চেষ্টা চালাও, ত্রুটি করবে না।"

উনাইছা খুব ভোরে চলে গেল বড় গির্জায় কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারেনি। বাইরের গেটে ইয়া বড় তালা ঝুলছে। গির্জার সবগুলো ফটক সব সময় থাকত উন্মুক্ত, দর্শনার্থী ও পূজারীদের জন্য। আজ তার ব্যতিক্রম। ভিতরে কোন লোকজন আছে কি-না তা মোটেও বোঝা যাচ্ছে না। এমন কোলাহলমুক্ত পরিবেশ আর কোনদিন দেখেনি। উনাইছা বাউন্ডারী ওয়ালের চারপাশ দিয়ে ঘুরে ফিরে চলে এল।

আমি সংবাদের আশায় অস্থির আগ্রহে পথপানে চেয়েছিলাম। উনাইছা ফিরে আসলে সব ঘটনা শুনলাম। মন ব্যথায় ভরে গেল। সাথীদের ডেকে পরামর্শ চাইলাম। উছায়েদ বলল, "হযরত! অবস্থা খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব ওরা বলসেবিকদের আশ্রয় নিয়েছে। এখন আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলুন, আজই এ স্থান ত্যাগ করি। অন্যদিক থেকে মেরীর সন্ধান করব। উছায়েদের কথা মত আমি দশজন মুজাহিদ রেখে অন্যদের বিদায় করে দিলাম। প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলো রেখে বাকি অস্ত্র ওদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম। আর গির্জাবাসীদের বলে দিলাম তোমরা এখানেই অবস্থান কর, দেখ কি হয়? আমি মাঝে মধ্যে আসব। এই বলে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র নিয়ে চলে এলাম।

॥ সতের ॥

কোথায় যাব, কার শরণাপন্ন হব তা নিয়ে ভাবছি। সামান পত্র কম নয়। একেক জনের পৃষ্ঠদেশে ২০/২৫ কেজি রসদপত্র চেপে আছে। বেশ কিছুদূর পথ অতিক্রম করে এক নিভৃত স্থানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। নিয়ে আসা আহার্যগুলো উদরস্ত করে পানি পান করছি। উদ্দেশ্যহীনভাবে চলার কোন অর্থ নেই, তাই সকলের নিকট পরামর্শ চাইলাম কোথায় যাব তা ঠিক করার জন্য।

পরামর্শ দিতে গিয়ে ওয়ায়েভ বললেন, "লোকালয়ে আশ্রয় নেয়া মোটেই নিরাপদ নয়। কাজেই আমাদেরকে কুকান্দুজ বনাঞ্চলের দিকেই যেতে হবে।

জাবালার পর্বতমালা অতিক্রম না করে ছোট ছোট পাহাড় টিলায় আশ্রয় নিলে হাট-বাজারও করা সম্ভব হবে আর খবরাখবর নেয়া যাবে। বাকি হযরতের মর্জি।”

ওয়ায়েভের পরামর্শে সবাই একমত। আমিও তার পরামর্শ সমর্থন করলাম। কারণ বেশী ভিতরে চলে গেলে নওমুসলিমদের তালিমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে আবার মেরীর মুক্তিও প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এসব দিক লক্ষ্য করে কাফেলা নিয়ে কুকান্দুজের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

একটানা ৬ ঘন্টা হাঁটার পর আমরা পার্বত্য এলাকায় এসে পৌছলাম। এখান থেকেই ঘন বনাঞ্চল ও পাহাড় পর্বত আরম্ভ হয়েছে। হিংস্র প্রাণীদের আবাস স্থল। মাঝে মধ্যে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে কলকল তানে বয়ে গেছে বহুদূর। এ এলাকার ঝর্ণা অন্য এলাকার খালের সমান। আমরা উক্ত ঝর্ণার স্নিগ্ধ পানিতে অযু করে নামায আদায় করলাম। তারপর আহারাদী সেরে সবাইকে বিশ্রাম নেয়ার হুকুম দিলাম। আর দু'জনকে পাঠিয়ে দিলাম গিরিকন্দর তালাশ করতে।

খানিকটা পর দু'জন ফিরে এসে বলল, “আল্লাহ্‌র শোকর, মনোরম পরিবেশে এক গিরি কন্দরের সন্ধান পেয়েছি। এক জায়গায়ই লোকজনের সংকুলান হবে। কন্দরের বাম পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নির্ঝরিণী। তিনদিক দিয়ে ঘেরা পাহাড়ের প্রাচীর। এ যেন কুদরতী দুর্গ। তবে বন্য হায়েনাদের আনাগোনা খুব বেশী বলে মনে হয়। কারণ, হায়েনাদের বেশকিছু পদচিহ্ন লক্ষ্য করেছি ঝর্ণার কূলে। মনে হয় এখানেই ওরা পানি পান করতে আসে।” আমি বললাম, “ভয়ের কারণ নেই। মানুষের পদচারণায় ওরা ভয়ে দূরে পালাবে। চল, সেখানে গিয়ে গুহা সংস্কার করি।” সবাই চলে গেলাম সেখানে। কেউ গুহা সংস্কারের কাজে লেগে গেল, কেউ উনুন তৈরির কাজে ব্যস্ত আর কেউ রান্নার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

আমি তিনজন সাথী নিয়ে পাহারাদারির মোর্চা নির্মাণের কাজে লেগে গেলাম। গোধূলী লগনে আমাদের কাজ সেরে মাগরিবের নামায আদায় করে তাছবিহাত পাঠ করতে লাগলাম। অতঃপর আওয়াবীন নামায পড়ে আগামীদিনের কার কি দায়িত্ব ও রাতের পাহারাদারির কাজ বণ্টন করে দিলাম। অতঃপর এশার নামায ও আহারাদী সেরে নিজ নিজ শয্যা রচনা করে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত গভীর হয়ে গেল কিন্তু ঘুম আসছিল না। অভাগিনী মেরীর চিন্তায় অস্থির। সে কোথায় আছে, কিভাবে আছে, এ নিয়ে ভাবছি। কিভাবে জালেমদের হাত থেকে তাকে মুক্ত করা যায় এসব চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন ফজরের নামায় আদায় করে ওয়ায়েভকে ক্যাম্পের জিম্মাদারী বুঝিয়ে দিয়ে, উছায়েদকে নিয়ে মেরীর খোঁজে বেরিয়ে এলাম। উঁচু-নিচু, টেক-টিলা, গিরি-কান্তার পেরিয়ে বিকাল দু'টার দিকে আমরা উজিরাবাদ শহরে প্রবেশ করি।

উজিরাবাদ একটি থানা শহর। শহরটি বেশী বড় নয়, মাঝারী ধরনের। পরিপাটির দিক দিয়ে শহরটির বেশ সুনাম আছে। এটা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। এখানকার জামে মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যের ঐতিহ্য বহন করে আসছে কয়েক শতাব্দী ধরে। ইসলামী জ্ঞান বিকাশের জন্য স্থাপিত হয়েছিল ইসলামী গণপাঠাগার, ইসলামী রিচার্স সেন্টার ও বিদ্যাপীঠ জামেয়া ইসলামিয়া। গ্রাম গঞ্জে স্থাপন করা হয়েছিল কুরআনী মক্তব। ৬/৭ বৎসরের বালক-বালিকাদের কণ্ঠে শোনা যেত সুমধুর কালামে পাকের তিলাওয়াত।

দূর-দূরান্ত থেকে এলেম পিপাসু তালেবে এলেম ছুটে আসত জ্ঞানাহরণের জন্য। বুখারা সমরকন্দের পরেই উজিরাবাদের নাম আসত। বর্তমানে বলসেবিকরা ইসলামী ঐতিহ্য সবই ধ্বংস করে দিয়েছে।

উজিরাবাদের অনেক ছাত্র জামেউল উলুমে লেখাপড়া করেছে। দস্তগীর নামক এক ছাত্র ছিল আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। উজিরাবাদ শহরের এককিলো পশ্চিমে মহাসড়ক সংলগ্নই ছিল তার বাসভবন। ওদের বাড়ি আসার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করত। এক সময় আসার তারিখও ধার্য করেছিলাম। কিন্তু কি এক অসুবিধার কারণে আসা সম্ভব হয়নি। তারপর আর কোন ফুরসত পাইনি। মনে মনে ভাবলাম, এই সুযোগে শহরটাও দেখে নেব আর দস্তগীরের বাড়িরও সন্ধান নেব। তাই শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। উছায়েদ হঠাৎ আমায় ধাক্কা দিয়ে ইশারায় কি যেন দেখাল। চলার পথেই সে দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখলাম না। সে আবার একই ব্যবহার করল। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে মুখে বলুন।" সে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ার অবস্থা। আমি একটু রেগে গিয়ে ধমক দিলে সে বলল, "দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কতগুলো পোস্টার।" অমনি চেয়ে দেখি উছায়েদের কাল্পনিক আঁকা ছবিতে দেয়াল ভরপুর। অর্থাৎ বলসেবিকদের ধোঁকা দেয়ার জন্য সে ভয়ংকর আকৃতির ছবি এঁকে বলসেবিকদের দিয়েছিল যে, এটাই মুজাহিদ খোবায়েব জাম্বুলীর ছবি। এ ছবি এঁকে ওদের থেকে পেয়েছিল ৯ হাজার ডলার। এ ছবিকে ওরা সত্য মনে করে হাজার হাজার কপি করে মোড়ে মোড়ে, দেয়ালে, রেস্তোরাঁয়, স্টলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগিয়ে দিয়েছে। এতে লেখা ছিল, "একে ধরিয়ে দিন, ৩০ লক্ষ ডলার বুঝে নিন।"

অল্প সময়ে শহরের কিছু অংশ ঘুরে মহাসড়ক ধরে দস্তগীরের খোঁজে চললাম। আনুমানিক এক কিলোমিটার পথ অগ্রসর হয়ে এলাকার লোকজনের

নিকট জিজ্ঞাসা করলা.. । নাম বলার সাথে সা বাড়ি দেখিয়ে দিল। আমরা দস্তগীরের বাড়িতে গিয়ে ডাক দেয়ার সাথে স. বেড়িয়ে এল। যদিও বহুদিন পর সাক্ষাত, কিন্তু চার চোখের মিলনে কেউ ... চিনতে বেগ পেতে হয়নি।

দস্তগীর আমাকে দেখে খুশীতে আত্মহারা হয়ে বুকে জড়িয়ে রল। নীরব ভাষায় দীর্ঘক্ষণ ভাব বিনিময় চলল। অতঃপর বুক ছেড়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে খোবায়েব! এখনো তুই বেঁচে আছিস? আমরা তো শুনেছি তোর আব্বাকেসহ তোদের শহীদ করে দিয়েছে কমিউনিস্ট হায়েনারা। আমরা তোদের শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে ফাতেহা পড়ে, কুরআনখানি করে তোদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছি। আবার পরস্পর এটাও শুনেছি তুই নাকি বহুত বড় মুজাহিদ হয়ে গেছিস। আবার পত্র-পত্রিকায় ও পোস্টারে খোবায়েবকে ধরে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণা করেছে সেটাও দেখেছি। কিন্তু আসল খবর কি তা জানতে পারিনি। এলোপাথাড়ি সংবাদে এক গোলক ধাঁধাঁয় পড়েছি। পত্র-পত্রিকার খোবায়েব আর তুই খোবায়েব এক না ভিন্ন তাও ধরতে পারিনি। পোস্টারের অদ্ভূত ছবি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি সেটা তুই খোবায়েব নস, অন্য একজন।"

আমি বললাম, এসেছি যখন তখন সব আলাপই হবে, মসজিদে চল, মাগরিবের নামায পড়ে নেই। তারপর সারা রাত...।

দস্তগীর বলল, "মসজিদে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। মসজিদ এখন ক্লাবে রূপান্তরিত করেছে। নামায ঘরেই পড়তে হবে। এই বলে সে আমাদের অযুর ব্যবস্থা করে দিল। আমরা অযু সেরে নামায পড়ে নিলাম। দস্তগীর চলে গেল বাড়ির ভিতর। একটু পরে নিয়ে এল রুটি, হালুয়া ও কাবাব। আমরা নাস্তা সেরে দস্তগীরকে তার বর্তমান অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে সে অত্যন্ত করুণ সুরে বলল, "খোবায়েব! যেদিন আমাদের সমরকন্দের মাদ্রাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করেন সেদিনই আমি দেশের দিকে পা বাড়াই। বাড়িতে কয়দিন ঘোরাফেরা করলে আব্বা আমাকে উজিরাবাদ জামিয়ায় ভর্তি করে দেন। সেখানে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর কোন রকম মেশকাত শরীফ শেষ করি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষা দিতে পারিনি, এর আগেই নেমে এল কমিউনিস্টদের জুলুম অত্যাচার। মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে আব্বাজী ইন্তেকাল করলেন। তখন বাধ্য হয়েই সংসারের হাল আমাকে ধরতে হল। মহল্লার মসজিদে নিলাম ইমামতি। কিছুদিন পর মসজিদকে বানাল ক্লাব। ফিরে এলাম বাড়িতে। তার কিছুদিন পর আমার একমাত্র আদরের ছোট বোন...।"

এতটুকু বলার পর দস্তগীরের কণ্ঠ চিরে কান্না বেরিয়ে এল। বেশ কিছুক্ষণ পর কান্না সংবরণ করে বলল, "বলসেবিকরা আমার সামনে থেকে বোনকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর উপর্যুপরি ধর্ষণ করে শহীদ করে লাশকে বাড়ির আঙ্গিনায় ফেলে রেখে যায়। আমি সে বোনকে চিরদিনের জন্য মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছি। বর্তমানে বৃদ্ধা আম্মাকে নিয়ে কোনমতে বেঁচে আছি।"

"এত কিছুর পর এখনো তুই বহাল তবিয়তে আছিস তা কি করে হয়?"

"তার কারণ আছে। কারণটা হল, আমি ইমামতি ছেড়ে একদম খামোশ হয়ে যাই। মাঝে মধ্যে তাদের মিছিল, মিটিং ও সমাবেশে যাই। তাদের শেখানো শ্লোগান দেই। তাই তারা আমার উপর কোন টর্চারিং করে না। ঘরে বসে নামায পড়ি তা কেউ জানে না। এ হিসাবে এলাকার কমিউনিস্টরা আমাকে খুব ভাল জানে। এ ধরনের মুনাফেক সেজে বেঁচে আছি।"

দস্তগীরের করুণ ইতিহাস শ্রবণ করে আমি আমার মাদ্রাসা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কি করেছি আর কি হয়েছে একে একে সব ঘটনা শোনালাম। দস্তগীর আমার ইতিহাস শুনে কাঁদতে কাঁদতে জারজার হয়ে গেল। অতঃপর বললাম, "ভাই দস্তগীর! তোমার এখানে আমি বেড়াতে আসিনি। এসেছি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ নিয়ে। এতে তোমার সহযোগিতা কামনা করি। কাজটি হল, আমার এক নওমুসলিম বোন খৃস্টানদের হাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাকে উদ্ধার করা আমার ঈমানী দায়িত্ব। তাকে উদ্ধার করা ছাড়া আমি মার্কাজে ফিরব না।

মেয়েটি ইংল্যান্ডের অধিবাসী। সে তাদের ধর্মের তাবলীগ করতে এদেশে এসে গির্জা স্থাপন করেছে। এখান থেকে ৮ মাইল পূর্বদিকে উস্তুবার নামক স্থানে তাদের বড় গির্জা। সেখান থেকে আরো দু-তিন মাইল পূর্ব দিকে খাবজা নামক স্থানে ছোট গির্জা। আগামীকাল সকালে ছদ্মবেশে গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে সেখানে যাবে এবং সেখানকার পরিস্থিতি দেখবে। মেয়েটির পূর্ণ নাম রাহেবা মিস্ মেরী গমেজ। সে কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে তা জানার চেষ্টা করবে। তুমি সেখানে কিভাবে যাবে আর কি বলবে আমি সব বলে দেব। সংবাদ সংগ্রহে যদি দু-একদিন সেখানে অবস্থান করতে হয় তা করবে। গির্জা সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকে। গির্জার পার্শ্বে অনেক কামরা আছে। ইচ্ছা করলে সেখানেও থাকতে পার। আমি যা বলে দেব তুমি সেভাবেই কাজ করবে। সাবধান! ব্যতিক্রম হলে কিন্তু রক্ষা নেই।"

অতঃপর কিভাবে যাবে, কি বলতে হবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলাম। তারপর নামায ও খানাপিনা সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ আঠার ॥

পরদিন পাদ্রীরা সব একত্র হয়ে মেরীকে ভূগর্ভস্থ জিন্দানখানা থেকে গির্জায় নিয়ে আসে। প্রহারের দাগগুলো কৃষ্ণরূপ ধারণ করে স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছিল।

যে মেয়েটি শিশুকাল থেকে মা হারিয়ে পিতার আদর-সোহাগ ও ভালবাসায় লালিত-পালিত হয়েছে। দুঃখ-কষ্ট কি জিনিস তার পরিচয় পায়নি। দুধ কলা আর পুষ্টিকর খানা ছাড়া অন্য কিছু মুখে তুলেনি। আরাম-আয়েশ আর আনন্দ-ফূর্তির মধ্যদিয়ে যে লালিত-পালিত হয়েছে। যার কোমল শরীরের রগ-রেশা দিয়ে রক্ত চলাচল দেখা যায়, এমন একজন অপূর্ব সুন্দরীর দেহরত্নে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে চাবুকের দাগগুলো ফুটে উঠেছে তা দেখে কোন্ পাষাণ হৃদয়অলাও অশ্রু না ঝরায়ে থাকতে পারবে না। ইসলাম গ্রহণ করাই কি তার অপরাধ? অলীক ধর্ম ছেড়ে সত্যের দিকে আসাই কি তার অন্যায়? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

মেরীকে যখন পাতাল পুরী থেকে গির্জায় পিতার সম্মুখে আনা হল, তখন বাপ-বেটির চার চোখের মিলন হয়ে যায়। মেরীর হাত দুটি ছিল পিছনে শৃঙ্খলাবদ্ধ। মেরী পিতার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে অঝোর নয়নে অশ্রু ঝরাচ্ছিল। আশা ছিল পিতাজী পিতৃসুলভ নজরে তাকাবে। হায়! ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! নিষ্ঠুর পিতা এক নজর দেখেই যে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল, একবারও তার দিকে তাকিয়ে দেখেনি। নিষ্ঠুর, নির্দয়, পাষাণ পাদ্রীরাও তার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে একটিবারও তার পক্ষে উকালতি করেনি। মেরী এসব দেখে বুঝতে পেরেছে আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়াতে তার আর কেউ নেই। সে সর্বান্তকরণে মনে মনে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করতে লাগল।

দু'জন পাদ্রী ফিস্ ফিস্ করে পরস্পর আলোচনা করছিল যে, ছোট গির্জায় কোন পূজারী নেই। নেই কোন মুজাহিদ। সেটা যেন ভূতুরে নগরীতে পরিণত হয়েছে। এ সংবাদ মেরীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তার জ্ঞান লোপ পেল। এক চিৎকারে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল।

মেরী গমেজের জ্ঞান লোপ পাওয়ার কারণ একটিই, তা হল, যে অতিথির শুভাগমনে উস্তুবারের পশু-পাখী, গাছ-গাছালী, পাখ-পাখালী, বন-বনানী, বালু-কণা, নির্ঝরিণী ও আকাশ-বাতাস আনন্দে নাচানাচি করছিল, যার আগমনে লতায় পাতায় পুলক শিহরণ লাগছিল, যার সুধাময় সুর লহরী ও অমীয় বাণী শ্রবণ করে সত্যের সন্ধান পাচ্ছিল, যার পবিত্র কদম তলে নিজেকে জীবনের তরে সঁপে দেয়ার স্বপ্ন দেখছিল। সে মহান অতিথির পলায়ন তার কাছে বেদনার মহা পারাবার হয়ে উছলে উঠছিল। এ জুদায়ী, এ ফেরাকাত, এ বিরহ যাতনা কোনদিন সে অনুভব করেনি। যে দিল বিরহ অনলে দগ্ধিভূত হয়নি, সে কি

কোনদিন তা বরদাস্ত করতে সক্ষম হবে? তা কক্ষনো নয়। যার কারণে তার কোমল হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল।

কোন কোন পাদ্রী দয়াপরবশ হয়ে তার শুষ্ক মুখে পানি তুলে দিচ্ছিল। কেউবা ফুটন্ত কুসুম সদৃশ মলিন চেহারায় পানি ছিটাচ্ছিল। কেউবা তার চম্পক কলি সদৃশ আঙুলগুলো টেনে টেনে সোজা করছিল। কেউবা করছিল বাতাস।

আহা! এমনই এক অন্তিম সময়ে আপন পিতার মুখ গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে অভিসম্পাত। ধর্মত্যাগী, কুলাংগার হারামজাদী! আমার চোখের সম্মুখে ছটফট করে তোর মৃত্যু হোক। পাদ্রী বংশের কলঙ্ক, যীশুখৃষ্টের অভিশপ্ত, কাফের বেঈমান। এতদিন পর্যন্ত তোকে লালিত-পালিত করেছি। ধর্মীয় শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা দান করেছি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, মনোরম পরিবেশে গির্জা নির্মাণ করে দিয়েছি। এত বৎসর নিষ্ঠার সাথে উপাসনা করার পর এক খোদাদ্রোহী কাফিরের কথা বিশ্বাস করে ইসলাম গ্রহণ করেছিস! আজ তুই ঈমানহারা হয়ে দুনিয়া থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছিস। খোদাওন্দ যীশুর অভিশাপেই তোর এ অবস্থা। মর! জলদি মর! ছটফট করতে করতে মর।" এসব গালি-গালাজের কিছুক্ষণ পর মেরীর জ্ঞান ফিরে আসে। চেয়ে দেখে চার পাশে পাদ্রীরা দণ্ডায়মান। কারো হাতে পাখা আর কারো হাতে পানির গ্লাস। সে বুঝতে পেরেছে তার কি হয়েছিল। দুনিয়াটা তার নিকট খুব সংকীর্ণ মনে হল। ঈমানের জ্যোতিতে তার অন্তর ভরপুর। সে সময় মেরীর কানে বার বার বারি খাচ্ছিল আমার সে কথাগুলো, হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ ঈমান আনার কারণে আরবের কাফের মুশরেকদের দ্বারা কতই না অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। তাদের নির্যাতন, নিপীড়ন আর অত্যাচার থেকে খোদার হাবিব পর্যন্ত রেহাই পাননি। এ দ্বীনের জন্য হযরত আমীর হামযা (রা.)-কে শহীদ হতে হল। বুক চিরে তার কলিজা বের করে হিন্দা চিবিয়ে খেয়েছিল। এ দ্বীনের জন্য হযরত সুমাইয়্যা (রা.)-কে আবু জাহেল লজ্জাস্থানে বর্শা ঢুকিয়ে শহীদ করেছিল। হযরত বেলালে হাবশী (রা.)-কে গলায় রশী লাগিয়ে মদীনার অলিতে গলিতে টানা-হেচড়া করেছিল। মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর শোয়ায়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে রেখেছিল। এ দ্বীনের জন্য ছাহাবায়ে কেরামগণকে নিজের ভিটামাটি ছেড়ে, স্ত্রী-সন্তান ফেলে মদীনায় ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে হয়েছিল। এ দ্বীনের জন্য পিয়ারে হাবিবের পবিত্র রক্ত ঝরাতে হয়েছিল। তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামগণকে হাসিমুখে শাহাদাতের পিয়ালা পান করতে হয়েছিল।

আমি গির্জার মধ্যে নওমুসলিমদের সামনে সাহাবায়ে কেরামদের যে কুরবানীর আলোচনা করেছিলাম, এগুলো এখন তার বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হতে লাগল এবং এগুলোই তার সান্ত্বনা পাওয়ার উসিলা হয়ে গেল।

মেরীর অন্তর থেকে জুলুম-নির্যাতনের ভয়, মৃত্যুর ভয় একেবারে হিজরত করে কোথায় জানি চলে গেল। শাহাদাতের তীব্র বাসনা তার দিলের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিল। তার অন্তরের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিদূরিত হয়ে ঈমানের আলো জ্বলজ্বল করতেছিল। সে যেন নিজ চোখে দেখছিল জান্নাতের মনোরম অট্টালিকা, দর-দালান। জান্নাতের অপূর্ব সুন্দর সুন্দরী হুর-গেলমানরা যেন হাতছানিতে ডাকছিল তাল তাল। অর্থাৎ এদিকে এস, এদিকে এস। আহ্! কি মজা! কি আনন্দ! কতই না উত্তম! বাহ্ঃ বাহ্ঃ! মেরীর আত্মা বুলবুলির রূপ ধারণ করে বেহেস্তের পুষ্পকাননের ডালে ডালে ফুলের সাথে খেলা করছিল। আজকের মত এত আনন্দ কোনদিন সে অনুভব করেনি। কত বড়দিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল, এপ্রিল ফুলে অংশ নিয়েছিল, কিন্তু এমন আনন্দ, পুলক শিহরণ অনুভব করেনি। শত ঈদের সংমিশ্রণে আজকের দিনটি তার নিকট আনন্দঘন পরিবেশে দেখা দিল। ভয়-ভীতি, হীনমন্যতার ছাপ দূরীভূত হয়ে তার চেহারা খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। চিকন ঠোঁটের মুচকী হাসির ফাঁক দিয়ে শুভ্র দন্তগুলোর কিছু অংশ প্রকাশ পাচ্ছিল, এ যেন তার চেহারার সৌন্দর্য অনেক গুণে বৃদ্ধি করেছে।

উপস্থিত পাদ্রীরা মেরীর চেহারার দিকে তাকিয়ে হয়রান-পেরেশান। এত চাবুক মারার পর, দানা পানি থেকে বঞ্চিত করার পরও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না, বরং ক্রমান্বয়েই চেহারায় নির্ভীকতার ছাপ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। এরই বা কারণ কি? হয়ত সে আর খৃস্টধর্মে ঈমান আনবে না। সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা সম্ভবত বৃথা যাবে। তাহলে কি সে জীবনের মায়া ছেড়েই দিয়েছে? পাদ্রীগণ এসব ভাবছে। মেরী হস্তযুগল পিতার দিকে প্রসারণপূর্বক বলল, "মাননীয় পিতাজী! আমার পরিণতি কি হবে তা আমার জানা নেই। তবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এতটুকু বলতে পারি যে, আপনার পক্ষ থেকে যে কোন চরম সিদ্ধান্ত আমি হাসিমুখে মাথা পেতে বরণ করে নেব। এতে আমাকে কার্পণ্য করতে দেখবেন না। কিন্তু ইসলাম থেকে অণু পরিমাণ সরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে আবারও মিনতি করছি, আপনি আপনার দলবল সহ সত্যের পথে, ইসলামের পথে ফিরে আসুন।"

এতটুকু বলতে না বলতে পাদ্রী যোহন অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁত কটমট করতে করতে চাবুকের পর চাবুক মারতে লাগল। কয়েকটা চাবুকের আঘাতে তার শরীর ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয়ে বসন সিক্ত হচ্ছিল। এরই মধ্যে পাদ্রী যোহন বলতেছিল, প্রভু যীশুর পবিত্র মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাকেই সে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে! কত বড় কাফির ও বেয়াদব!"

প্রহারে প্রহারে জ্ঞান হারাল মেরী। ফাদার পাদ্রীদের বলল, "একে নিয়ে পাতাল পুরীর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখে আস।" পাদ্রীরা ধরাধরি করে তাকে

সেখানে রেখে এল। অতঃপর ফাদার বলল, "তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজ রাত্রেই ক্রুশ বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হবে। এতে ব্যতিক্রম হবে না।"

অন্য এক পাদ্রী বলল, "মাননীয় ফাদার! আমরাও তার প্রতি নিরাশ হয়ে গেছি। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাকে ছেড়ে দিলে খৃস্টানদের চরম ক্ষতি করবে। তার প্রায়শ্চিত্তের আগে তার দ্বারা আমরা কিছু ফায়দা উঠাতে পারি। যদি অনুমতি হয় তবে বলতে পারি।"

ফাদার অনুমতি দিলে পাদ্রী বলল, "আমরা তাকে ৪/৫ দিন চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে এলাকার কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দেব। কমিউনিস্টরা দেহ মিলনে তৃপ্তি পাবে এবং আমাদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল। তারপর আমরা তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করব। খোদাওন্দ যীশু সব পাপ ক্ষমা করবেন।"

ফাদার বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ! তাই করা হবে। যাও আজকেই ডাক্তার এনে তার চিকিৎসা করাও। দু'তিন দিনের মধ্যেই যেন সুস্থ হয়ে যায়। তোমার সুন্দর পরামর্শের জন্য তোমাকে আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং এও ঘোষণা করছি, আমার পরে তুমিই হবে আমার স্থলাভিষিক্ত। এখন থেকে তোমাকে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা দেয়া হল। প্রতি রবিবারে ভোরেই তুমি গির্জায় এসে যাবে। বুঝলে তো?"

এবার সব পাদ্রীরা একত্র হয়ে প্রার্থনা করে গির্জা ত্যাগ করল।

॥ উনিশ ॥

আমরা ঘুম থেকে জেগে অযু এস্তেঞ্জা সেরে নামায আদায় করে বসে তিলাওয়াত করতেছি। এমন সময় দস্তগীরের নজর পড়ল অস্ত্রশস্ত্রের দিকে। হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, "খোবায়েব! এগুলো কি বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখছিস?"

"এগুলো ঈমান বাঁচানোর উপাদান, নাম স্টেনগান।"

"ওম্ মা! এগুলো এখানে কি করে এল? আগে দেখিনি তো। কে দিল খোবায়েব?"

"এগুলো আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়নি, আমরা সাথে করে নিয়ে এসেছি।"

"কোথায় ছিল? দেখিনি যে।"

"দেখনা শীত নিবারণের জন্য পা ছোঁয়া লম্বা ও মোটা কোট গায় দিয়েছি। আবার তার উপর বিশাল কম্বল। এর ভিতরই লুকিয়ে এনেছি। এখন যতটুকু দেখছ, এর চেয়ে ছোট করা যায়।" এই বলে স্টেনগানটি হাতে নিয়ে হিল বাট ও টু বাট ভেঙ্গে ছোট করে দেখালাম।

"অ.....আল্লাহ্! এটার গুলি মনে হয় চারদিকে ছড়িয়ে যায়। শত শত ছিদ্র তার চার পাশে তাই না খোবায়েব?"

"আরে না, যে ছিদ্রগুলো দেখছ, এগুলো দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে বেরেল ঠাণ্ডা রাখে। ব্রাশ ফায়ারে বেরেল আগুনের মত গরম হয়ে যায়। তখন ধরে রাখা যায় না। এজন্যই...।"

"অ....এখন বুঝতে পারলাম, এটা দিয়ে গুলি ছোড়া যায় না, শুধু বাতাস আর ব্রাশ বের হয়।"

দস্তগীরের কথা শুনে উছায়েদ তার হাসি চেপে রাখতে ব্যর্থ হল এবং খিল খিল করে হেসে উঠল। দস্তগীর লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বসে রইল। অতঃপর আমি বললাম, "আরে গাধা! প্রতি মিনিটে ২৮ রাউন্ড গুলি তার মাথা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটাকে ব্রাশ ফায়ার বলে। বুঝলে এবার?"

"হ্যাঁ, এবার বুঝেছি। তাহলে এক রাউন্ডে গুলি কয়টি থাকে অর্থাৎ কয় গুলিতে এক রাউন্ড?"

"একটাকেই এক রাউন্ড বলে।"

"অ? ...এবার বুঝলাম।"

"হ্যাঁ, বুঝেছিস ঘোড়ার ডিম। চালিয়ে দেখা তো দেখি?"

"আমি চালানো শিখেছি নাকি যে, চালিয়ে দেখাব?"

"এটা শিখবি কেন? শিখছিস শুধু খাওয়া আর...। এটা শিক্ষা করা যে ফরয তা জানিস না? দেখ কিভাবে কি করতে হয়। এভাবে বারবার দেখিয়ে তাকে খোলা, লাগানো অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যা কিছু তা শিখিয়ে দিলাম। এবার তার আনন্দ দেখে কে? সে গুলি ছোড়ার জন্য অস্থির হয়ে গেল। বললাম, "আরে বেউকুব! গুলি ছোড়ার শব্দ পেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। আবার দুশমনরাও আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে।" এবার সে ভালভাবেই বুঝে নিল। এসব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে নাস্তার সময় পেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। দস্তগীর অন্দর বাটি থেকে নাস্তা এনে আমাদের সাথে বসেই খেল।

অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাকে কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা মনে আছে কি?"

"অবশ্যই। উস্তুবার যেতে হবে।"

"সে কখন?"

"তুই বলছিস ভোরেই যেতে। আর আমি চিন্তা করছি যোহর পড়ে যাব। এত আগে গিয়ে লাভ নেই। বিকালের দিকে গিয়ে সেখানেই রাত যাপন করব। তাহলে অনেক কিছু জানতে পারব, দেখতে পারব।"

"রাস্তা যে ৮/১০ মাইল, সময় লাগবে না?"

"ঘোড়া আছে না? ঘোড়ায় চড়ে যাব।"

"বাহ! তোর নিজের ঘোড়া তো?"

"অবশ্যই। আমার তিনটি ঘোড়া। আমার একটি, আব্বুর একটি, মালটানার জন্য একটি। এখন আব্বুও নেই, মালটানাও হয় না। তাই তিনটিই ব্যবহার করি। আমার তিনটি ঘোড়াই বাজারের সেরা, একদম চোখ তোলা। এগুলোর সাথে দৌড়ে কোন ঘোড়াই পারে না। কয়েকবারই প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় প্রাইজ এনেছি। তাকের দিকে তাকিয়ে দেখ না প্রাইজগুলো সাজিয়ে রেখেছি।"

"এবার তুই আমাকে খুশী করলি। আসলে তোর প্রতি আমি খুব অসন্তুষ্ট ছিলাম। কারণ জিহাদের কোন কিছুই শিখলি না এ জন্য। এখন দেখি শাহসওয়ারী শিখেছিস। এটাও কম কথা নয়। দোয়া করি আল্লাহ্ পাক তোকেও একজন মুজাহিদ হিসাবে কবুল করুক।"

"আমীন।"

"শোন, রাতের কথাগুলো মনে আছে তো? সেখানে কিভাবে যাবে, কি করবে এবং কি বলবে?"

"মনে আছে তবে আর একবার বললে ভাল হয়।"

"শোন! খৃস্টানদের একটি প্রতীক আছে, দেখবে কতগুলো চেইন আছে তার তলদেশে ক্রুশ ঝুলানো।"

"হ্যাঁ, দেখেছি ৩/৪ ডলারে বিক্রি হয়।"

"হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। এমন একটি চেইন কিনে গলায় ঝুলাবে, যেন অনায়াসে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

"তাহলে বড় দেখে এবং দামিটা কিনতে হবে।"

"চুপ! এত আগে আগে বুঝিস না। তোর পছন্দ মত একটি চেইন গলায় ঝুলিয়ে নিবি। এ প্রতীক দেখলে হয়ত প্রধান দ্বাররক্ষী তোকে ছেড়ে দেবে। যদি না ছাড়ে বা পরিচয় চায় তাহলে বলবি আমার নাম লিপটন, বাড়ি উজিরাবাদ, জাতিতে খৃস্টান। আমি স্থানীয় কমিউনিস্ট বিপ্লবী কমান্ডের পদস্থ কর্মকর্তা। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রধান পাদ্রী ফাদার যোহনের সাথে জরুরী পরামর্শের জন্য এসেছি। একথা শুনে অবশ্যই তোকে প্রবেশ করতে দেবে। গেটের ভিতরেও ঘোড়া রাখার মত বিশাল চত্বর রয়েছে। সেখানে ঘোড়া রেখে গির্জা সংলগ্ন গেট পেরিয়ে ভিতরে চলে যাবি। ভিতরের গেটে কোন দারোয়ান থাকে না। থাকলে পূর্বের কথাই বলবি। তারপর দেখবি গির্জাকে কেন্দ্র করে তিন দিকে রয়েছে অনেক কক্ষ। এগুলোর মধ্যে পাদ্রী, রাহেব, রাহেবা ও নানরা থাকে। ঘুরে ঘুরে

সবগুলো কামরা দেখবি। সেখানে কিন্তু অনেক হুর গেলমান পাবি, দেখিস তাদের প্রতি কিন্তু...!"

"সত্যি হুর-গেলমান?"

"আরে পাগল, না। এগুলো খৃস্টান উপাসক। অনেক যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকা রয়েছে। বেশী সুন্দর হলেই তাকে গির্জাবাসে দিয়ে দেয়। সেসব অন্য কথা, পরে বলব নে। ওসব সুন্দরীদের মধ্যে মেরীকে তালাস করবে। তাকে চেনার আলামত হল, সে পরমা সুন্দরী। গির্জায় যারা আছে সবাই কিন্তু সুন্দরী। মেরীর সৌন্দর্য সবাইকে হার মানিয়েছে। বয়স ১৮ থেকে ২০ এর কোঠায়। প্রশস্ত ললাট, গোলাপী বর্ণের চেহারা, যুগল ভ্রু, অসির অগ্রভাগের মত তার নাসিকা, হরিণীর মত টানাটানা চোখ, যেন সুরমা মাখা কুসুম কোমল গণ্ডদ্বয়। অত লম্বাও নয় আবার বেঁটেও নয়। কৃশাঙ্গও নয় আবার স্থূলাঙ্গও নয়, মাঝারী গড়ন। হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে। চোখ দুটি তার পিঙ্গল বর্ণের। বেশীর ভাগ সময় শুভ্র রং এর ব্লু পাইরের শাড়ী পরে। এমনই এক বিশেষ পোশাকে থাকে মাথা আবৃত। এ ধরনের মেয়েকে পেলে নামটা জেনে নেবে। তাকে যে গির্জায়ই পাওয়া যাক না কেন সেখানে ক'দিন অবস্থান করবে তাও জানার চেষ্টা করবে। যদি এমন মেয়ের সন্ধান না পাও, তবে নানদের কাছে খুব সুকৌশলে জানবে মেরী কোথায় আছে। আর একটা জিনিসের খোঁজ অবশ্যই নিতে হবে, তাহল প্রায় সব গির্জায় বা তার আশপাশে ভূগর্ভস্থ কামরা আছে। তার দরজা কোন্ কোন্ দিকে, কাঠের না লোহার ইত্যাদি।

আর একটি কথা মনে রাখবে, তা হল তুমি যখন ফাদারের সাথে কথা বলবে তখন খৃস্টধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার ভান দেখিয়ে কথা বলবে। আর কমিউনিস্টদের ভূয়ষী প্রশংসা করবে। তখন কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে যে, কমিউনিস্টরা তো অনেক খৃস্টান জবাই করেছে, অনেক গির্জা ভেঙ্গে ফেলেছে আবার কোন কোনটা দখল করে নিয়ে গেছে। ওরা তো নাস্তিক, খোদাওন্দকে মানে না, ধর্মকে বিশ্বাস করে না। তাহলে ওদের প্রশংসা কর কি করে? এ প্রশ্নের জবাবে তুই বলবি—"মহামান্য ফাদার! আপনার সবগুলো কথাই ঠিক, তবে আপনার এ সত্যটুকু জেনে রাখা দরকার, তাহল কমিউনিজমের প্রবর্তক মি. লেলিন এবং তাঁর সহযোগী স্টালিন, কার্লমাক্স প্রমুখ মহা মনীষীগণ তো জন্মসূত্রেই ছিলেন খৃস্টান। তার আগে জারনিকুলাই ছিলেন খৃস্টান। ইনারা মূলত মুসলমানদের শত্রু। মুসলমানদেরকে মোটেও বরদাস্ত করতে পারে না। তার প্রধান কারণ হল, মুসলমানরা জিহাদ করে। তারা যদি কমিউনিজমের বিরোধিতা না করত আর জিহাদে ঝাঁপিয়ে না পড়ত তাহলে ওরাও ধর্মানুষ্ঠান করতে পারত। আমরা খৃস্টান যারা আছি এদের মধ্যে যারা তাদের বিরোধিতা করেছে,

বলসেবিকরা শুধু তাদেরকেই দমন করেছে। তা না হয় দেখেন আমাদের এলাকার সব খৃস্টানরাই বহাল তবিয়তে আছে। এমনকি অনেক মুসলমানরাও। এখনো পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। আমরা তো প্রায়ই তাদের মিছিল মিটিং এ যাই। আমাদের সাথে অনেক মুসলমানও যোগ দেয়। আমরা যে শ্লোগান দেই যেমন—

"কেউ খাবে আর কেউ খাবে না,
তা হবে না তা হবে না।
দুনিয়ার মজদুর! এক হও, এক হও।"

এ শ্লোগান দ্বারা কি ঈমান নষ্ট হয়? এতে কি খোদাওন্দ যীশুর অবমাননা করা হয়? তা কিছুতেই নয়। তাহলে কমিউনিজম মানতে আমাদের বাধা কোথায়?"

তুমি যখন তার প্রশ্নের জবাব এভাবে দিবে তখন তোমার প্রতি কিছু না কিছু সহানুভূতিশীল হবে। তারপর তুমি তাদের অবস্থা, গির্জার হালত, কোন সমস্যা আছে কি-না তা খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলে অবশ্য অবশ্যই মেরীর আলোচনা এসে যাবে। তারপর জানতে পারবে মেরী কোথায় কি অবস্থায় আছে?

আর যদি মেরীর সাথে তোমার সরাসরি দেখা হয়ে যায় তবে সুযোগ বুঝে বলবে, তোমার কয়েকদিনের অতিথি বলেছে, ছবর করতে, ধৈর্য ধরতে আর বেশী বেশী খোদাকে ইয়াদ করতে। আল্লাহ্ তার সুন্দর ফায়সালা করে দেবেন। এতটুকু বললেই সে বুঝে নেবে কথাগুলো কার।

দস্তগীরকে এ সবকিছু বলে কয়ে এবং তার হেফাজতের জন্য চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে দীর্ঘ মোনাজাত করে পাঠিয়ে দিলাম। দস্তগীর আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘোটক হাঁকাল উস্তুবারের দিকে।

॥ কুড়ি ॥

দস্তগীর তার তাজি হাঁকিয়ে তড়িৎ গতিতে গোধূলী লগনে পৌঁছে গেল উস্তুবার। রাস্তাঘাট চেনা না থাকার কারণে এখনো গির্জার সন্ধান পায়নি। সে যে রাস্তার কাল্পনিক খসড়া এঁকেছিল তার মনের পাতায়, তার সবটুকুই হল উল্টো। সে ভাবছিল হয়ত সমতল ভূমি হবে, থাকবে পরিপাটি রাস্তা ঘাট, হবে জনবহুল এলাকা। তার কোনটাই হয়নি। ভুল করে শীতের পুঁজি কম্বলটাও ফেলে রেখে গেছে। পাহাড়ী এলাকা দুর্গম পথ। চলতে খুবই কষ্ট। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পথ অতিক্রম করা অত সহজ নয়। ঘোটক না থাকলে হয়ত মধ্য পথেই তার চলার

গতি থেমে যেত। এর আগে কোনদিন পাহাড়ী এলাকা সফর করেনি এবং দেখেওনি। সে গির্জা এলাকা ডানে রেখে চলে গেছে অনেকটা উত্তর দিকে।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। আঁধার ঘিরে আসছে চারদিক থেকে। সামনে পথ চলা সম্ভব নয়। ঘোটক থেকে অবতরণ করে মাগরিবের নামায পড়তে দণ্ডায়মান হল। এমন সময় হাতির গলায় ঝুলানো ঘন্টার মত ঘন্টা ধ্বনি ভেসে এল দক্ষিণ দিক থেকে। ভয়ে গা ছমছম করছে। কোন রকমে নামায আদায় করে ঘোটকের গলা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে না করবে তা নিয়ে ভাবছে। এখনো ঘন্টা বাজছে।

সে মনে করতেছিল এটা পাহাড়ী হাতির ঘন্টার শব্দ। আহ্! আর বুঝি রক্ষা নেই। এই তো এল। শুঁড়ে পেঁচিয়ে ধরে পায়ের তলায় পিষে মারবে। না হয় কলাগাছের মত চিবিয়ে ভক্ষণ করবে। আহা! কেন এলাম ওর কথায়? মেরী মরবে না বাঁচবে সে চিন্তা আল্লাহ্‌র। মেরীর জীবন বাঁচানোর কন্ট্রাকটারী তো আমরা নেইনি। কেন এলাম এ জনহীন প্রান্তরে। আমাকে আবার কোন শয়তানে পেয়েছে। আহা! এ অন্তিম সময়ে বৃদ্ধা মাকেও দেখতে পেলাম না! রাজ্যের চিন্তা তার মাথার মধ্যে। চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রু ধারা।

ঘোটক বিশ্রাম নিচ্ছে। তার চেহারায় কোন পেরেশানী নেই। নেই আতঙ্কের চিহ্ন। দস্তগীর ভাবল, ঘোটক তো দেখি নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে আছে। উৎকণ্ঠার কোন আলামত নেই। এটা যদি কোন বিপদ সংকেত হত তাহলে সে ছটফট করত, টগবগ করে এদিক সেদিক তাকাতো। তাতো সে করেনি। দস্তগীর আরো ভাবল যে, আমি যে মনে করছি এটা বন্য হাতির ঘন্টা ধ্বনি, এটা তো আমার একদম ভুল ধারণা। কারণ বন্য হাতির গলায় ঘন্টা লাগাতে আসবে কোন শয়তানে। এত বড় বুকের পাটা কার আছে! এটা হাতি নয়, অন্য কিছুর শব্দ।

এরই মধ্যে মনে পড়ল আমার কথা যে, সে তো বলেছিল প্রার্থনাকারীদের আগমনের জন্য খৃস্টানরা গির্জাচূড়ায় ইয়া বড় ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখে। ঢং ঢং শব্দ করার সাথে সাথে চারদিক থেকে অর্চনাকারীরা এসে গির্জায় সমবেত হয়। তাহলে এটা নিশ্চয় গির্জার ঘন্টা ধ্বনি। এখন সে যেন নবজীবন ফিরে পেয়েছে। হাঁটুর কাঁপন স্থির হয়ে এসেছে।

এবার সে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে ঘোটক হাঁকাচ্ছে। কিছুক্ষণ চলার পর বৃক্ষরাজির পত্রপল্লব ভেদ করে এক আলোক রশ্মি তার চোখে এসে পড়ছে। এটা ছিল গির্জা শিখরে লটকানো ঝাড়বাতি। এতক্ষণে সে আবিষ্কার করতে সক্ষম হল যে, গির্জাপাড়ায় এসে গেছি। এতটুকু পথ চলার পরও মৃত্যুর কোন জ্ঞান ছিল না। শুধু বাঁচার তাগিদেই তাকে সব ভুলা করে দিয়েছিল। এখন সে তীব্র শীতের প্রকোপ অনুভব করতে লাগল। হাত পা হীম

প্রবাহে প্রায় অবশ। কোন মতে মরিয়া হয়ে সে প্রধান ফটকের কাছে এসে ঘোড়া থেকে অবতরণ করল।

প্রহরী তাকে কোনকিছু প্রশ্ন না করেই ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। সে ঘোড়াটিকে একটি পাদপমূলে বেঁধে সোজা গির্জায় প্রবেশ করল। গির্জায় কৃত্রিম উপায়ে পাদ্রীদের আরামের জন্য এবং শীতের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তাপের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া জানালা কপাট বন্ধ করে দিলে বাইরের বাতাস না ঢুকলেও কিছু গরম অনুভব হয়। গির্জার অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ অবস্থান নেয়ার পর অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। প্রার্থনাকারীরা তখনো প্রার্থনায় লিপ্ত ছিল।

কিছুক্ষণ পর ফাদারের করতালীতে পূজারীদের ধ্যানভঙ্গ হল। সংখ্যায় ৮/১০ জনের বেশী হবে না। দস্তগীর গির্জার এক কোণে বসা ছিল। একজন পাদ্রী নবাগত লোকটিকে দেখে এগিয়ে এল। দস্তগীর বুঝতে পেরে গলায় ঝুলানো ক্রুশটি ভালভাবে প্রকাশ করে বসল।

পাদ্রী তাকে একনজর দেখেই খৃস্টান হিসাবে চিহ্নিত করল। তারপর তার পরিচয় ও আগমনের কারণ জানতে চাইল। দস্তগীর সুন্দরভাবে আমার শেখানো কথাগুলো তোতাপাখীর মত বলতে লাগল। পাদ্রী তার কথা শুনে খুবই মুগ্ধ হল এবং বলল, "ভাই! তুমি তো অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছ। এখনো ক্লান্তির ভাব দূর হয়নি। এখন একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপর খানাপিনা সেরে ফাদারের নিকট নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেব। এখন আমার সাথে বিশ্রামাগারে চল। এই বলে তাকে মেহমানখানায় নিয়ে গেল এবং বিছানা বিছিয়ে বিশ্রাম করতে দিল। দস্তগীর শুয়ে শুয়ে আমার কথাগুলো মুতালা করতে লাগল। নতুন কোন প্রশ্ন আসলে যেন সুন্দর জবাব দিতে পারে সে জন্য দোয়া করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর একজন সুন্দরী এসে বলল, "ভাইজান! খানা আপনার জন্য এন্তেজার করছে, আমার সাথে আসুন।" দস্তগীর তাকিয়ে ভাবছে এই তো আমার অভিপ্রেত ব্যক্তিটিকে পেয়ে গেলাম যার জন্য আমি এত কষ্ট করে এতদূর পথ অতিক্রম করেছি। এবার দস্তগীর আমার বাতলানো আলামতগুলো তার চেহারায় খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না। বারবার মেয়েটির দিকে তাকানোর কারণে মেয়েটি ভাবছে, "মেহমান আমাকে পছন্দ করেছে।" চাকরানী আবার মিনতির সুরে বলল, "ভাইজান! চলুন, খানা খেয়ে বিশ্রাম নিন। আপনার জন্য অনেকেই অপেক্ষমাণ।"

দস্তগীর শয্যা থেকে উঠে বসল এবং পা দু'টি খাটের নিচে ঝুলিয়ে দিল। অমনি মেয়েটি পাদুকা দু'টি তার পায়ে পরিয়ে দিল। দস্তগীর আশ্চর্য হয়ে বলল, "আপা! এ রকম করা ঠিক হয়নি। মেয়েটি মুচকি হাসি হেসে বলল, কেন? আমরা তো আপনাদের সেবা করার জন্য নিয়োজিত। আপনাদের খেদমত করার

সৌভাগ্য ক'জনের হয়? আপনারা হলেন খোদাওন্দ যীশুর প্রেরিত বান্দা। আপনাদের খেদমত করলে, মনতুষ্টি করলে খোদাওন্দ যীশুর অনুগ্রহ পাব। ফাদার তো একথাই আমাদেরকে বার বার বুঝান। চলুন! খানা খেয়ে নিন। তারপর...।"

দস্তগীর মেয়েটিকে অনুসরণ করল। ওদের হাতের রান্না খাওয়া দস্তগীরের মন চাচ্ছিল না। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় না খেয়ে উপায়ও ছিল না। কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে দেখে খানা সামনে নিয়ে কয়েকজন বসা। হাত ধুয়ে খানা খেতে বসল। তিনজন চাকরানী খানা পরিবেশন করে খাওয়াল। অতঃপর সে পাদ্রী (যার সাথে গির্জায় কথা হয়েছিল) বলল, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন রাত দশটার পরে আপনাকে আনা হবে। এখন আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে জরুরী এক পরামর্শে বসব।"

দস্তগীর চলে গেল মেহমান খানায়। একটু পরে উক্ত চাকরানী চা নিয়ে রুমে প্রবেশ করল এবং তার খাট ঘেঁষে বসে চা ঢেলে দিতে লাগল। প্রথম দর্শনে সে এত কাছে চলে আসবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। দস্তগীর লজ্জায় নতশীর।

দস্তগীর একটু সরে গিয়ে বসলে মেয়েটি ঈষৎ হেসে বলল, "আমাকে ভয় পাচ্ছেন, নাকি ঘৃণা করছেন মুসাফির ভাই?"

"মানুষ খোদাওন্দের শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে ভয় পাওয়া বা ঘৃণা করা অন্যায় মনে করি।"

"তাহলে সরে বসলেন যে?"

"একটু আরামে বসছি তাই।"

"নিন চা টুকু পান করুন।"

দস্তগীর চা পান করতে করতে মেয়েটিকে বলল, তোমাকে সিস্টার মেরীর মত মনে হচ্ছে।"

"কোন মেরী? রাহেবা?"

" হ্যাঁ, রাহেবা মিস্ মেরী গমেজ। ফাদার যোহনের কন্যা।"

"ওর সাথে পরিচয় আছে কি?'

"আমি ওকে ভাল করেই চি সে নাও চিনতে পারে।"

"বর্তমান মেরীর অবস্থা জানেন কি?"

"না তো! কেন, কি হয়েছে?"

"আহা! বেচারী এক আজনবী মুজা দের খপ্পড়ে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অনেক বুঝানোর পরও সে ঈমানের দিকে ফিরে আসছে না। মাননীয় ফাদার ও অন্যান্য পাদ্রীগণ খুব ঠেঙ্গিয়েছে। বেচারীর শরীর ফেটে রক্তে জামা কাপড় লালে লাল হয়ে গেছে। কয়েক বার বেহুঁশ হয়েছে। আজ দু'তিন দিন যাবৎ

দানা-পানি কিচ্ছু দেয়া হচ্ছে না। ওকে ক্রুশ বিদ্ধ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেয়া হবে।"

"আহা! বেচারী তো অনেক ধার্মিক ছিল। তার ঘাড়ে বুঝি শয়তান সওয়ার হয়েছে। তাকে দেখা যাবে কি?"

"পাদ্রী বা রাহেব ছাড়া কারো যাওয়ার অনুমতি নেই। বেচারীকে পাতাল পুরীর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছে।"

"কোথায় সে রুম? মেয়েটি হাতের ইশারায় বলল, ঐ যে ঘরটি দেখেন এর ভিতরেই সুড়ঙ্গ বেয়ে যেতে হয়। নিকটে গেলেই মুসলমানদের মন্ত্র পড়ার শব্দ শোনা যায়। একটু এগিয়ে গিয়ে শুনুন। "

দস্তগীর এগিয়ে গিয়ে কলেমা পড়ার শব্দ শুনতে পেল। কিছুক্ষণ পর পাদ্রী এসে তাকে ফাদারের নিকট নিয়ে গেল এবং পরিচয় করিয়ে দিল। ফাদার প্রথমে ঐ প্রশ্নই করল যার উত্তর আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম। দস্তগীর ফাদারের সামনে নতজানু অবস্থায় বসে আমার শেখানো উত্তর শুনিয়ে দিল। ফাদার খুব খুশী হল। তারপর মেরীর কথা দীর্ঘ আলোচনা করে বলল, একে আমরা সুস্থ করে আপনাদের হাতে তুলে দেব। তারপর ওকে এনে প্রভু যীশুর মূর্তির সম্মুখে ক্রুশ বিদ্ধ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেব।

দস্তগীর ফাদারকে বাহবা দিয়ে বলল, "ঠিক আছে তাকে নিয়ে আমরাও বুঝাতে চেষ্টা করব, কাজে না আসলে আপনার হাতে ফিরিয়ে দেব। সে অনুষ্ঠানে আমরাও থাকব। সে আরো বলল, আপনারা নিরাপদে থাকুন, ধর্ম-কর্ম করুন। বলসেবিকদের জিম্মা আমি নিলাম। ওরা আপনাদের কোন ক্ষতি করবে না। তবে এদের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না।"

"না বাবা! আমরা কিছুই বলব না। বরং সহায়তা করব। আর একটা কথা, যে মুসলমান ছেলেটি আমার এই সর্বনাশ করেছে, তোমরা তার বিচার করবে।"

"তা অবশ্যই। এটা আপনাকে বলতে হবে না।"

"বাবা! মনে হয় তোমাকে যীশু নিজে প্রেরণ করেছেন। তা না হয় এ সময়ে এখানে আসলে কেন? যাও রাত বেশ হয়েছে, আরাম কর গিয়ে। ভোরে প্রার্থনা করে নাস্তা খেয়ে চলে যেও।"

দস্তগীর সেখানে রাত কাটিয়ে গির্জায় প্রার্থনা করে, নাস্তা খেয়ে ফিরে এল।

॥ একুশ ॥

দস্তগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এক অসহনীয় বেদনায় হৃদয় ভরে গেল। দস্তগীর একদম সরল সোজা ছেলে। প্যাঁচ-ঘোচের ধার ধারে না সে। শুনেছি পাহাড়ী এলাকায় কোনদিন যায়নি। দূরের পথ। কোনদিক থেকে কোন

দিকে যায় তা কে জানে। দেশের অবস্থা খুবই নাজুক। প্রতিদিন পথে ঘাটে কত খুন হচ্ছে, তার হিসাব কে রাখে? প্রাণের ভয়ে কেউ রাস্তা ঘাটে বের হওয়ার সাহস পায় না। কোথায় কোন বিপদে গ্রেপ্তার হয়ে যায় তা কে জানে। এসব চিন্তায় আমি অস্থির, পেরেশান।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে উছায়েদ সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মন কিছুতেই মানতেছিল না। অতঃপর সে বলল, "খোবায়েব ভাই! আপনাকে থাকতে হবে কঠিন প্রস্তরের ন্যায়, ভেঙ্গে পড়লে হবে না। কাণ্ডারী যদি তুফান দেখে ভয় পেয়ে যায় তবে যাত্রীসহ তরণী মাঝ দরিয়ায় নিমজ্জিত হবে। চলুন দোয়া করি, আল্লাহ্ সাহায্য করবেন। উছায়েদের উপদেশে কিছুটা শান্তি পাচ্ছিলাম। দু'রাকাত নফল নামায পড়েও দোয়া করলাম।

বিশ্রাম নিতে তাকিয়ায় অর্থাৎ বালিশে মস্তক স্থাপন করতেই দেখি তাকের মধ্যে বেশ ক'টি বই সাজানো রয়েছে। উছায়েদকে বললে সে দু'টি বই নামিয়ে আমাকে একটি দিল এবং সে একটা রাখল। চেয়ে দেখি বই এর উপর শয়তানের ছবি। অর্থাৎ লেলিনের ছবি। আর কাস্তে হাতুড়ী খচিত পতাকা। উক্ত ছবিতে একদমে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে ভিতরে নজর বুলাতে লাগলাম। বইটি ছিল কমিউনিস্টদের নবী লেলিনের হাদীসগ্রন্থ। এতে কমিউনিজমের ফাযায়েল লিখা ছিল। অর্থাৎ কমিউনিস্টদের ছহী হাদীস। রাবী স্বয়ং লেলিন।

টেবিলের উপরও রয়েছে হ্যান্ডবিল। বিজ্ঞাপন, পোস্টার ও স্টিকার। বুঝলাম দস্তগীর যে তাদের মিছিল-মিটিং এ যোগদান করে, তাই তাকে এগুলো দিয়ে থাকে। এদিকে আসরের সময় হয়ে গেল। আমরা নামায পড়ে বই নিয়ে রাস্তায় বের হলাম। একটু একটু পায়চারী করছি আবার বইও পড়ছি। এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে মহাসড়ক বেয়ে নেমে আসছে জনতার ঢল। বিশাল মিছিল। লম্বা মিছিল। এরা কেউ বহন করছে কাস্তে হাতুড়ী মার্কা পতাকা, কেউ বহন করছে লেলিনের ছবি। কেউ বহন করছে ব্যানার আর কেউ বহন করছে আমার সে কাল্পনিক ছবি।

মিছিলটি নিকটে আসলে আমরাও ঢুকে পড়লাম। মিছিলের সাথে আমরাও শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলছি। শ্লোগানগুলো নিম্নরূপ ঃ

* দুনিয়ার মজদুর এক হও ॥
* কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না ॥
* কমিউনিস্টে দিচ্ছে ডাক, পুঁজিবাদী নিপাত যাক ॥
* কমিউনিস্টের শ্লোগান, ধনী গরীব এক সমান ॥
* আমরা সবাই লেলিন সেনা, ভয় করিনা বুলেট বোমা ॥
* খোবায়েবের চিহ্ন কি, টুপী, দাড়ী, পাগড়ী ॥

* খোবায়েবকে ধরিয়ে দিন, ৩০ লক্ষ ডলার নিন ॥
* খোবায়েব দুর্দান্ত, কমিউনিস্টদের আতঙ্ক ॥
* খোবায়েবের কল্লা চাই, হাড় দিয়ে সুরমা চাই ॥
* মৌলবাদ ধ্বংস হোক, কমিউনিজম কায়েম হোক ॥
* কায়েমী স্বার্থবাদী, মৌলবাদী মৌলবাদী ॥
* লেলিনের মতবাদ, বিশ্বজুড়ে হোক আবাদ ॥
* দুনিয়ার মজদুর, এক হও এক হও ॥

ইত্যাদি শ্লোগানে উজিরাবাদের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে লাগল। আকাশ বাতাস সে শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছিল। আমরাও মনের আনন্দে তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তালে তালে সে শ্লোগান দিচ্ছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, তোমরা খোবায়েবকে খুঁজে বেড়াও আর খোবায়েব তোমাদের সাথে মিশে শ্লোগান দিচ্ছে। আমার শ্লোগান শুনে আমার সাথী উছায়েদ হেসে কুট-পাট। শহরের কিছু অংশ প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি থানা মোড়ে এসে থামল। পাতি নেতারা দু'তিন মিনিট করে বক্তৃতা ঝারছিল। এক ফাঁকে আমিও বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে গেলাম। উছায়েদ আমার দিকে তাকিয়ে বই দিয়ে মুখ ঢেকে হাসছিল।

আমি দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে লেলিনের প্রশংসাবাদ গেয়ে বললাম, "প্রিয় দেশবাসী! লেলিনের দেয়া আদর্শকে নিয়ে এগিয়ে চলছি। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের অগ্রযাত্রা থামবে না। প্রিয় ভায়েরা আমার! আমাদের অগ্রপথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল আনোয়ার পাশা। তাকে আমরা নির্মমভাবে হত্যা করেছি। এখন আবার খোবায়েব নামক এক পাষণ্ড আমাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে চায়, যার ছবি দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। উক্ত পাষণ্ড খোবায়েব আমাদের শত শত সৈন্যকে হত্যা করেছে। তাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমাদের যাত্রা থামবে না। আসুন, আমরা আমাদের প্রিয় নেতা লেলিনের বাহুকে মজবুত করি। ধন্যবাদ...।"

আমার তেজদীপ্ত ভাষণের মাঝে মাঝে করতালি আর শ্লোগানে শ্লোগানে ময়দান গরম করে তুলল। দুষ্ট উছায়েদ তখনও হাসছিল। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে আমরা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল দশটায় দেখি এক ঘোড়সওয়ার পূর্বদিকে উদিত হল। এই মনে হয় প্রতীক্ষিত শাহ্সওয়ার। যার অপেক্ষায় পথপানে অপলক নেত্রে অধীর আগ্রহে চাতকের মত তাকিয়ে ছিলাম। চোখের পলকে শাহ্সওয়ারটি বাগডোর

ঘুরিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় এসে অবতরণ করল। আমরা দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে সালাম দিলাম। সে সালামের উত্তর দিয়েছে কি-না ঠিক মনে নেই। কিন্তু তার চেহারায় সফরের কোন ক্লান্তি দেখা যায়নি বরং হাসি খুশীই মনে হল। আমি মনে মনে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম এবং ভাবলাম কিল্লাহ ফতেহ করে বিজয়ীর বেশে ফিরেছে।

দস্তগীর ঘরে প্রবেশ করে জামাটা পাল্টিয়ে কেদারায় বসে জিজ্ঞাসা করল, "তোরা ভাল আছিস? আমি তো তোদের জন্য খুব চিন্তায় ছিলাম। কারণ, আমি নেই কে কি করবে। কষ্ট হয়নি তো?"

"আরে না। কোন কষ্ট হয়নি। তবে যতটুকু কষ্ট পেয়েছি তা তোর চিন্তায়।"

"হ্যাঁ, কষ্ট পাবেই তো, কোথায় পাঠাচ্ছিস তা তো তোর জানা। তাই চিন্তা করেছিস।"

"যেভাবে বলে দিয়েছি সেভাবে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলে? না অসুবিধা হয়েছিল?"

"হুঁ, পৌঁছতে পেরেছিলাম। সেদিকে কোন মানুষ যায়? হাতির খোরাক হতে চলছিলাম। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি।"

দস্তগীর রসিকতা করে হাতির আলাপ জুড়ে দিল। উছায়েদ গালভরে হাসছে। আমার মুখে হাসি নেই। কি ফলাফল নিয়ে এসেছে কে জানে? অতঃপর আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বলল। কিভাবে গির্জায় ঢুকল, পাদ্রীর সাথে কি কথা হল, চাকরানী কি ব্যবহার করল এবং সে কি বলল। ফাদার ও অন্যান্য পাদ্রীরা কি প্রশ্ন করল আর সে কি উত্তর দিল ইত্যাদি ইত্যাদি সব ঘটনা বিস্তারিত জানাল।

মেরীর নির্যাতনের কথা শুনে আমার অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত অশ্রুর স্রোত বইতে লাগল। আমার মন অস্থির হয়ে বলছিল এখনই গিয়ে সবগুলো হায়েনাদের হত্যা করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি। উছায়েদ আমাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিল। আমি কিছুটা শান্ত হলাম।

অতঃপর দস্তগীর বলল, "খোবায়েব! চিন্তা করিসনে। আল্লাহ্‌র ফায়সালাই সর্বোত্তম। আজ থেকেই মেরীর উন্নত চিকিৎসা করা হবে। তাকে সুস্থ করে আমাদের হাতে তুলে দেবে। এটা কি আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত নয়? বেচারী পাক্কা ঈমানদার। এত প্রহারের পরও সে দ্বীনের উপর টিকে আছে। কয়েকবার বেহুঁশ হয়েছে। হুঁশ ফিরে এলেই সে হযরত বেলালে হাবশী (রা.) এর মত জোরে জোরে কলেমা পাঠ করতে থাকে। বর্তমানে তাকে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কক্ষে রাখা হয়েছে। আমি নিজ কানে তার কলেমা পাঠ শুনেছি।"

তারপর কি পরামর্শ হল এবং ফাদার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে ফাদারকে কি আশ্বাস বাণী শুনিয়েছে তা বলল।

আমি সাথে সাথে দু'রাকাত শোকরানা নামায পড়ে নিলাম। আমি সারা দিন আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য চাইলাম যে, হে আল্লাহ্! কিভাবে তাকে মুক্ত করা যায় সে পথ বাতলিয়ে দাও।

দিন চলে গেল। রাত এল। আমি দস্তগীর ও উছায়েদকে নিয়ে বসে বললাম, "দেখ! খৃস্টানরা আমাদের জাত শত্রু। ক্ষণে ক্ষণে নিয়ত পরিবর্তন করে। আমাদের কাছে যখন তার সন্ধান এসেছে, তখন আর বসে থাকা ঠিক নয়। হিতে যদি আনতে না পারি তবে জোরপূর্বক হলেও নিয়ে আসব। প্রয়োজনে আমরা চিকিৎসা করাব। এতে তোমরা দ্বিমত পোষণ করো না। আমার কমান্ড মেনে চল, আল্লাহ্ কামিয়াবী দান করবেন।"

উছায়েদ জিজ্ঞাসা করল, "কিভাবে যাব এবং কিভাবে কি করব, তা আমাদের অবগত করালে ভাল হয়।"

আমি বললাম, তা তো অবশ্যই বলব।" শোন! আমরা তিনজনে তিনটি ঘোড়া নিয়ে যাব। আমাদের কম্বলের নিচে অস্ত্র লুকিয়ে রাখব। আমরা সবাই গরম টুপি পরিধান করব। এখানে সবাই তা ব্যবহার করে, এতে কেউ সন্দেহও করবে না। দস্তগীর শুধু পরিচয়ের জন্য তার চেহারা খোলা রাখবে। দস্তগীর শুধু এতটুকু ফাদারকে বলবে যে, তিনি আমাদের নেতা। আপনার সাথে আলাপ করবে। তারপর যা বলার তা আমি বলব। এতে সবাই একমত হল।

পরদিন বিকাল দু'টায় তিনজনে তিনটি ঘোড়া নিয়ে বর্ণিত সাজে সুসজ্জিত হয়ে গির্জায় গিয়ে হাজির হলাম। অন্যদিনের চেয়ে সেদিনের শীত ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। রাস্তা ঘাটে মানুষ ভয়ে বের হয়নি। আমরা বিনা বাধায় গির্জায় প্রবেশ করলাম এবং ফাদারের কক্ষে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে একটু নতশীরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দস্তগীর আমার পরিচয় দিল, যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। ফাদার আমাদেরকে ইশারায় বসতে বলল এবং আসার কারণ জানতে চাইল।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললাম, মাননীয় ফাদার! গতকাল আমরা লিপটনের কাছ থেকে আপনার মেয়ে আর আমাদের ধর্মীয় বোন মেরীর কথা শুনতে পেয়ে খুবই দুঃখ পেলাম। তারপর আমাদের আধ্যাতিক গুরু ও মুক্তিদাতা, বহু খৃস্টধর্ম গ্রন্থের প্রণেতা স্পেনের বড় গির্জার প্রধান পাদ্রী, রবিন কুয়েজার নিকট এ ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, "মেয়েটিকে নিয়ে এস, আমার আশির্বাদ পেলে ঠিক হয়ে যাবে। তাই আমরা ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। যদি আপনার সদয় অনুমতি হয়।"

"তিনি কতদিন হয় এসেছেন?"

"তা ঠিক বলতে পারব না, তবে আমাদের এখানে এসেছেন গতকাল। চলে যাবেন আগামীকাল। তাই একটু তাড়াহুড়া। তিনি রোগীকে দম করলে সাথে সাথে ভাল হয়ে যায়। তিনি যীশুর আশির্বাদ প্রাপ্ত।"

"তিনি কি সব গির্জায়ই যান?"

"না সব গির্জায় যান না। শুধু নির্বাচিত গির্জায় যান। বর্তমান রাষ্ট্রীয় গোলযোগের কারণে তিনি গোপনে এসেছেন। চলেও যাবেন গোপনে। তা না হয়...।"

"মেরী তো খুবই দুর্বল। সে যাবে কিভাবে?"

"আমরা ঘোড়া নিয়ে এসেছি। ঘোড়ায় তুলে আস্তে আস্তে নিয়ে যাব।"

ফাদার বলল, "যাও তো, শয়তানটাকে তাদের ঘোড়ার উপর তুলে দাও। যাও জলদি যাও। ফাদারের আদেশ পেয়ে চার পাঁচজন গিয়ে মেরীকে এনে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিল। বেচারী খুবই দুর্বল। বসে থাকা তার জন্য খুবই কষ্টকর।

মেরী জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?"

পাদ্রী উত্তর দিল, "চিকিৎসার জন্য।"

সে বলল, "না, যাব না। আমার চিকিৎসা হবে পাতাল পুরীতে, পিতাজির হাতে।"

পাদ্রীগণ অনেক বুঝাল। তারপর খামোশ হয়ে গেল। দু'পাদ্রী আমাদের সাথে রবিন কুয়েজারের আশির্বাদ আনতে যেতে চাচ্ছে। আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন। এবার সবাই আস্তে আস্তে অগ্রসর হলাম। পাঁচটি ঘোড়া উজিরাবাদের দিকে চলছে। বেশ কিছুদূর পথ অগ্রসর হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য ঘোড়া থামালাম। তারপর আমার টুপিটা খুলে স্টেনগানটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

পাদ্রীরা আমার চেহারা দেখে আঁতকে উঠল। তাদের আত্মার পানি শুকিয়ে গেছে। ভয়ে ঠোঁট থেকে একটি কথাও বের হচ্ছে না। আমি ওদের কানে কানে বললাম, দেখ্ মেরীকে কে উদ্ধার করেছে? তোরা এদিকে কোথায় যাচ্ছিস? পাদ্রীরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। অতঃপর বললাম, তোদের ফাদারকে গিয়ে বল, আমি তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছি। যীশুকে নিয়ে ক্ষমতা থাকলে তাকে উদ্ধার কর। এই বলে এক লাফে মেরীর ঘোড়ায় বসে সোজা পশ্চিম দিকে চললাম আর মেরীকে আমার সামনে বসিয়ে একহাতে ধরে রাখলাম।

পাষণ্ড পিতা তাকে কোন শীত বস্ত্রও দেয়নি। পরনে যে শোণিত সিক্ত ছিন্ন বসন ছিল, এগুলো ছাড়া আর কোন কাপড় নেই তার সাথে। এমনিতেই হাড়

কাঁপানো শীত, আবার বইছে দখিনা হাওয়া। উভয়টা মিলে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া একমত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি আমার কম্বলের সিংহভাগ দিয়ে তার শরীরটা লেপটিয়ে দিলাম এবং আমার বাহু বন্ধনে রেখে আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসার মত সুযোগ করে দিলাম।

মেরী এখনো বুঝতে পারেনি, কি ঘটে যাচ্ছে। সে রুষ্ট কণ্ঠে খুবই তিক্ত সুরে বলতে লাগল, খোদাদ্রোহী, জালেম ও নর পশুরা! এত জুলুম, অত্যাচার আর নির্যাতনের পর আমার গায়ে কম্বল তুলে দিয়ে এত দরদ দেখাচ্ছিস কেন? তোরা ভেবেছিস আমার উপর একটু দয়া আর অনুগ্রহ দেখালেই আমি তোদের যীশুকে খোদা মেনে নেব! তা কক্ষনো নয়। যা ভেবেছিস তা হবে না। স্বর্গের দ্বার খুলে পালিয়ে আসা এক স্বর্গীয় যুবকের মাধ্যমে পেয়েছি আলোর দিশা। পেয়েছি সত্যের সন্ধান। শিখিয়েছে আমাকে এমন এক মন্ত্র, যা পাঠ করলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। শত বিপদে ধৈর্যধারণের প্রেরণা জোগায়। সে মন্ত্র পাঠ করলে চিন্তা, পেরেশানী, দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়ে যায়। আহাঃ কত মধুর বচন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

সে একমত উন্মাদ ছিল। অন্য কোন খেয়াল তার ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের প্রলাপ বকছিল। অকস্মাৎ একবার বলে উঠল, "তোরা না আমাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যার পরিকল্পনা করেছিস? তাহলে হত্যা করছিস না কেন? নাকি হত্যা করার জন্যই নিয়ে যাচ্ছিস? তাহলে ঘোড়া আরো জোরে চালা। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দে শেষ সীমানায়। আরে এত দূরে নিয়ে লাভ কি? এত কষ্ট করার দরকার কি? এখানেই আমার জীবন তরী থামিয়ে দে। জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দে। প্রভুর কাছে ফিরিয়ে দে। আর সহে না জ্বালা, আর সহে না।"

আবার সুর পাল্টিয়ে বলতে লাগল, "আরে তোরা আমাকে ছেড়ে দে। আমি বিশ্ব চরাচর ভ্রমণ করে খোবায়েবকে খুঁজে বের করব। সে আমাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে কেন সুদূরে পাড়ি জমিয়েছে। পাহাড়-পর্বত, গিরি-কান্তার, মরু দুস্তর, পারাবার চষে বেড়াব। সে যে সুমধুর গান শুনিয়ে আমাকে পাগল করেছে, তা তো সে জানে না। তাকে শুধু এতটুকু জানিয়ে দেব যে, আমি মুসলমান। আহাঃ তাকে যদি আর একবার পেতাম! আয় আল্লাহ্! খোবায়েবকে হেফাজত কর! তার সাথে সাক্ষাত না করিয়ে আমাকে শহীদ করো না। আমীন! ইয়া রাব্বুল আলামীন!

আমি তার অগ্নিদগ্ধ হৃদয়ের আহাজারি আর কাকুতি-মিনতি শুনে ঠিক থাকতে পারছিলাম না। আমার বক্ষ পিঞ্জর দলিত-মথিত করে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। আঁখি যুগলের তপ্ত অশ্রু ধারায় বক্ষদেশ সিক্ত হতে লাগল।

তার এ অবস্থা দেখে মনে মনে ভাবছিলাম যে, মেয়েটি খৃস্টানকুলে জন্ম নিয়ে জীবনের ১৮/২০ টি বৎসর মিথ্যার পিছনে কাটিয়েছে, তার আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তির কোন অভাব ছিল না। আজ ঈমান আনার অপরাধে তাকে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, নিজেদের নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য, নিজের সুন্দরী কন্যাকে অপরের হাতে তুলে দিয়েছে দেহমিলনে তৃপ্তি পেয়ে যেন তারা খুশী হয় আর তাদের উপর কোন নির্যাতন না আসে। যে মেয়েটি জীবনে কোনদিন মাদ্রাসায় পড়েনি, কুরআন শেখেনি, নামায-রোযা করেনি, ঈমানের পিছনে মেহনত করার সুযোগ পায়নি, কলমাটাও ছহীভাবে উচ্চারণ করতে পারেনি, তাকে আজ ঈমানের কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তার ঈমানের পাওয়ার কতটুকু যে, এত নির্যাতন ভোগ করার পরও সে ঈমান থেকে এক চুল পরিমাণ নড়েনি। এসব চিন্তা করে তার জন্য খুব বেশী বেশী দোয়া করতে লাগলাম।

আমাদের চলার পথ ছিল দুর্গম, অসমতল। চলার গতি ছিল মন্থর। কারণ ঘোটক যদিও ছিল শক্তিশালী ও কর্মঠ কিন্তু পৃষ্ঠদেশে তো রোগী। ঘোড়ার ঝাঁকিতে মেরীর কষ্ট হচ্ছিল প্রচুর। তাই বাধ্য হয়েই আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছিল।

এদিকে উছায়েদ বলল, "আমাদেরকে যদি উজিরাবাদ শহরের উপর দিয়ে যেতে হয় তবে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উজিরাবাদ পৌঁছতে আমাদের রাত হয়ে যাবে। আর প্রায় শহরেই সন্ধ্যার পর কারফিউ জারি থাকে। তিন তিনটি ঘোড়া নিয়ে শহর অতিক্রম করা খুবই ভয়ের ব্যাপার। আমাদের সাথে যদি রোগী না থাকত, তবে প্রয়োজনে বাতাসের আগে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতাম আর দরকার হলে ফায়ার করে রাস্তা পরিষ্কার করতাম। এখন ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন কি করবেন?"

উছায়েদ যা শোনাল, তা তো অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। তা হলে উপায়...? আমি দস্তগীরকে তার অশ্ব থামাতে বললাম। সে অশ্বের বাগডোর টেনে ধরল। আমি তার নিকট গিয়ে সমস্যার কথা জানালাম। সেও বলল, "হ্যাঁ, কারফিউ তো থাকেই। আমরা সন্ধ্যার পর কোনদিনই বাজারে যাইনি।"

"তাহলে উপায়?"

"উপায় তো আমার জানা নেই।"

"অন্য কোন উপায় কি তোর জানা নেই যে, আমরা শহরে না ঢুকে ওপথে চলে তোর বাড়ী পৌঁছতে পারব?"

"না, এমন কোন পথ আমার জানা নেই। তুই আমাকে ফেরীঅলা ভাবছিস যে গ্রাম-গঞ্জের পথ-ঘাট সবই আমি জানব?"

"এতে ফেরীঅলার কি আছে? বাড়ীর ১০/১২ মাইলের মধ্যে পথ-ঘাট, হাট-বাজার, পাড়া-মহল্লা অনেকেরই জানা থাকে, তোর মত বোকারাম কি সবাই?"

উছায়েদ বলল, "এ দরবেশের দ্বারা কাজ হবে না, আমাদের অন্য চিন্তা করতে হবে।"

"আচ্ছা চল, শহরের প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ অর্ধ কিলোমিটার দূর দিয়ে সোজা উত্তরে চলে যাব। তারপর এক কিলো পশ্চিমে যাব, আবার এক কিলো দক্ষিণে এসে বোকারামের বাড়ীর সন্ধান নেব। এতে যদিও কষ্ট হবে, সময় লাগবে তবু নিরাপদ মনে করি।"

এতক্ষণে সূর্যটা ক্লান্ত হয়ে রঙিন আভা ছড়িয়ে অস্তপারে চলে গেছে। হয়ত একটু পরেই দুনিয়াটা কালো চাদরে আবৃত করে হারিয়ে যাবে। আমরা আরো একটু পথ এগিয়ে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলাম। মেরীকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামিয়ে আমরা নামায আদায় করলাম। নামায সমাপ্তের সাথে সাথে দস্তগীর বলল, খোবায়েব! আমাদের পিছন দিক থেকে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে! হয়ত কোন বনিকদল হবে। আমরা অপেক্ষা করে ওদেরকে সাথে নিয়ে নেই।"

উছায়েদ বলল, "ভাইজান! পাগলের কথা বাদ দেন। কি করবেন জলদি করুন। নিশ্চয় দুশমন আমাদেরকে ধাওয়া করে ফিরছে। জলদি করুন। ওরা খুব দ্রুতগতিতে ধেঁয়ে আসছে।" এদিকে মেরী আমাদের নামায পড়তে দেখে একা একাই বক বক করছিল যে, কিরে! তোরা দেখি মুসলমানের মত নামায পড়ছিস? কেন? যীশুর বন্দেগী ভাল লাগেনা? যীশু না তোদের বাপ লাগে? যীশুর বউ মা লাগে।" ওর কথা শুনে বিপদের সময়ও হাসি পেল।

আমি সবাইকে বললাম, "চল, রাস্তা ছেড়ে আমরা একটু বনের ভিতর ঢুকে পড়ি। সেখানে অশ্ব ও মেরীকে রেখে তার দেখাশোনার জন্য দস্তগীরকে দিয়ে আমরা এ্যামবুশ লাগাই। তাহলে কোন বাপের বেটা নেই নিরাপদে ফিরে যাবে।" অতঃপর তাই করা হল। ওদেরকে একটু দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আমরা স্টেনগান দুটো পূর্ণ লোড করে ওঁৎ পেতে বসে রইলাম।

অশ্বারোহীরা আমাদের একদম নিকটে এসে গেছে। ওদের একজন বলল, "কই তাদের তো কোন পাত্তা নেই। ওরা এতক্ষণে নাগালের বাইরে চলে গেছে। অন্য একজন বলল, "আরে মেরীকে উদ্ধার করতে পারি আর না পারি এখন ফিরে গেলে ফাদার রাগ করবেন, অভিশাপ লাগবে। এতটুকু বলার সাথে সাথে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝলাম এরা গির্জার পাদ্রী। উছায়েদকে ইশারা দিয়ে উভয়ে ফায়ার আরম্ভ করলাম। তিনজন সাথে সাথে জাহান্নামে চলে গেল। বাকিরা কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালাল। আমরা তাদের থেকে আংটি, ঘড়ি, টাকা, পকেট

ডায়েরী ও গলা থেকে ক্রুশ খুলে নিয়ে এলাম। অতঃপর পূর্বের ন্যায় মেরীকে আমার অশ্বে তুলে, পরিকল্পিত পথে রাত একটার দিকে এসে দস্তগীরের বাড়ীতে পৌঁছলাম।

দস্তগীর তার মাকে ডেকে তড়ি-ঘড়ি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করল। মেরী চারদিনের অনাহারী। তার জন্য তৈরী করল নরম খাবারের ব্যবস্থা। আমরা কিছু খেয়ে জঠর জ্বালা নিবারণ করলাম। কিন্তু মেরী কিছুই খাচ্ছে না, বরং বলছে—"তোদের খানা আমার জন্য হারাম, তোদের খাবার উদরে ঢুকবে না। তোরা কাফির।"

আমি বুঝতে পারলাম এখন পরিচয় দিয়ে তাকে শান্ত করা ফরজ। তাই মাথার টুপী খুলে চেহারার আবরণ দূরে ফেলে পাশে বসে বললাম, "বোন! তোমাকে জালেমদের হাত থেকে মুক্ত করতে পেরেছি বলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছি।" অমনি সে আমার দিকে তাকিয়ে এক চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, "খোবায়েব! তুমি? আমার অন্তরে তাওহীদের আগুন ধরিয়ে কোথায় লুকায়েছিলে? সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মস্তক রেখে কাঁদতে লাগল। আমি তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললাম—শান্ত হও, সব বলব, সব শুনব। এখন খেয়ে নাও। তারপর গরম দুধে রুটি ভিজিয়ে তার মুখে তুলে দিলাম। সে উদর পূর্ণ করে আহার করল। আমাদের সাক্ষাতে খানা খাওয়ায় সে যেন অর্ধেকই সুস্থ্ হয়ে গেছে। দস্তগীর তার মায়ের খাটে মেরীর শয্যা রচনা করে দিল। আর আমরা তিনজন মেহমান খানায় শুয়ে পড়লাম।

॥ বাইশ ॥

পালিয়ে যাওয়া পাদ্রীগণ রাত ৮ টায় গির্জায় গিয়ে পৌঁছল। ফাদার যোহন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছিল যে, নিশ্চয় দুশমনের হাত থেকে পাপীষ্ঠা মেরীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। ফাদার যোহন ওদের সাথে মেরীকে না দেখে সহজেই আঁচ করতে পারল যে পরিণতি ভাল হয় নাই। কোন সুসংবাদ বহন করে আনেনি। তিনি চেয়ে দেখেন সকলের কাপড়েই রক্তের দাগ লেগে আছে। বিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে এক পাদ্রী কেঁদে কেঁদে বলল, "মাননীয় ফাদার! আমাদের তিনজন সাথীকে দুশমনরা হত্যা করে ফেলেছে। আমরাও কেউ অক্ষত নই। সকলেরই কিছু না কিছু রক্ত ঝরছে।"

ফাদার বলল, "তোমাদের সাথে যাদের সংঘর্ষ হয়েছে তাদেরকে কি তোমরা চিনতে পেরেছ?"

পাদ্রী বলল, "চিনতে পারিনি। গোধূলী লগ্নে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তাই কোনকিছু বোঝার আগেই...।"

"তোমরা কি দেখতে পেলে?"

"আমরা খুব দ্রুতগতিতে অশ্ব হাঁকিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দু'দিক থেকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। চেয়ে দেখি সম্মুখে তিনজন ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ আমরা পশ্চাদপসরণ হতে বাধ্য হলাম।"

"আনুমানিক দুশমন কতজন হবে?"

"অনুমান করা মুশকিল, তবে ২০/২৫ জন যে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। (অন্যদের দিকে তাকিয়ে) তোমাদের ধারণা কি?"

অপর পাদ্রী বলল, "হ্যাঁ তাতো অবশ্যই হবে।"

"তোমরা কি তাদের অশ্ব এবং মেরীকে দেখেছ?"

"না, ওসব কিছুই দেখিনি।"

"মেরীর অপহরণকারীরা ছিল মাত্র তিনজন। আর এখন বলছ ২০/২৫ জন হবে। অশ্বগুলো এবং মেরীকেও দেখনি। তাহলে কি করে বুঝলে ওরা অপহরণকারী? ডাকাত দলও তো হতে পারে?"

"মাননীয় ফাদার! ওরা আপনার কাছে তিনজন এসেছিল। আর বাকীরা রাস্তায় লুকিয়ে ছিল।"

"তাহলে ঐ সময় তো দেখনি।"

"আমরা তখন লোক কম ছিলাম, তাই ওরা বের হয়নি। এখন লোক বেশী তাই সবাই বেরিয়েছে।"

অতঃপর ফাদার বলল, "প্রথম যে ছেলেটি খৃস্টান ও কমিউনিস্ট নেতা সেজে আমার কাছে এসেছিল, ওই শালা মুজাহিদদের গোয়েন্দা। তখন শালাকে চিনতে পারিনি। তারপর যে দু'জনকে নিয়ে এল, ওরা পাক্কা মুজাহিদ। আমার মনে হয়, ডান পার্শ্বে মুখ ঢেকে যে বদমায়েশটি বসা ছিল এবং আমার সাথে শেষে কথা বলেছিল সে সেই ব্যক্তি, যে আমাদের ধর্মের ১২টা বাজিয়েছে।"

অন্যরা আলবৎ, আলবৎ শব্দে গির্জা কাঁপিয়ে তুলল।

ফাদার এসব আলাপ শেষে বলল, আগামীকাল সকালে তোমরা কষ্ট করে উস্তুবার, মার্ডবার্গ, আর্মবার্গ ও কূরগানের সকল খৃস্টানদের বিকাল দু'টায় গির্জায় আসতে বলবে। জরুরী পরামর্শ ও বিশেষ প্রার্থনা করা হবে। তোমরা এলান করে বলে দেবে, "স্বয়ং খোদাওন্দ যীশু ফাদারকে নির্দেশ দিয়েছেন এ সভা আহবানের জন্য, তাই তিনি সবাইকে ডেকেছেন। তোমরা সবাই পাক-পবিত্র হয়ে যথাসময়ে গির্জায় হাজির হবে। অন্যথায় অভিশপ্তের দলভুক্ত হবে। এ সংবাদ শুনে কোন খৃস্টানই না আসার দুঃসাহস দেখাবে না। আর যারা না আসবে, তাদেরকেই মনে করবে কাফের হয়ে গেছে।"

পাদ্রীগণ ফাদারের কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, "আমরা আপনার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল করব। বাকি আপনার আশীর্বাদ। অতঃপর সবাই আহারাদি সেরে শুয়ে পড়ল।

সকালে সকল পাদ্রীগণ পরামর্শ করে এক একজন, এক এক এলাকায় বেরিয়ে পড়ল মিটিং এর দাওয়াত নিয়ে। ৩/৪ ঘন্টায় প্রায় সব এলাকায় দাওয়াত পৌঁছে দিল। বিকাল দু'টায় গির্জা চত্বরে লোকজন এসে জমায়েত হল। যারা মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছে, এদের মধ্যে পাদ্রী, নান, রাহেব ও শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। লোক সংখ্যাও অন্য মিটিংএর চেয়ে অনেক কম।

ফাদার আফসোস করে বলল, "প্রিয় খৃস্টান ভায়েরা! খোদাওন্দ যীশুর নিকট ঈমানের দাম অনেক বেশী। অনেক মূল্যবান। আর মূল্যবান জিনিসই চুরি-ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। আমাদের চির শত্রু হল শয়তান। মানুষের ঈমান হরণ করার জন্য এক একজন ঈমানদার খৃস্টানের পিছনে শত শত শয়তান তাড়া করে ফিরে।

একটু কাবু করতে পারলেই ছু মেরে ঈমান নিয়ে পলায়ন করে। কয়েক দিনে যা ঘটল এটাই তার প্রমাণ।

প্রিয় খৃস্টান ভায়েরা! বর্তমানে আমরা খুব সংকটময় অবস্থায় আছি। কারণ একদিকে মুসলিম মুজাহিদরা। আর অপর দিকে হল কমিউনিস্টরা। এদের মধ্যে আমরা পরামর্শের মাধ্যমে কমিউনিস্টদের সমর্থন দিয়েছি। বলসেবিকরা আমাদের বন্ধু। এদেরকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। সুতরাং তোমরা এদের বিরোধিতা করো না। আর একটা কথা ভালভাবে মনে রাখবে। তা হল যেভাবেই হোক মুজাহিদদের তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। তাদেরকে ধরে ধরে জবাই করতে হবে এবং আমার পাপীষ্ঠ কন্যাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। না হয় তার দ্বারা খৃস্টধর্মের চরম ক্ষতি করাবে।"

উপস্থিত সকলেই জ্বি-জ্বি বলে মঞ্চ গরম করে তুলল।

ফাদার পাদ্রী পিটাসবার্টের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দিয়ে বলল, "তোমরা স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ ও বলসেবিকদের সাথে লিয়াজু মেন্টেন করবে, আর বলসেবিকদের বলবে, মুজাহিদরা এ এলাকার কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে, বা পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে আস্তানা গেড়েছে। এখন যদি এদেরকে কিছু করা না হয় তবে তাদের শক্তি বৃদ্ধি হলে কিছুই করা যাবে না। এক সময় উস্তুবার, মার্ডবার্গ, আর্মবার্গ ও কূরগান হবে তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি। দেখা যাবে দুর্বল ঈমানী খৃস্টানরাও তাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। এভাবে দেখবে দিন দিন তাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। তারপর আফসোস করলে কোন ফল হবে না।"

ফাদারের নির্দেশ পেয়ে পাদ্রী পিটাসবার্টের সদস্যগণ, বড় বড় নেতাদের সাথে আলোচনা করল এবং অতীতের ঘটনাবলীও অবগত করাল।

কমিউনিস্ট নেতারা এদের নিয়ে সেনা ছাউনীতে গিয়ে সেনা কর্মকর্তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করল। তাদের কথা শুনে মেজর টাটান্স বলল, "মাত্র ক'দিন আগে মুজাহিদরা আমাদের প্রাণপ্রিয় ব্রিগেডিয়ার এস, কে পারসানস সহ ৯০জন সুদক্ষ রণকৌশলী সেনাদেরকে হত্যা করেছে। এটা কারো অজানা নয়। বর্তমানে আমরা জীবনটা হাতের তালুতে রেখে দিন যাপন করছি। বনাঞ্চলে অভিযান চালানোর মত সৈন্য ও রসদপত্রের খুব অভাব। কাজেই এ ব্যাপারে আরো পরামর্শের দরকার।"

পাদ্রী বলল, "স্যার! আপনি যত কঠিন মনে করছেন, আসলে তত কঠিন নয়। কারণ আমরা দেখেছি তাদের লোক সংখ্যা খুব অল্প এবং অস্ত্র-শস্ত্রও তেমন একটা নেই। সাহস করে যদি আমরা হামলা করতে পারি তবেই হয়।"

মেজর বলল, "জীবনে দু'একটি হামলা করলে এবং তার মজা দেখলে হয়ত একথা বলার সাহস পেতে না। ওরা সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন, তাদের কৌশল ভিন্ন। ওরা গেরিলা কায়দায় হামলা করে। কোথাও ওঁৎ পেতে বসে থাকে, সুযোগ বুঝে হামলা করে। এখানে হামলা করে চলে যায় ২০ মাইল দূরে। সেখানে কয়েক দিন চুপচাপ থাকে, আবার হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের কিছু সৈন্য হত্যা করে ভীতি ছড়িয়ে চলে যায় কোন সুদূরে। এরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আরো একটি জিনিস লক্ষণীয়, তা হল—আনোয়ার পাশার রেখে যাওয়া কমান্ডার বর্তমান সময়ের আতঙ্ক, খোবায়েব জাম্বুলীর কথা শুনলে আমাদের রক্ত জমাট হয়ে যায়। রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। এই দেখ, শরীরের লোমগুলো সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেছে। ঠিক আছে, তোমরা এসেছ, বলেছ, আমি শুনেছি। এখন সেনা অফিসারদের ডেকে পরামর্শ করি কি করা যায়। এখন চলে যাও, পরে সংবাদ নিও।" সবাই চলে গেল।

ফাদার পাদ্রীর নিকট থেকে সবকিছু শুনে পাদ্রী বলল, "আগামীকাল গিয়ে মেজরকে বলবে স্যার! আমরা আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা করব, তবু আপনাদের হামলা করতে হবে। আরো বলবে, আমরা কাঠুরিয়া সেজে কাঠ কাটার ছলে ঘুরে ঘুরে তাদের আস্তানার সন্ধান নেব। তারপর আপনারা অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবেন। এতে অবশ্যই বিজয়ী হবেন।"

পরদিন মেজরকে এভাবেই জানানো হল। মেজর এতে রাজি হল। সে ৫০ জনকে পাবলিক সাজিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে ৫০ জন এলাকাবাসীর সাথে অরণ্য হামলায় পাঠিয়ে দিল। ওরা সবাই কাঠুরিয়ার বেশে যাত্রা আরম্ভ করল। বনের নিকট গিয়ে কেউ আর ভিতরে প্রবেশ করতে রাজি হচ্ছে না। কেউ বলে এদিকে

না ওদিকে। কেউ বলে আজ না কাল। কেউ বলে আর্মীরা আগে যাক আমরা থাকব পিছনে। আবার কেউ বলে সৈন্যরা পিছনে থাকলেই ভাল হবে।

পাহারায় রত একজন মুজাহিদ আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শুনে বুঝতে পারল যে, এরা সেনাবাহিনীর লোক, সিভিলে এসেছে। কমান্ডো আক্রমণ করবে। সে ওয়ারলেছের মাধ্যমে ক্যাম্পে সতর্ক হওয়ার সংকেত দিয়ে দিল।

মার্কাজের জিম্মাদার ওয়ায়েভ মুজাহিদদেরকে শ্রেণী বিন্যাস করলেন এবং কার কি দায়িত্ব তা বুঝিয়ে দিলেন। সবাই আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। ওয়ায়েভ বেশী ভয় পাচ্ছিলেন কারণ এরা সবাই নতুন। কোনদিন হামলা করেনি, আবার হামলায়ও পড়েনি। তাই বেশী ভয় পাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করছিলেন।

সেনাবাহিনী আর পাবলিক মিলিত হয়ে একটু একটু করে সামনে আগাতে লাগল। একেকজনের হাঁটু ডিপথিরীয়া রোগীদের মত কম্পন আরম্ভ করল। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে গা শিউরে উঠছে। বৃক্ষ শাখের পতিত শব্দে ভয় পেয়ে বুকে থুথু মালিশ করছে।

এমনিভাবে পা পা করে এগিয়ে গেল মুজাহিদদের অস্ত্রের রেঞ্জে। মুজাহিদরা তিনদিক থেকে ফায়ার আরম্ভ করল। সৈন্যরা জমিনে লুটিয়ে পড়ল। আরম্ভ হল উভয় পক্ষে তুমুল গোলাগুলি। একটানা এক ঘন্টা গুলি বিনিময় হল। সাতজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করলেন আর শত্রুপক্ষের নিহত হল ৩৮ জন। এর মধ্যে সেনাসদস্য ১৯ জন আর সাহায্যকারী পাবলিক ১৯ জন। আর আহতদের সংখ্যা ২২ জন। এর মধ্যে ৭ জন আর্মি আর ১৫ জন পাবলিক।

মেজর টাটান্স চারদিকে লাশ আর লাশ দেখে ঘাবড়ে গেল এবং পিছু হটতে লাগল। বেঁচে যাওয়া সৈন্যদেরকে মুজাহিদরা ভাগার রাস্তা করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই পালিয়ে গেল। গুরুতর আহত পাঁচজন হতভাগা এখনো মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। ওয়ায়েভ খঞ্জরের আঘাতে তাদের যন্ত্রণার দাওয়াই দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিন মুজাহিদ সাধ্যানুযায়ী রসদপত্র নিয়ে এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন।

মেজর টাটান্স এ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করল খৃস্টানদের, তাই ফিরে গিয়ে ফাদারসহ গির্জার সমস্ত খৃস্টানদের হত্যা করে ফেলল।

॥ তেইশ ॥

পরদিন দস্তগীরকে মেরীর ঔষধের জন্য বাজারে যেতে বললাম। সে বলল, "হয় রোগী নিয়ে চলি, না হয় ডাক্তার বাড়িতে নিয়ে আসি। ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ ব্যবহার করলে উপকার বেশী হবে।" আমি বললাম, তোমার কথা অবশ্য

ঠিক। কিন্তু এতে নিরাপদ মনে করি না। আপাতত ব্যথার টেবলেট ও বাম, আর ক্ষতস্থান শুকানোর জন্য কয়েকটি ইনজেকশন নিয়ে আস। এতে অনেকটা উপশম হবে। তারপর যদি প্রয়োজন হয় তবে দেখা যাবে। এই বলে দস্তগীরকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলাম।

দস্তগীরের আম্মা আমাদের জন্য নাস্তা তৈরী করে খেতে দিলেন। আমরা তিনজন একসাথে বসে আহার করছি। মেরী দুধে রুটি ভিজিয়ে অল্প অল্প করে খাচ্ছে আর আমরা কাবাব দিয়ে রুটি খেতে লাগলাম। মেরী বার বার আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে ও ফোটায় ফোটায় অশ্রু ঝরাচ্ছে। আমি তার অবস্থা বুঝেও না বোঝার ভান ধরে বললাম, "বোন! তোমার মনে হয় খেতে কষ্ট হচ্ছে। আমি রুটি নরম করে আস্তে আস্তে মুখে তুলে দেই, তুমি খাও। একটু কষ্ট হলেও জোর করে খেতে হবে। তা না হলে স্বাস্থ্য ঠিক হবে কিভাবে?"

মেরী বাম হাতে চোখের অশ্রু মুছে বলল, "না ভাই! তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট করেছ। জীবন বাজী রেখে জালেমের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছ। আহাঃ জালেম পিতা ও পাদ্রীরা আমার উপর কতই না নির্যাতন করেছে। শারিরীক, মানসিক, দৈহিক কোন দিকেই নির্যাতন করতে বাকি রাখেনি। চরিত্রহীন পাদ্রীরা আমার ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্যও চেষ্টা করেছিল। হুঁশ থাকাকালীন আমার কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। পিতা হয়ে কামুক পাদ্রীদের লেলিয়ে দিয়ে ছিল আমার ইজ্জত হরণ করার জন্য। ছিঃ কত জঘন্য এসব খৃস্টানরা!"

আমার খানা শেষ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আংটিটি (যা পাদ্রীদের মেরে হাত থেকে খুলে এনেছি) বের করে মেরীর সামনে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখতো, এ আংটিটি চেন নাকি? সে লাফিয়ে উঠে বলল, "আরে! এটাতো রাহেব যতীর আংটি। এটা আপনার হাতে এল কি করে? অনেক দামী আংটি এটি। রাহেব যতীই তো আমাকে অনেক মেরেছিল। তার মার খেয়ে আমি বেশ কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "আলহামদু লিল্লাহ! আমরা তার প্রতিশোধ নিয়েছি। তাকে হত্যা করেছি।" মেরী আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

তারপর ঘড়িটি বের করে জিজ্ঞাসা করলাম, "বোন মেরী! দেখতো ঘড়িটি চেন কি-না?"

সে খানা শেষ করে হাত ধুয়ে ঘড়িটা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে আবিষ্কার করে ফেলল এবং বলল, "এটা পাদ্রী তিব্রীর ঘড়ি। এটা পেলেন কিভাবে? এই তিব্রীই আমার ইজ্জত লুণ্ঠন করতে চেয়েছিল।"

আমি বললাম, "তার প্রতিশোধও আমরা নিয়েছি। তাকে জাহান্নামের ভিসা লাগিয়ে দিয়েছি।" এবারও সে খুশী প্রকাশ করল।

অতঃপর ডায়েরীটা সামনে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখ তো মেরী! এটা চেন না-কি? চিনলে পুরস্কার দেব।"

"কি পুরস্কার দেবেন ভাইয়া?"

"যা চাও।"

"যা চাই আসলেই কি তা দেবেন? নাকি মিথ্যা?"

"আসলেই তা দেব, যদি সাধ্যে কুলোয়।"

"সাধ্যের বাইরে হলে?"

"দেব না।"

"আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এমন এক চিজ দাবী করব যা সাধ্যের বাইরে নয়। শুনুন, যে ডায়েরীটা আপনার হাতে সে আমার পিতার পরামর্শ দাতা। তার নাম পাদ্রী ফাইজালান্স। সে একজন উচ্চ পর্যায়ের পাদ্রী। পিতাজির স্থলাভিষিক্ত হবে সে। বেতন পায় প্রায় পিতাজির সমান। সেও চরিত্রহীন, লম্পট, দাগাবাজ।"

"পাদ্রীদের আবার বেতন দেয়া হয় নাকি?"

"তাহলে...?"

"বেতন দেয় কারা?"

"কমিটি আছে না? ওরা দেয়। যেমন বাইবেল সোসাইটি, গির্জা সংরক্ষণ কমিটি ও খৃস্টধর্মের মিশনারী সংস্থা।"

"ওরা এত টাকা পায় কোত্থেকে?"

"ওম্-মা! এত টাকা পায় কোথায় তা বুঝি জানেন না?"

"তোমাদের ব্যাপার আমি জানব কি করে?"

"শুনুন! খৃস্টানদের সম্পদের চারভাগের এক ভাগ বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কাজে খরচ করতে হয়। এটা সবাই করে। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা আয় হয়।"

"একেক জন পাদ্রীর বেতন কত?"

"তার কোন কোঠা নেই। যার যার কাজের উপর বেতন দেয়া হয় এবং বৃদ্ধি করা হয়। এতে ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার পর্যন্ত বেতন পায়।"

"অ...! তাহলে এরা ধর্ম ব্যবসায়ী। টাকার বিনিময়ে এবাদত করে থাকে তাই না?"

"অবশ্যই। বেতন একটু বাকী পড়লে এরা গির্জায় আসে না।"

"আচ্ছা পুরস্কারটা কি বোন?"

"(দাঁতগুলো বের করে গালভরা হাসি হেসে উছায়েদ বলল) পুরস্কার কিন্তু অনেক সময় হারিয়ে যায়।"

"এমনটি চাও, যা না হারায়। আর হারালেও যেন ফিরে পাও।"

"আমাকে দিলে হারাবে না। চুলের সাথে বেঁধে রাখব। না হয় অন্তরে লুকিয়ে রাখব। দেবেন ভাইয়া?"

"বল, সেটা কেমন পুরস্কার শুনি।"

"(চম্পক কলির মত তার আংগুলের অগ্রভাগ আমার কপালে স্পর্শ করে) এই লোকটাকে।"

উছায়েদ হেসে বলল, "ঠিক ঠিক, তা ঠিক! আমিও এতে একমত। আমি মেরীর সাথেই আছি।"

কিছুক্ষণ পর দস্তগীর ঔষধ নিয়ে এল। আমি ইনজেকশন পুশ করে দিলাম। মেরী হাসতে হাসতে কুটপাট। অতঃপর বলল, "যেমন রোগী, তেমন ডাক্তার। মনে হয় একেবারে সিভিল সার্জন।" ওর বিদ্রূপে আমারও হাসি পেল।

সে আবার বলে উঠল, "ডাক্তার মানুষ রোগীর কাছে বসে হাসে নাকি?"

আমি বললাম, "রোগী বিশেষে হাসতে হয়। এতে রোগের উপশম হয়। অতঃপর সম্ভাব্য ক্ষত স্থানে বাম মালিশ করে, টেবলেট খাইয়ে দিয়ে বললাম, এখন যাও একটু পরেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।"

এর মধ্যে দস্তগীর নাস্তা খেয়ে আসতে আসতে বলল, "খোবায়েব তোর জন্য দু'টি খবর নিয়ে এসেছি, শুনবি কি?"

"কি খবর এনেছিস?"

"আমার এক বন্ধু বলল, তুই নাকি গত দু'দিন আগে থানা চত্বরে বিরাট ভাষণ দিয়েছিস? অগ্নিঝরা ভাষণ। এ বাটপারি আবার শিখেছিস কবে?"

"সময় মত অনেক কিছুই করতে হয়।"

"যাক এলাকার যুবকরা খুব খুশী হয়েছে। ওরা তোকে দাওয়াত দিয়েছে বিকেলে ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাবি না-কি?"

"তুই গেলে যাব। দেখি তোরা কি আকাম করিস।"

"আরও একটা বিরাট খবর আছে।"

"সেটা আবার কি?"

দস্তগীর একটা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা বের করে বলল, "দেখ, এর মধ্যেই রয়েছে।"

আমি পত্রিকাটি খোলার সাথে সাথে উছায়েদ টান দিয়ে নিয়ে গেল। আমার আগে বিশেষ খবরটি তার চোখ আকর্ষণ করেছিল। খবরটি হল প্রথম পৃষ্ঠার

প্রথম কলামে মেরীর ছবিসহ খবর এসেছে যে, এই মেয়েটিকে মুজাহিদরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে এবং গির্জার চরম ক্ষতি সাধন করেছে। মেয়েটিকে সহ দলটিকে ধরিয়ে দিতে পারলে তিন লক্ষ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।

সন্ধান প্রার্থী
কমরেড ফাদার যোহন
উস্তুবার গির্জা

আমরা পত্রিকা নিয়ে টানাটানির সময় ও ঘর থেকে মেরী কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে আমাদের রুমে এসে সামনের চেয়ারে বসে বলল, "কিসের খবর ভাইয়া? আমি বললাম, তোমার বুজুর্গ পিতার দেয়া ঘোষণা। এই বলে পত্রিকাটি তার সামনে তুলে ধরলাম। সে তা পাঠ করে বলল, "খোবায়েব ভাইয়া! দেখুন আমার লম্পট পিতাজি কত ধূর্ত লোক। নিজ হাতে নিজের কন্যাকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে অপহরণের অভিযোগ এনে আপনাদেরকে ফাঁসাতে চায়। খৃস্টানরা আসলেই জন্মগতভাবে মুসলমানদের শত্রু এবং দাগাবাজ। কেমন মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে।"

আমি বললাম, এ সংবাদটি আমাদের জন্য অত্যন্ত জটিল। যা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না।"

উছায়েদ বলল, "হ্যাঁ, অবশ্যই জটিল।"

আমার কথা শুনে মেরীর ফুটন্ত কুসুমের উজ্জ্বল হাসিমাখা চেহারাটি মলিন হয়ে গেল। যেন কৃষ্ণপক্ষের যামিনী। সুরমা ধুয়ে কালো অশ্রুগুলো জরদ বর্ণের কোমল গাল বেয়ে নিচে ঝরতে লাগল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে জিজ্ঞাসা করল, "সংবাদটি আমাদের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর ভাইয়া?"

আমি বললাম, এটা আমাদের জন্য এতই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে যা জীবন নিয়ে টান দেবে। এখন যদি তোমাকে নিয়ে রাস্তায় বের হই, তাহলেই তুমি মানুষের চোখে পড়বে। তারা আমাদেরকে তিন লক্ষ ডলারের লোভে ধরিয়ে দেবে। আর একটি কারণ তো তুমি নিজেই বলেছ, বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের বদনাম ছড়াচ্ছে।"

মেরী বলল, "ভাইজান! এজন্য আপনি মোটেও ভয় করবেন না। আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করলে পিতাজির নিকট যাব এবং বলব, আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমি তওবা করেছি। আমাকে আবার কলমা পড়িয়ে খৃস্টান বানিয়ে নিন। পিতাজি অবশ্যই আমার কথা বিশ্বাস করবে। এভাবে ক'দিন সেখানে অবস্থান করে ধড়টা

গির্জায় ফেলে রেখে মুণ্ডুটি নিয়ে রাতের আঁধারে চলে আসব। বাদী না থাকলে কার পুরস্কার কে দেবে? তারপর আস্তে আস্তে সবই শিথিল হয়ে যাবে।".

তার কথা শুনে আমি বললাম, সাবাস! বড় হিম্মতওয়ালী মেয়ে তুমি। তবে শুনে নাও ইসলামের বাণী, "পিতা যদি কাফের আর জালেম হয় এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়, আর সন্তান যদি মুসলমান হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে থাকে তবু পিতাকে লক্ষ্য করে তীর, গুলি ও বর্শা নিক্ষেপ করতে পারবে না। ছেলের জন্য তা জায়েয নেই। তবে এমন যদি হয় অন্যদিকে গুলি ছুড়েছে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পিতা মারা গেছে তবে গোনাহ হবে না।"

মেরী আশ্চর্য হয়ে বলল, "আহাঃ ইসলাম এত সুন্দর ধর্ম! তাহলে আমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।"

অতঃপর আমি বললাম, প্রিয় মেরী! মহান রাব্বুল আলামীনের খাস অনুগ্রহে তুমি সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং তারই খাস দয়াগুণে জালেমদের কিল্লা থেকে মুক্তি পেয়েছ। আশা করি বাকি সময় আল্লাহ্ই হেফাজত করবেন। আপাতত তুমি এখানে অবস্থান করে ঔষধ প্রয়োগ করতে থাক এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হও। আমরা আমাদের অন্যান্য সাথীদের খোঁজ নিতে আগামীকাল চলে যাব। ফিরে আসতে হয়ত কিছুদিন বিলম্ব হবে। তুমি অধৈর্য হয়ো না। তোমার সার্বিক সুখ-শান্তির চিন্তা আমি করব। এখন যাও বিশ্রাম কর গে। আমরাও একটু বিশ্রাম করে নেই। এই বলে শয্যা গ্রহণ করলাম।

॥ চব্বিশ ॥

রাত্রে খানাপিনা সেরে উছায়েদ ও দস্তগীরকে নিয়ে পরামর্শ করছিলাম। এর মধ্যে মেরী গমেজ এসে একটি চেয়ার দখল করে বসল। সত্য কথা বলতে কি, মনে হচ্ছিল পুরো রুমটিই যেন আলোকিত হয়ে গেল। মেরী চেয়ারে বসেই বলতে লাগল, "খোবায়েব ভাইয়া! আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি। নামটি তো এখনো খৃস্টান মার্কা রয়ে গেল। এর কি পরিবর্তন করা দরকার না?"

"সত্যিই তো, এটা তো আমার মনেই ছিল না। আচ্ছা বলতো, কোন নামটা তোমার পছন্দ হয়?"

"আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের নাম খোবায়েব। মনের মত নাম, সুন্দর নাম, মজাদার নাম। এ নামটা আমার সাথে বদল করবেন কি?"

"রোগে মরলেও শয়তানি ছাড়িস না।"

"শয়তানি কি? আপনার নামটা আমার কাছে যেমন মধুময়, আমার নামটিও এমন রাখবেন, যা আপনার কাছে অ...নে...ক ভালো লাগে।"

"তোমাকেই তো আমার কাছে ভালো লাগে। নাম দিয়ে ভালোর দরকার কি?"

"আপনিও তো দেখি আমাকে সেটাই বলছেন, যা আমি বলেছিলাম।"

"শোন, তোমার কাছে যে নামটি ভাল লাগে তা বল, আমরা বিবেচনা করে দেখব।"

"আপনি আমার জন্য যে নামটি পছন্দ করেন সেটাই আমার পছন্দ।"

"একটি নাম আমার কাছে খুবই পছন্দের ছিল। সে নামটি তোমাকে দেয়া যাবে না।"

"কেন ভাইয়া! আমি কি অন্যায় করেছি?"

"তুমি কোন অন্যায় করনি বোন, যে নামটির কথা বলছি সে নামটি আর দুনিয়াতে বেঁচে নেই। এতটুকু বলার সাথে সাথে আমার চোখ দু'টি অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল। কিন্তু চেষ্টা করেও মেরীর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে পারলাম না।"

তৎক্ষণাৎ মেরী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করল, "খোবায়েব ভাই! যে নামটি আপনার চোখে অশ্রু ঝরাচ্ছে সে নিশ্চয় আপনার জীবনের বিশেষ অধ্যায়ে জড়িয়ে রয়েছে। হয়ত বা খানিকটা বেদনা, খানিকটা ভালবাসা, খানিকটা বিরহ, খানিকটা যাতনা। তা হয়ত আজীবন ইতিহাস হয়েই বেঁচে থাকবে। অতএব সে নামটিই শুনতে চাই। বলবেন ভাইয়া?"

তার পীড়াপীড়ি সইতে না পেরে আমার শুষ্ক কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল "ছায়েমা।"

মেরী খুশীতে লাফিয়ে উঠে বলল, "এখন থেকে আমার নাম রাখা হল ছায়েমা। বাহ! কত সুন্দর নাম, কত মজাদার নাম। (দস্তগীর ও উছায়েদের দিকে তাকিয়ে) বল না ভাইয়া! তোমরাও বল, নামটি সুন্দর নয়?"

উছায়েদ বলল, "নামটি আসলেই সুন্দর! কিন্তু...।"

মেরী বলল, "কিন্তু আবার কি? আর কোন কিন্তু নেই, আমার নাম ছায়েমা। এখন থেকে ছায়েমা বলে ডাকবে। তা না হয় কিন্তু...।"

অতঃপর উছায়েদ পূর্বাপর ছায়েমার সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। মেরীর দু'চোখে নেমে এল বাঁধনহীন অশ্রুধারা। প্লাবিত হতে লাগল গণ্ডদেশ থেকে বক্ষদেশ পর্যন্ত। সে করুণ আর হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারেনি।

তারপর মেরী আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "আপনার সে ছায়েমাকে যেমনটি পেয়েছিলেন, তেমনটি হয়ত আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। তবু তার স্থান পূরণ করতে চেষ্টা করব। আশা করি ব্যতিক্রম হবে না।"

আমি আমার চোখ দুটি মুছে নিয়ে বললাম, "মেরী! শোন আমার দু'টি কথা।"

এতটুকু বলতে না বলতে সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে চোখদু'টি কপালে তুলে বলল, "এখনো আমাকে মেরী বলে ডাকছেন? আমি কিন্তু মুসলেমা, মোমেনা, মেরী বলে ডাকলে কোনদিন সাড়া পাবেন না। এখনই জানিয়ে দিচ্ছি।"

তার কথা শুনে আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম এবং বললাম যাও এখন থেকে তোমার নাম খাদিজা।

"না ভাইজান! অনুরোধ করছি আমার নাম ছায়েমা।"

দস্তগীর আর উছায়েদ বলে উঠল, "আচ্ছা যাও এখন থেকে তোমার নাম ছায়েমা, আমরা তাই ডাকব।"

ওদের কথা শুনে আনন্দে তার মন ভরে উঠল।

তারপর বললাম, "শোন ছায়েমা! তুমি যা ভাবছ আর যে ভাব প্রকাশ করছ তা কিন্তু আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে আমি করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি। কারণ তোমার মত একজন পরমা সুন্দরীর জীবন নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলতে চাই না। তোমার জীবনের দাম অনেক বেশী। জীবনে যে ভুল করেছি সে ভুলের মাশুল এখনো দেয়া শেষ হয়নি।"

আমি এতটুকু বলতে না বলতেই আমার মুখ থেকে কথাটি টেনে নিয়ে সে বলতে লাগল, "ভাইজান! আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি আমাকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। শত্রুর হাত থেকে ও সুনিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ার হতে জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করেছেন। আপনি আমার ভাই। চিরদিন ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে যাব। ভাইয়ের পায়ের কাছে থাকব। ভাইয়ের খেদমত করে জান্নাতী হব। ভাই যা করে আমিও তা করব। এমন কি এক সাথে মরব।"

ওর কথা শুনে আমি বললাম। আরে পাগলিনী। তুমি এখন মুসলমান। এখন তোমাকে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। তুমি পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তা মেয়ে। যৌবন জোয়ার দেহের কানায় কানায় ভরপুর। সর্বাঙ্গে এখন যৌবনের ঢেউ খেলছে। পর্দা শরীয়তের এক ফরয বিধান। পর্দা করা নারী পুরুষ সকলের উপরই ফরয। অতএব, এখন থেকেই তোমাকে আমাকে পর্দা মেনে চলতে হবে। না হয় গোনায়ে কবিরা হবে।"

"ভাই বোনের মধ্যে আবার পর্দা কিসের?"

"মেরী, স্যরি ছায়েমা! মায়ের উদরের বোন আর দুধ বোন ছাড়া যত বোন আছে সবাইকে বিয়ে করা যায়। তাই তাদের সামনে যাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। তুমি এ দুটোর কোন একটিও নও। কাজেই তোমার সাথে দেখা সাক্ষাত করা এমন কি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলাও হারাম। এখন যে কথা বলছি তাও ঠিক

নয়। তবে তুমি হলে অসুস্থ। আবার অসহায় নওমুসলিম। তাই কথা বলছি, তা না হয় বলতাম না।"

"খোবায়েব ভাই! আমি শরীয়ত শিখিনি ও বুঝিনি। কথা আমার একটাই। যেভাবে আপনার কাছে আসতে পারি, থাকতে পারি, খেদমত করতে পারি সে ব্যবস্থাই করুন। আমি অন্যকিছু বুঝি না।"

"তোমার কথা ঠিক রাখতে হলে বিয়ে করা ছাড়া কোন পথ নেই। আর আমি অবশ্যই বিয়ে করব না। কারণ আমি একজন মুজাহিদ। আমি থাকব পাহাড়ে, জঙ্গলে। থাকব রণাঙ্গনে। যে কোন সময় শহীদ হয়ে যেতে পারি। আবার দুশমনের জেলখানায়ও বন্দী হয়ে যেতে পারি। আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছি। কাজেই তোমাকে বিয়ে করে কোন খোঁজ নিতে পারব না। এটাও গোনাহ থেকে মওকুফ নয়।"

"তাহলে মৃত্যুই তো আমার নিকট শ্রেয় ছিল। কেন আমাকে ছিনিয়ে আনলেন? এর জন্য দায়ী কে?"

"আরে পাগলী! আগেই তো বলেছি, তোমার জীবন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। যেভাবে তোমার সুখ-শান্তি হয় আমরা তাই করব।"

"সেটা কিভাবে?"

"আমি নিয়ত করেছি তোমাকে কোন একজন আলেমের নিকট বিয়ে দিয়ে দেব। সেখানে তুমি পরম সুখে বসবাস করবে। বুঝলে সুন্দরী?"

"আহাঃ তোমার নিকট থেকে এমন কথা শুনতে মোটেও প্রস্তুত নই আমি। আমি চাচ্ছি, আমার বাকি জীবন তোমারই সাথে, তোমারই পথে এবং তোমারই মতে কাটিয়ে দেব। অর্থাৎ তোমার সাথে থেকে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করব। এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করলে ভুল হবে। আমি বিয়ের পাগল নই। চিরকুমারী হিসাবে জীবন কাটিয়ে দেব। যেমনটি করেছিলেন আমারই অগ্রজ "হযরত হাফেজা ছায়েমা মলাকানী।"

"আমার কথায় দ্বিমত করো না ছায়েমা। এতে তোমার বেশ ক্ষতি হবে এবং আমার চিন্তা-চেতনায় ব্যাঘাত হবে। ফলে দ্বীনের বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে যাবে।"

উছায়েদ বলল, "তা অবশ্য ঠিক। দ্বীনের চরম ক্ষতি হবে যা ভাষায় প্রকাশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা বর্তমানে যে অবস্থানে আছি তা খুবই ভয়াবহ। হযরত আনোয়ার পাশা শহীদ (রহ.)-এর শাহাদাতের পর মুজাহিদদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে। এদিকে তারই সহযোদ্ধা ও কমান্ডার কাফেরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে, মুজাহিদদের সাথে চরম মুনাফেকি করেছে এবং মুজাহিদদের

অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। দলে দলে মুজাহিদদেরকে শহীদ করে দিচ্ছে। যদিও শতকরা মুজাহিদ শহীদ হচ্ছেন ১৭ জন আর বলসেবিকরা মরছে ৮৩ জন। সার্বিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এতে মুজাহিদদের ক্ষতি হচ্ছে বেশি। কারণ বলসেবিকরা যত মারা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশী লোক সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দিচ্ছে। আর আমাদের যারা শহীদ হচ্ছেন, সে স্থান আর পূরণ করতে পারছি না। এ হিসাবে আমাদেরই ক্ষতি হচ্ছে বেশী। প্রতিনিয়ত আযরাঈল (আ.) আমাদের ধাওয়া করে ফিরছে। কার কখন কি ঘটে যায় তা বলা মুশকিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলেমদের কেউ কেউ ইমামতিটাকেই পূর্ণ দ্বীন মনে করে ইমামতিকেই আঁকড়ে ধরেছেন। কেউ কেউ মাদ্রাসার তালিমকেই সর্বোচ্চ দ্বীন মনে করে শুধু তালিমের কাজই করে যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ তাবলীগকেই একমাত্র দ্বীন বলে বেড়াচ্ছেন। আবার কেউ কেউ খানকা নিয়ে বসে গেছেন। অতি দুঃখজনক আর পরিতাপের বিষয় এটাই যে, আল্লাহ্‌র দেয়া ফরজ বিধান 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' এ ফরজটি আদায় করার লোকের অভাব। বরং যারা জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয দায়িত্ব আদায় করছেন, এদের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর নামধারী আলেম, মুফতি নামের কলঙ্ক এবং বলসেবিকদের পা-চাটা গোলাম, এরা ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই এ জাতির অধঃপতন খুব শীঘ্রই নেমে আসবে। আসলে সর্বস্তরের উলামায়ে কেরামগণের ঈমানী দায়িত্ব ছিল সবাই সবাইকে হক মনে করে সাহায্য করা। অন্যের কাজটাকে আমার কাজ মনে করা। যেমন আমি তালিমের কাজ করে যাচ্ছি। আর এক ভাই তাবলীগ ও অন্য ভাই জিহাদ করে যাচ্ছেন। এখানে নিজেকে এই বলে অপরাধী মনে করবে যে, হায়! তাবলীগ ও জিহাদ তো আমার উপরও ফরয ছিল। তালিমের কাজের কারণে আমি তো সে ফরয আদায় করতে পারছি না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমিও যেন সে কাজ করতে পারি সে তাওফিক আমাকে দান কর। এভাবে যদি নিজেকে নিজে অপরাধী মনে করতেন আর অন্যকে ভালবাসতেন ও দোয়া করতেন, তাহলে এতটা অধঃপতন হত না।"

উছায়েদের দীর্ঘ ও মৌলিক আলোচনা শুনে বললাম, "তুমি তো প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলে। যা নিয়ে কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে কিছু বল কি করব?"

ছায়েমা বলল, "মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে আলেমদের মধ্যেও এ ধরনের মুনাফেক আছে তা আগে জানা ছিল না। এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হল, যে সব আলেম বলসেবিকদের দোসর, তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করা দরকার। এ কাজটি করে যদি আমরা বলসেবিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, তাহলে অচিরেই মুসলমানদের বিজয় আসবে।"

"ছায়েমা! তোমাকে তো আজকে একজন ফিল্ডমার্শাল হিসাবে কমান্ড দিতে দেখছি। ধন্যবাদ তোমাকে। এখন বল আমি যা বলেছি তাতে তুমি একমত হবে কি-না? তা পরিষ্কার বলে দাও।"

"আমি আপনার সব কথা মেনে নেয়ার চেষ্টা করব। তবে আপনাকে ছাড়া কাউকে চিন্তা করি না। যদি বিয়েরই প্রশ্ন আসে তবে আপনাকেই...।"

সবাই ওর কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমি বললাম, "এসব বাজে কথা ও বাজে চিন্তা পরিহার কর। আমার নাগাল কিন্তু পাবে না। তোমার সম্পর্ক দস্তগীরের সাথে করে যাব। দস্তগীর একজন সরল সোজা আলেমে দ্বীন। তুমি তার কাছে দ্বীন শিখতে পারবে। আশা করি এতে তুমি অমত থাকবে না।"

আমার কথা শুনে ছায়েমা (মেরী) অবোধ বালিকার ন্যায় কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল, "আমি আমার মন দিল তোমাকেই দিয়েছি। এখানে অন্য কারো দখল নেই। দ্বীনের কারণে যত ধরনের কষ্টই হোক না কেন আমি তা মাথা পেতে মেনে নেব। আমার সংসারে আশ্রয় দেয়ার মত কেউ নেই। যদি তোমার কাছে আশ্রয় নাই পাই...।"

তার কাকুতি-মিনতি শুনে উছায়েদ ও দস্তগীর বলল, "খোবায়েব ভাই! আপনি তার কথা মেনে নিন। আল্লাহ্ আপনাদের হেফাজত করবেন। দুঃখিনীর হৃদয়ে আর কষ্ট দিবেন না।"

দস্তগীর বলল, "তোমরা আমার এখানেই থাকবে কোন চিন্তার কারণ নেই।"

তাদের কথায় ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমি রাজী হলাম। তারপর উছায়েদকে নিয়ে দুটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ওয়ায়েভের খোঁজে পাহাড়ের দিকে চলে গেলাম।

॥ পঁচিশ ॥

আমরা উজিরাবাদ শহর অতিক্রম করে সোজা উত্তর দিকে অর্থাৎ কুকান্দুজের অরণ্য পথ ধরে অশ্ব হাঁকাচ্ছি। আনুমানিক বেলা তিনটার দিকে অরণ্যে প্রবেশ করলাম। বেশ কিছু বন জঙ্গল ঘুরেও আমাদের ঘাঁটির সন্ধান পেলাম না। উছায়েদ বলল, "মনে হয় আমরা অনেক পশ্চিমের দিকে সরে এসেছি।" আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, কথাটা একেবারে অমূলক নয়। অতঃপর পূর্বদিকে ঘোটক ছুটালাম। কিছুক্ষণ পর ছোট ছোট পাহাড় আর টেক-টিলাগুলো পরিচিত পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। আরো একটু অগ্রসর হয়ে

দেখি, এটা তো সেই টিলা, যেখানে বসে আমরা বিশ্রাম নিয়েছিলাম এবং আহার করেছিলাম। আমাদের পদচারণার কিছু আলামত এখনো বহন করছে। নীরব ভাষায় সে যেন ডেকে বলছে, হে পথিক! বিশ্রাম নিয়ে যাও। সেদিনের মত এবারও আমরা এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে এবং সাথে আনা আহার্যগুলো খেয়ে ঝর্ণার পানি পান করে এগিয়ে চললাম।

উছায়েদ বলল, "খোবায়েব ভাই! আমাদের চলতে হবে খুব সতর্ক অবস্থায়। কারণ আমরা যখন তাদেরকে রেখে যাই, তখন গিয়েছিলাম পদব্রজে। এখন ফিরছি অশ্ব নিয়ে। এমতাবস্থায় ওরা আমাদেরকে দুশমন মনে করে গুলিও ছুড়তে পারে। এতে বিচিত্রতার কিছুই নেই। পথ চলুন সাবধানে।" উছায়েদের কথা বিলকুল সত্য। তাই সতর্ক অবস্থায় চলছি ঝর্ণার কুল ঘেঁষে।

আমরা যখন আমাদের নির্বাচিত স্থানে অর্থাৎ ক্যাম্পে পৌছলাম তখনই দেখতে পেলাম অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। তীব্র শীতের কারণে লাশগুলোতে এখনো পঁচন ধরেনি। আমি চিৎকার দিয়ে বললাম, উছায়েদ! সর্বনাশ হয়ে গেছে, সব ধ্বংস হয়েছে গেছে। কেউ হয়ত জীবিত নেই। দেখ শুধু লাশ আর লাশ। উছায়েদ ঘুরে ঘুরে হিসাব করে দেখল দুশমন পক্ষের লাশের সংখ্যা ৪৩ জন আর মুজাহিদদের লাশের সংখ্যা সাতজন। তাছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অনেকগুলো অস্ত্র। কোন একটি অস্ত্রও কেউ ছুঁয়ে দেখেনি।

আমি উছায়েদকে ডেকে বললাম, "ভাই! অবস্থাতো খুবই সঙ্গীন বলে মনে হচ্ছে। আমাদের দশজন সাথী থেকে মাত্র সাতজনের লাশ সনাক্ত করতে পেরেছি। বাকি তিনজনের লাশ কই?"

উছায়েদ বলল, "চলুন আশপাশে তালাশ করে দেখি।" আমরা বেশ কিছুক্ষণ তালাশ করেও কোন হদিস পাইনি। অতঃপর গুহায় তালাশ করলাম। সেখানে আমাদের অনেক ছামানাকে স্বজন হারার ব্যথায় নীরব ভাষায় রোদন করতে দেখলাম।

এ দৃশ্য দেখে আমাদের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। চিন্তা ও পেরেশানীতে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। ব্যথা যেন উছলে উঠছে। বেদনার ভারে বক্ষ-পিঞ্জর বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। কারণ শহীদ হয়ে যাওয়া তো খুবই সৌভাগ্যের কারণ ছিল। যদি বেঁচে গিয়ে থাকে তবু আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে তাহলে তো ঈমানের উপর খটকা। কারণ দুশমনরা মুজাহিদদের যে ধরনের জুলুম অত্যাচার করে, তাতে ঈমান টিকিয়ে রাখা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না। যদি তারা বন্দীই হয়ে থাকে তাহলে ওদের উদ্ধার করা আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। এতে অবহেলা করা মোটেই জায়েয নয়।

আমি উছায়েদকে নিয়ে পরামর্শ করলাম, ওরা বন্দী হয়ে থাকলে কি করে মুক্ত করা যায়। উছায়েদ বলল, "খোবায়েব ভাই! তা তো করতেই হবে, এর আগে আমাদের উপর জরুরী হল শহীদদের লাশগুলোর হেফাজত করা। দুশমনের লাশগুলো হয়ত পশুরা খেয়ে ফেলবে না হয় পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। কিন্তু মুজাহিদদের লাশ তো এমনটি হবে না। কারণ তিনমাস পর আমি আমার সাথীর লাশ দাফন করেছি। সে লাশ পঁচেও নি, গলেও নি। হাম্লার পর আমরা দুশমনের এলাকা থেকে লাশ উদ্ধার করতে পারিনি। বাধ্য হয়েই পিছু হটতে হয়েছিল। শুনেছি তিনজন দুশমন মুজাহিদের লাশ দেখে ভয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। তারপর ওরা উক্ত ছাউনী ছেড়ে চলে যায়। আমরা তিন মাস পর উক্ত স্থান দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার লাশ দেখতে পেয়ে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করি। আমার এক সাথী লাশ দাফনের পর বলতেছিল, "উছায়েদ ভাই! আজ থেকে প্রায় দু'মাস আগে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, সাবাসগুল আমাকে ডেকে বলছিল, "হে আমার রণাঙ্গনের সাথী আলাউদ্দীন! তোমরা আমাকে ফেলে চলে গেলে, আমি এখনো শুয়ে আছি খোলা আকাশের নিচে উরছাদ ময়দানের এক পার্শ্বে। তোমরা এসে আমাকে দেখে যাও এবং বাড়ীতে পৌছে দাও।" শহীদ সাবাসগুল উরছাদ ময়দানে শহীদ হওয়ার দু'মাস পর মুজাহিদ আলাউদ্দিন এক শুভ রজনীতে এ মোবারক স্বপ্নটি দেখেছিল। কিন্তু তা কারো কাছে প্রকাশ করেনি। দাফন করার পর এ স্বপ্নটি বলেছিল। তখন আমরা আফসোস করে বলেছিলাম আহা! আগে যদি জানতাম তাহলে আগেই দাফন করে দিতাম। তাই আজকেও আমাদের কর্তব্য স্বপ্ন দেখার আগেই লাশের হেফাজত করা।"

উছায়েদের কথা শুনে বললাম, অবশ্যই লাশের হেফাজত করব। কবর খনন করে সাতটি লাশ দাফন করা দু'জনের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া কোদাল, শাবল কিছুই নেই, তার ওপর পাথুরে মাটি। সবদিক দিয়েই মুশকিল।"

উছায়েদ আমার পেরেশানী দেখে বলল, "ভাইজান! অত চিন্তা করে লাভ নেই। চলুন আমরা একটি ছোট খাটো গুহা তালাশ করি। যদি পাই তাহলে সবগুলো লাশ এক সাথে সাজিয়ে রেখে গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে দেই।"

"উছায়েদের পরামর্শে গুহা তালাশ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ তালাশ করার পর আল্লাহ্‌র খাছ রহমতে অদূরেই সুন্দর একটি গুহা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম। আমরা দু'জনে লাশগুলো ধরাধরি করে গুহার অভ্যন্তরে নিয়ে সাজিয়ে রাখলাম। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কুদরতের শেষ নেই। লাশগুলো ধরার পরই এত হালকা অনুভব করলাম যে, একটি ছোট বাচ্চার লাশের মত ওজন। বিনা ক্লেশেই লাশগুলো গুহায় রেখে পাথর কুড়িয়ে এনে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলাম।

অতঃপর আখেরী মোনাজাত করে, চোখের পানি নজরানা দিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করলাম।

এবার আমরা ওয়ায়েভ, ইবনে রবি ও হাম্মাদ বেগের সন্ধান কিভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ করলাম।

উছায়েদ বলল, "খোবায়েব ভাই! আমার পরামর্শ হল দু'জন পৃথকভাবে তালাশ করা। একজন বনাঞ্চলে আর অপরজন দুশমনের ছাউনীগুলোতে। এতে ফায়দা হবে দুইটি। দু'দিকে একই সাথে খোঁজা হল। দ্বিতীয় ফায়দা হল, খোদা না করুন, যদি গ্রেপ্তার হই তাহলে একজন গ্রেপ্তার হলাম। দু'জন একসাথে বন্দী হলে জিহাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।" আমি অনেক ভেবে চিন্তে তার পরামর্শই গ্রহণ করলাম।

কে কোনদিকে খুঁজব সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে উছায়েদ বলল, "সেনা ছাউনীগুলোতে তালাশ করা মোটেই নিরাপদ নয়, খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আর এটা আপনার জন্য আরো বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আমি সেনা ছাউনীগুলোতে তালাশ করি আর আপনি গভীর অরণ্য তন্ন তন্ন করে খোঁজ করুন। আমাদের মিলন স্থান হবে দস্তগীরের বাড়ী। আমরা তিন দিন পর পর দস্তগীরের বাড়িতে গিয়ে দেখা সাক্ষাত করব এবং খবরাখবর জেনে নেব।"

অতঃপর আমি বললাম, "তোমার কথায় আমি একমত, কিন্তু একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। তাহল আমরা যেন কোনক্রমেই দিনের বেলা এবং রাতের প্রথম প্রহরে দস্তগীরের বাড়ীতে না যাই। এতে বিপদের আশংকা রয়েছে। কারণ দস্তগীরের বাড়িতে বেশী আনাগোনা করলে মানুষ সন্দেহ করবে। এতে যে কোন সময় বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষ যদি কোন ছুরতে আমাদের আসল পরিচয় জানতে পারে তাহলে দস্তগীরের বিপদের সীমা থাকবে না এবং ছায়েমার (মেরী) ব্যাপারটাও ফাঁস হয়ে যাবে। কাজেই আমাদেরকে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বুঝলে, আমি কি বলছি?"

"জ্বি ভাইজান।"

"তাহলে বল তুমি কিভাবে কোন ছুরতে কাজ করবে?"

"আমি প্রথমে চলে যাব দস্তগীরের বাড়ী। সেখানে গিয়ে ঘোড়াটি রেখে একদম সাধারণ বেশে মজদুর সেজে মানুষের বাড়ীতে ক্ষেতে-খামারে বা বাগানে কাজ করব। এভাবে আশা করি একটা সুরাহা করা যাবে।"

"সন্ধান পেলে, উদ্ধার...?"

"হ্যাঁ, আল্লাহ্ যদি সন্ধান দিয়ে দেন তাহলে দু'জনে পরামর্শ করে যেটা সাব্যস্ত হয় সেভাবেই কাজ করব।"

"ধন্যবাদ! তবে সেনাছাউনী ছাড়াও উস্তুবারের গির্জাগুলোতে খোঁজ নিতে হবে।"

"আলবৎ, আলবৎ।"

"অস্ত্র-শস্ত্র কি সাথে নিয়ে যাবে?"

"বউ ছাড়া যায়, অস্ত্র ছাড়া যায় না। অস্ত্রে জীবন রক্ষা তখনই করে যখন সাথে থাকে। দূর থেকে সে আমার কি সাহায্য করবে?"

"তোমার যুক্তি তো ঠিক, তবে রাখবে কিভাবে?"

"সেটা কাজের উপর নির্ভর করবে। কিছু কাজ এমন আছে যা করার সময় অস্ত্র সাথে রাখা যাবে না। তখন তা লুকিয়ে রাখব। আর কিছু কাজ এমন আছে যা অস্ত্র সাথে নিয়েও অনায়াসে করা যাবে। কোন অসুবিধা হবে না।"

"শীত হিসাবে কোট ও কম্বল সব সময় গায়ে রাখার চেষ্টা করবে। তাহলে অস্ত্র রাখায় সাহায্য করবে।"

"তা তো অবশ্যই!"

"এখন তুমি যেতে পার। আল্লাহ্ তোমার হেফাজত করুন।"

এবার উছায়েদ আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

আহতদের গগনবিদারী চিৎকার, নিহতদের শোণিত স্খলনের গড়-গড় শব্দ আর বারুদের গন্ধে নাসারন্ধ্রের সংকোচন, এসব মিলিয়ে এক প্রলয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। গোলাগুলির আওয়াজে বন্য হায়েনারা হুমড়ি খেয়ে যার মুখ যেদিকে ছিল, সেদিকেই প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। এর আগে বনের হিংস্র প্রাণীরা ঝর্ণা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করে মুজাহিদদের আস্তানার পাশ দিয়ে হেলে দুলে হেঁটে যেত। অনেকবারই অনেকের সামনে পড়েছে, এমন কি চোখে-চোখে চোখ পড়েছে, কিন্তু আক্রমণ করেনি। অনেক সময় পাহারাদার সাথীরা এসে বলত, "আমি যেখানে পাহারাদারি করছিলাম, সেখানে বৃহদাকারের একটি ব্যাঘ্র শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে সে লেজ গুটিয়ে একজন ভদ্রলোকের মত আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে তার বিশ্রাম পরিহার করে, আমাদের পাহারা দিতে সাহায্য করেছে। আজ সেসব প্রাণীরাও ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গেছে কোন সুদূরে। একে একে সাতজন সাথীর শাহাদাতে ওয়ায়েভ খুব ভেঙ্গে পড়েছে।

বিপদে আল্লাহ্কে স্মরণ করা আর ধৈর্যধারণ করা প্রকৃত মোমেনের ছিফাৎ। আর ওয়ায়েভের মধ্যে এ ছিফাৎ অনেক পূর্ব থেকেই ছিল। সে তার দু'জন সাথী ও সামান্য রসদ পত্র নিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করে চলে গেল আরো গভীরে। এ

স্থানটা ছিল হিংস্র হায়েনাদের অভয়ারণ্য। এখানে সাধারণ প্রাণীরা হিংস্র প্রাণীদের ভয়ে আসতে পারত না। আসলে আর রক্ষা পেত না।

ওয়ায়েভ তার সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আজকের যুদ্ধে আমাদের চেয়ে দুশমনের ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশী। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওরা পাগলা কুকুরের মত মরিয়া হয়ে লাগবে। লোকালয়ে বা পার্শ্ববর্তী এলাকা এখন আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। দুশমনের চেয়ে শতগুণ বেশী ভয় হল মুনাফেকদের। ওরা তো নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে, হজ্জও করে আবার যাকাতও দেয়। আবার সুযোগ বুঝে বলসেবিকদের গোয়েন্দাগিরীও করে। ওয়ায়েভ দুঃখ ভরা মন নিয়ে সাথীদেরকে বলল—

"প্রিয় সাথী ও বন্ধুরা! আল্লাহ্ তায়ালা অত্যাচারী ও জালেম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানদেরকে হুকুম দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে তালাশ করলে দেখা যায় ৬৮২ জায়গায় জিহাদের আলোচনা আসছে আর জিহাদ করার হুকুম এসেছে ১০৬ জায়গায়। তার মধ্যে ১০৫ জায়গায় হুকুম দিয়েছেন সবাই মিলে জিহাদ করার জন্য। অর্থাৎ জিহাদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবাদত যা সবাই মিলে করতে হয়। আলেম, পীর, বুযুর্গ, ধনী, গরীব, চিকন, মোটা, সুন্দর, কালো, গোলাম, মনিব, ছেলে, মেয়ে, নারী, পুরুষসহ শিশুদেরকেও জিহাদ করতে হবে। এ হুকুম হল যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়।

(আল্লামা ইবনে তাইমিয়া)

প্রিয় বন্ধুরা! আমরা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করছি। পবিত্র কুরআনের ৬৮২ আয়াতের উপর আমল করছি। আর যেসব নামধারী আলেম ও মুফতীরা ফ্যানের নিচে বসে বসে ৬৮২ আয়াতের বিরুদ্ধে অর্থাৎ জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করছে সেসব আলেমদের নিকট আমার প্রশ্ন হল, কেউ যদি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের বিরোধিতা করে তাহলে তাদেরকে তোমরা কাফের ফতোয়া দিয়ে থাক। এখন তোমরা ৬৮২ আয়াতের বিরোধিতা করছ, তোমাদের উপর কি ফতোয়া আসবে?

আমরা তো পারতাম জিহাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে তোমাদের মত মসজিদে ইমামতি করতে, পারতাম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা বা মোহতামিমি করতে, খানকা দখল করে পীরালীর বাজার জমজমাট করতে। পারতাম মিলাদ, দাওয়াত, খতম, কবর জিয়ারত, কুরআনখানী, কুলখানী, ত্রিশা, চল্লিশা ইত্যাদি হারাম কাজগুলো করে পেট আর পকেট গরম করতে। আমরাও তোমাদের মত জিহাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে তোমাদের পথে চললে দ্বীন মিটে যাবে। মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জতের হেফাজত হবে না। আর তোমরাও টুপি, দাড়ির সাইন বোর্ড লাগিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

প্রিয় বন্ধুরা! জিহাদ করা না করার ফতোয়া মহান রাব্বুল আলামীন নিজেই দিয়েছেন। জিহাদ না করলে কি শাস্তি দিবেন তাও বলে দিয়েছেন। এসব চাম্‌চিকা মার্কা আলেমদের ফতোয়ায় কিছু যায় আসে না।

প্রিয় বন্ধুরা! কেন আজ আমরা পাহাড়ে, জঙ্গলে না খেয়ে থাকছি আর মশার কামড় খাচ্ছি? আমাদের কি ছিল না কোন বাড়ি ঘর? ছিল না সন্তান-সন্ততি আর আদরের স্ত্রী? ওদেরকে রেখে কেন আজ আমরা বন-বাঁদারে ঘুরছি? এসব প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব—ইলায়ে কালিমাতুল্লার জন্য। যদি এর চেয়ে আরো কঠিন বিপদ আসে তাহলে কি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিবে? দু'জন সঙ্গী হস্তদ্বয় নেড়ে জবাব দিল, না-না, কক্ষনো না। আমরা শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব। কোন জালেমের জুলুমের কারণে বা কোন ন্যায়পরায়ণ বাদশার অনুগ্রহে অথবা কোন চামচিকা মার্কা মুফ্‌তির ফতোয়ায় আমরা জিহাদ থেকে সরে দাঁড়াব না। হে আমাদের নেতা! আপনি যা হুকুম দিবেন আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কোনদিন তার ব্যতিক্রম দেখবেন না।" ওয়ায়েভ এসব আলোচনা করে সাথীদের দিলে হিম্মত দান করল এবং আবার অঙ্গীকার নিল। তারপর তিনজন সেখানেই অবস্থান করতে লাগল। এ দীর্ঘদিন তারা কিভাবে রইল এবং কি কি ধরনের খোদায়ী নুসরত পেল তার বর্ণনা ওয়ায়েভের যবান থেকে শুনুন ও কল্পনা করুন।

আমরা একাধারে পাঁচদিন পর্যন্ত হিংস্র হায়েনাদার এলাকায় অবস্থান করছিলাম। পাহাড়ি অরণ্য হলেও কোন গুহার সন্ধান পাইনি। তাই ছোট্ট একটি তাঁবু রচনা করে কোনমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিলাম। রাতের তিন প্রহরে তিনজন পাহারাদারি ভাগ করে নিলাম। রাত দিন ২৪ ঘন্টাই মাটি ছোঁয়া মোটা কোট আর কম্বল জড়িয়ে রাখতে হয়। কারণ প্রচণ্ড শীতে রক্ত জমাট হয়ে যায়। ভোরে দেখা যায় বরফের আস্তর। সূর্যের আলো সেখানে তেমন একটা প্রবেশ করে না। মশক ভরে পানি রাখলে সকালে হয়ে যায় বরফ। অনেক সময় পানির মশক কম্বল দিয়ে ভালভাবে পেঁচিয়ে রাখতে হয়। এমন শীতে জীবন ধারণ করা ছিল একমত অসম্ভব। তারপরও সেখানেই অবস্থান নেয়া নিরাপদ মনে করছি। মানুষ মানুষের বন্ধু। সে বন্ধু যদি দুশমন হয়ে যায় তবে জীবন ধারণ হয় খুবই কষ্ট। সেসব মানুষ থেকে হিংস্র হায়েনারা শত গুণে ভাল। তাই লোকালয় থেকে কিছুদিন দূরে অবস্থান করাই নিরাপদ মনে করলাম।

আমাদের কাছে যেসব খাবার ছিল তা পাঁচদিন পর্যন্ত অল্প অল্প করে খেয়ে শেষ করলাম। পাঁচদিন পর খাবার মত আর কিছুই ছিল না। একাধারে তিনদিন পর্যন্ত অনাহারে থেকে সবাই দুর্বল হয়ে পড়লাম। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে লতানো গাছের কিছু পাতা লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে অল্প অল্প করে সবাই খেলাম।

হায়রে দুঃখ! খাওয়ার ঘন্টা খানেক পর এক একজনের দু'তিনবার পাতলা পায়খানা হয়ে মরণাপন্ন অবস্থা হয়ে গেল। নড়াচড়া করার মত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। ডায়েরিয়ার কোন ঔষধ আমাদের নিকট ছিল না। হঠাৎ হাম্মাদ বেগ বলে উঠল, "ওযায়েভ ভাই! আমার মনে হয় ব্যাগের ভিতর পাতলা পায়খানার ট্যাবলেট ছিল, দেখি ওগুলো পাই কি না।" এই বলে সে কয়েকটা ট্যাবলেট বের করে দিল। এক সাথে তিনজনে দুটি করে ট্যাবলেট সেবন করলাম। এতে পেটের ব্যথা ও পাতলা পায়খানা অনেকটা উপশম হল। রাতেও তিনজনে তিনটি বড়ি খেয়ে শুয়ে রইলাম। পাহারাদারির শক্তি সবাই হারিয়ে ফেলেছি। বসে বসে শুধু ফরযটুকু আদায় করছি। আল্লাহ্র খাছ রহমতে পায়খানা বন্ধ হল কিন্তু ক্ষুধায় জীবন যায় যায়। নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্র দরবারে সেজদায় পড়ে বলতে লাগলাম, "ওগো মাওলায়ে করীম! কার জন্য এবং কেন আমরা বনবাসে আছি তা আপনি ভালভাবেই অবগত আছেন। আপনি যদি আমাদের থেকে পরীক্ষা নিতে চান, তবে নিতে পারেন, কিন্তু আমরা তো ফেল করব। পরীক্ষা না নিয়েও তো আপনি উত্তীর্ণ করতে পারেন। আমরা তো পরীক্ষার উপযুক্ত নই হে প্রভু! তুমিই তো আমাদের রব, তুমিই রাজ্জাক। তোমার ভাণ্ডারে তো রিযিকের অভাব নেই। তোমাকে ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। তুমি তোমার কুদরতী হাত প্রসারণ করে রিজিক দান কর। আর সইতে পারছি না। এসব দোয়া করে আমরা তাঁবুর বাইরে ঘুমিয়ে গেলাম।

আনুমানিক বেলা ১১টায় কপালে, মাথায়, বুকে কিসের মৃদু আঘাত লেগে নিদ্রা ভঙ্গ হল। চেয়ে দেখি ইবনে রবি ও হাম্মাদ বেগ শোয়া থেকে কুঁকিয়ে উঠল। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি হল! শুকনো ডাল পতিত হল কি-না? এমন সময় মাথায় ও পাশে টপ্ টপ্ করে আরো কি যেন পতিত হল। চেয়ে দেখি সুবহানাল্লাহ্! সুপক্ক খর্জুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এ গভীর অরণ্যে কোন খেজুর গাছ দেখিনি। তাহলে এতগুলো খেজুর এখানে কি করে এল! এই নিয়ে আমরা কানা-ঘোষা করছিলাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি কাকের মত এক ঝাক পাখি, প্রত্যেকের মুখে একটি করে সুপক্ক খর্জুর নিয়ে আমাদের উপর এসে ফেলে যাচ্ছে।

আমার বুঝতে আর বাকি রইল না, এটা যে মহান রাব্বুল আলামীনের গায়েবী নুসরত। আমি সাথীদেরকে নিয়ে দু'রাকাত শোকরিয়ার নামায পড়ে খর্জুরগুলো জমা করতে নির্দেশ দিলাম। একত্রে জমা করে দেখি প্রায় ১০/১২ কেজি হবে। তারপর আমরা খেজুর খেয়ে উদর পূর্ণ করলাম। উক্ত খেজুর আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত খেলাম। এত সুমিষ্ট আর বলকার খেজুর জীবনে কোনদিন খাইনি।

একদিকে সাথী হারানোর মর্মবেদনা, অপরদিকে খোবায়েব ও উছায়েদের চিন্তায় অস্থির। মনে করলাম, ১৪ দিনে হয়ত অশান্ত পরিবেশের অবসান ঘটে একটু শান্ত পরিবেশ ফিরে এসেছে। এখন অরণ্যে দিন যাপন করা আদৌ ঠিক হবে না। খোবায়েব যদি মেরীকে উদ্ধার করে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে আমাদের সন্ধানে বেরোয় আর আমাদেরকে পূর্বের আস্তানায় তালাশ করে না পায় তবে লাশ দেখে ঘাবড়ে যাবে। সারা বন হয়ত আমাদেরকে খুঁজে বেড়াবে। তাই তাদের খোঁজে বের হওয়া দরকার।

তাই সাথীদের সাথে পরামর্শ করে আমাদের ছামানাগুলো তিনটি গাঠরী বেঁধে, তিনজনের পিঠে নিয়ে আল্লাহ্র নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বরফের আস্তর দিয়ে হাঁটছি। পা কেবলই পিচ্ছিল খেয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। অনেক কষ্ট করে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে পথ চলছি। পায়ে যদি হীম প্রোপসু না থাকত তবে খবর ছিল।

দুদিন চলার পর আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে গেলাম। একদিকে অনাহার, অপরদিকে সফরের ক্লান্তি সব মিলে মরণাপন্ন অবস্থা। চলতে চলতে এক পাহাড়ি নদীর কূলে এসে উপস্থিত হলাম। নদীটি আঁকা বাঁকা হয়ে চলে গেছে বহু দূর।

নদীটি ছিল খুবই খরস্রোতা। একটি হাতীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বহুদূর। লোকালয় নেই বলে পারাপারের কোন ব্যবস্থাও নেই। নদী পার হওয়া ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। আমাদের উস্তুবার, মার্ডবার্গ, কূরগান ও আর্মবার্গ এলাকায় যেতে হলে নদী পার হতেই হবে। কিন্তু উপায়...?

সাঁতরিয়ে সোজা যাওয়া তো দূরের কথা মাথা জাগানোও মুশকিল হয়ে যাবে। কেউ নদী পার হতে পারলে সে নব জীবন লাভ করবে। পানি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। কোন মানুষের সাধ্য নেই তা পার হওয়া।

নদীর অববাহিকায় তিন অসহায় মুজাহিদ বসে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। এর মধ্যে ইবনে রবি বলল, "ওয়ায়েভ ভাই! নদীতো পার হতেই হবে যেভাবেই হোক। বসে বসে রোদন না করে চলুন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নদীতে ঝাঁপ দেই। তারপর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করি। নদী তটে নুসরত আসবে না, নুসরত আসবে নদী গর্ভে। যেখানে বান্দার চেষ্টা-তদবীর শেষ হয় সেখান থেকে আল্লাহ্র মদদ শুরু হয়। চলুন ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ্র কুদরতী বাহু মদদ করতে তৈয়ার।"

এদিকে হাম্মাদ বেগও এ ধরনের সাহস জুগিয়ে বলল, "আমাদের গাঠরীগুলো মনে হয় পানিতে ভাসবে। আমরা ক্লান্ত হয়ে গেলে গাঠরী ধরে ভেসে থাকতে পারব। চলুন আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সাহায্য

করবেন। অতীতেও তিনি সাহায্য করেছেন, এখনো করবেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।"

ওদের ঈমানী তাকত দেখে আমার ঈমানও অনেকটা মজবুত হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নদীতে গাঠরীগুলো ভাসিয়ে আমরাও সাঁতার কাটতে লাগলাম। ঠাণ্ডায় মনে হচ্ছিল সমস্ত রক্ত জমাট হয়ে গেছে। এক হাত অগ্রসর হলে পাঁচ হাত ভাটির দিকে স্রোতে নিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আমাদের হাত পা সব অবশ হয়ে গেল। চলার গতি অচল হয়ে গেল। এমন সময় নদীতে প্রবল বেগে ঢেউ বইতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢেউয়ে ভাসিয়ে আমাদেরকে চড়াভূমিতে নিয়ে এল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। বহুদিন পর আজকে সূর্যের চেহারা দেখা গেল। গাঠরী খুলে দেখি গ্রাউন্ডশীটের ভিতর পানি ঢুকেনি। আমরা শীত নিবারণের জন্য চরের মধ্যে গ্রাউন্ডশীট বিছিয়ে রোদ পোহাতে লাগলাম। হঠাৎ নদীর দিকে চেয়ে দেখি শত শত কুমির লাফালাফি করছে এবং আমাদের আশে পাশে অসংখ্য কুমির রোদ পোহাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ্! এত কুমিরের ভিতর দিয়ে এসেছি, অথচ আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।

॥ সাতাশ ॥

উছায়েদ আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল উজিরাবাদ দস্তগীরদের বাড়িতে। তখন রাত আনুমানিক বারটা। ভূপ্রকৃতি ঘুমে অচেতন। অশ্বের পদধ্বনি কেউ যেন টের না পায় সেজন্য অশ্ব নিচ্ছিল হাঁটিয়ে। দস্তগীরদের আঙ্গিনায় অশ্ব থেকে অবতরণ করল উছায়েদ। এমন সময় তার কর্ণকুহরে ভেসে এল মিহিন সুরে ভেসে আসা মেয়েলী কণ্ঠের কান্নার সুর লহরী। উছায়েদ হতচকিত হয়ে ভাবতে লাগল মেরীর অসুস্থতা হয়ত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অসহনীয় বেদনা সইতে না পেরে করুণ রোদনে রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করছে। এর সুরটা আসছে দস্তগীরের মায়ের ঘর থেকে। এ যে মেরীর কান্না এতে কোন সন্দেহ নেই।

উছায়েদ আস্তে আস্তে ঘোড়া বাঁধার জন্য আস্তাবলের দিকে গেল। আস্তাবলের ঘোড়া উছায়েদের ঘোড়ীকে দেখে হিঃ হিঃ আওয়াজে স্বাগত জানাল। মেরী হ্রেষা নিনাদে ডেকে উঠল, "খোবায়েব ভাইয়া এসেছ? খোবায়েব ভাই!" ডাকের কোন সাড়া না পেয়ে দরজা খুলে আস্তে আস্তে আস্তাবলের দিকে এল। উছায়েদ ঘোড়া বেঁধে বের হতেই মেরীর সাক্ষাত। সে অন্যকিছু জানার আগেই জানতে চাইল আমার খবর।

"উছায়েদ ভাই! আমার খোবায়েব আসেনি?"

"না, খোবায়েব বিশেষ কাজে আছে।"

"সত্যি করে বল তো সে কি জীবিত আছে না শহীদ হয়ে গেছে?"

"আমরা তো কোন যুদ্ধ করতে যাইনি। গিয়েছি অন্য সব সাথীদের খোঁজ নিতে। এখানে শহীদের তো কোন প্রশ্নই আসে না।"

"তাহলে সে যে এল না, কোথায় রেখে এসেছ তাকে?"

"অরণ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। উক্ত লড়াইয়ে ৪০/৫০ জন দুশমন নিহত হয়েছে আর মুজাহিদ শহীদ হয়েছে সাতজন। আর তিনজন নিখোঁজ। তিনি ওদের তালাশ করছেন।"

"উনার সাথে কি আরো লোকজন আছে, নাকি একা?"

"লোকজন নেই, তবে তাঁর সাথে আল্লাহ্ আছেন।"

"তাকে একা কেন রেখে আসলে উছায়েদ ভাই?"

"তাকে একা রাখব না লোক পাব কোথায়? তিনি তো আমাকেও এক জিম্মাদারী দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"আহা! আমিও যদি সাথে যেতাম, তাহলে তো...।"

তাদের কথাবার্তা শুনে দস্তগীরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দস্তগীর বহিঃবাটিতে এসে দেখে দু'জনে আলাপ করছে। দস্তগীর একটু রসিকতার সুরে বলল, "কি হে মেরী! গভীর রজনীতে অভিসারে বেরোচ্ছ তাই না? মেরী লজ্জায় মস্তক নত করে বলল, "ইসলামেও কি এমনটি আছে ভাইজান? এবার দস্তগীর এমন লা-জওয়াব হয়ে গেল, তা কল্পনাও করা যায় না। সে বাধ্য হয়ে বলল, "তুমি দুঃখ পেয়েছ বোন? আমাকে ক্ষমা করো। ইসলামে এমনটি নেই। আমি ঠাট্টা করে এসব বলেছি। এখনই তওবা করে নিয়েছি, আর কোনদিন এ ধরনের হাসি মযাক করব না। অতঃপর দস্তগীর উভয়কে নিয়ে অন্দর বাটিতে প্রবেশ করল।

এরপর দস্তগীর উছায়েদকে ও ঘর থেকে খানা এনে খাওয়াল। সে সময় মেরী বসে বসে উড়নাঞ্চলে তপ্ত অশ্রুগুলো মুছছিল।

উছায়েদ মেরীকে অনেকভাবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এক পর্যায়ে দস্তগীর বলল, "ওকে সান্ত্বনা দেয়া আমার ও আম্মার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এখন সে খোবায়েবের চিন্তায় দানাপানি সবই ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি ঔষধ পর্যন্তও খায় না। আম্মার অনেক রাগারাগি আর গালমন্দের পর দুপুরে অর্ধ গ্লাস দুধ পান করেছে।"

উছায়েদ একটু রেগে বলল, "তাহলে আমরা একে এনে ভুলই করেছি। এমনই যদি হয় তাহলে জিহাদের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাকে রেখে আমরা কোথাও নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না। এ যদি ঔষধ না খায় আর দানাপানি মুখে

না তুলে তবে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এটা হবে আত্মহত্যারই শামিল। ঈমান আনার পর এত জুলুম নির্যাতন সহ্য করার পরও সে হবে জাহান্নামী। তাছাড়া জিহাদের কাজে যদি সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটে তবুও হবে জাহান্নামী।

হায়! কোথায় গেল ছাহাবাদের সে চরিত্র! হযরত হানজালা (রাঃ) বিয়ে করে নতুন বৌ ঘরে এনেছেন। উভয়েই যুবক। যৌবন দেহের কানায় কানায় ভরপুর। বাসর রজনীতে দাম্পত্য যুগলের মধুর মিলন ঘটেছিল। শরীর নাপাক হল। প্রভাত সমীরণ বয়ে যাওয়ার আগেই আদরের স্ত্রী স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র নবী তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাহাবাদেরকে নিয়ে রণাঙ্গনে চলে গেছেন। তুমি এখনো নতুন বৌ পেয়ে কাপুরুষের মত বাড়িতে রয়ে গেলে? তুমি এত বড় কাপুরুষ তা আগে যদি জানতাম তাহলে কোনদিন এ বিয়েতে মত দিতাম না। হায় কপাল! আমার মত কত অবলা নারীদের স্বামীরা নবীজীর সাথে জিহাদে গিয়েছে। ওরা হয়ত বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনে গাজী হয়ে ফিরবে, না হয় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে চির শান্তির নীড় জান্নাতে আশ্রয় নেবে। সেসব নারীরা যখন পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে, তখন কেউ বলবে আমার স্বামী রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেছে। আবার কেউ বলবে, আমার স্বামী গাজী হয়ে ফিরেছেন। সে সময় গর্ব করার মত আমার কিছুই থাকবে না।"

হযরত হানজালা (রা.) স্ত্রীর ভর্ৎসনা সইতে না পেরে ফরয গোসল না করেই ঢাল, তলোয়ার আর ঘোড়া নিয়ে ময়দানে চলে গেলেন। সে সময় তুমুল লড়াই চলছিল। হযরত হানজালা (রা.) ঘোড়া ছুটিয়ে দুশমনের বুহ্য ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং কাফেরদেকে কচুকাটা করতে লাগলেন। এমন সময় কাফেররা তাঁকে শহীদ করে দেয়। তার মরদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল মরুভূমির উত্তপ্ত জমিনে।

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর তাঁর মাথা থেকে ফোটায় ফোটায় স্নিগ্ধ পানি ঝরে পরছিল। অতঃপর মহানবী (সা.) বললেন, "হানজালার ফরয গোসল বেহেস্তের নাহারের সুরভিত পানি দ্বারা হুর-গেলমানরা দিয়েছে।" সুবহানাল্লাহ্! কেমন স্ত্রী আর কেমন স্বামী। কেমন ছিল দ্বীনের দরদ আর ফিকির। আহাঃ আমাদের বেলায় এমন যদি হত!" উছায়েদ আরো বলল—

এক সাহাবা অনেক কষ্ট করে বিয়ে করার জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করলেন। বিবাহের দিন তারিখ সবই ধার্য হল। তিনি টাকা নিয়ে গেছেন বিয়ের বাজার করার জন্য। তখন ঐ পথ দিয়ে মুজাহিদরা রণসাজে সুসজ্জিত হয়ে রণাঙ্গনে যাচ্ছিলেন। উক্ত সাহাবী মনে মনে ভাবছিলেন, "হায় সবাই জিহাদে যাচ্ছে আর আমি বিয়ে করে সুন্দরী বৌ নিয়ে আমোদ-প্রমোদ ও ফূর্তি করব! একজন মোমেনের দ্বারা তা কি করে হয়! না, বিয়ে করব না। এসব ভেবে তিনি বিয়ে

বাজারের টাকা দিয়ে ঢাল, তলোয়ার খরিদ করে সোজা চলে গেলেন রণাঙ্গনে। সেখানে গিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। এখন তিনি এক স্ত্রীর পরিবর্তে জান্নাতের ৭০জন স্ত্রী পেলেন। আহঃ এরচেয়ে মজা আর কি হতে পারে...?"

উছায়েদের ওয়াজ শুনে মেরী মুখ ভার করে বলতে লাগল, "জানি গো জানি, তুমি এ নছিহত কাকে এবং কেন শোনালে। তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পারছি না। আমি শুধু ভর্ৎসনা দিয়ে স্বামীকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাই না। স্বামীর সাথে আমিও জিহাদ করে কাফের কেটে শহীদ হতে চাই। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি চাই না। আমি চাই আল্লাহ্‌র ভালবাসা।"

মেরীর কথা শুনে উছায়েদ বলল, "হুঁ! জিহাদ করার মতো শরীরটাই তো তোমার! একটি শকুনেও ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারবে। সে আবার চায় জিহাদ করতে। দুর্বল মানুষ দ্বারা কখনো জিহাদের কাজ হয় না। শক্তির প্রয়োজন হয়। তোমার অন্তরে যদি সত্যিই জিহাদের জযবা থাকত তবে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য ঔষধ সেবন করতে। ভাল ভাল পুষ্টিকর খাবার খেয়ে শক্তি অর্জন করতে। এসব আবোল-তাবোল কথা আর পাগলের প্রলাপ ছেড়ে আমরা যা বলি তাই তোমাকে করতে হবে। না হয় সুনিশ্চিত জেনে রেখ, তোমার কপালে আরো কষ্ট আছে। যাও রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমিও এখন শুয়ে পড়ব।"

মেরী একদম খামোশ। কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হচ্ছে না। গোলাপী চেহারাটি তার মলিন হয়ে গেল। চেহারার আকৃতিতে বোঝা যায় নছিহতের আছর পড়েছে। এবার হয়ত তার চিন্তা চেতনা আর মেধার দ্বারা কথাগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করবে। উছায়েদ কথাগুলো বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। মেরী দস্তগীরের মায়ের ঘরে গিয়ে কিছু রুটি আর গোশত খেয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোরে দস্তগীর উছায়েদকে নিয়ে নামায আদায় করল। তারপর মেহমানদের জন্য সোবাহী নাস্তা তৈরী করতে মায়ের সাহায্যে এগিয়ে গেল। একটু পরে নাস্তা নিয়ে হাজির হল। মেরীও এখানে বসা ছিল। অতঃপর ওরা একই সাথে তিনজন তিন প্লেট নিয়ে খানা খেল। মেরীর খানা খাওয়া দেখে বাকি দু'জন খুব আনন্দিত হল। এরপর উছায়েদ তার ভালো পোষাক ছেড়ে পুরাতন কাপড় পরে একজন দিনভিখারী সেজে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় আবার সেই প্রশ্ন, "খোবায়েবকে কি আনতে যাচ্ছ ভাইয়া?" উছায়েদ মাথায় সম্মতি জানিয়ে নিরুদ্দেশে হারিয়ে গেল।

॥ আটাশ ॥

উছায়েদ দিন মজুরের বেশে কাজের সন্ধানের গ্রামে-গ্রামে, মহল্লায়-মহল্লায় ও পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে উস্তুবার গির্জায় এল। সেদিন অন্যদিনের মত গির্জার ঘন্টা ধ্বনি বেজে উঠেনি। কেমন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে। দু'একজন পাদ্রী ছাড়া আর কোন উপাসক নজরে পড়ল না। গোটা এলাকাটা একটা ভূতুরে নগরীর মত মনে হল।

গির্জার অভ্যন্তরে ৩/৪ জন পাদ্রী বসে কালিমার জিকির করছিল। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ঈছা রুহুল্লাহ্!' 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ঈছা রুহুল্লাহ্!!' বেশ কিছুক্ষণ তারা এ যিকির করছিল। জিকির সমাপ্ত করে দীর্ঘক্ষণ মোনাজাত করল। এক পর্যায়ে উছায়েদ তাদের ভিতর ঢুকে মোনাজাতে অংশ গ্রহণ করল। উছায়েদ পাদ্রীদেরকে চেনার চেষ্টা করল কিন্তু চেনেনি। পাদ্রীরাও উছায়েদকে চেনেনি।

এক পাদ্রী উছায়েদের পরিচয় চাইলে সে উত্তরে বলল, "আমি একজন অসহায় খৃস্টান, কাজের সন্ধানে ঘুরছি। কোথাও কোন কাজ পাই কি-না।"

পাদ্রী বলল, "তাহলে গির্জায় কেন?"

উছায়েদ বলল, "রাত হয়ে গেছে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই ভাবছি গির্জায় উপাসনাও করা যাবে, আর রাত্র যাপনেরও একটা ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া ফাদারের নিকট ভাগ্য উন্নয়নের জন্য আশির্বাদ নেব। এ কারণেই এখানে আগমন।"

"কোন ফাদারের কথা বলছ?"

"ফাদার যোহন, আমাদের প্রধান ফাদার।"

"ফাদারের কোন খবর পাওনি?"

"না তো! তিনি কোথায়?"

"ফাদার তো আর দুনিয়াতে নেই। বলসেবিক সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে ফেলেছে। তিনি এখন প্রভু যীশুর সান্নিধ্যে আছেন। তাঁকে আর খুঁজে পাবে না।"

"আহা! তিনি কত ভাল মানুষ ছিলেন। কে তাকে হত্যা করেছে?"

"মুজাহিদদের আস্তানায় হামলা করে বলসেবিকদের অনেক সৈন্য খোয়া গেছে। এ ঘটনাকে তারা মনে করেছে এঁটা ফাদারের গোপন ষড়যন্ত্র। তাই তাঁকে হত্যা করেছে।"

"তাহলে বলসেবিকদের হাতে কেউ বুঝি আর রক্ষা পাবে না। আগে ভেবেছি ওরা শুধু মুসলমানদেরই শত্রু। এখন বুঝলাম এরা আমাদেরও পরম শত্রু। তাহলে মুজাহিদরাই উচিত শিক্ষা দিতেছে। মাঝে মধ্যে শুনি একেক জায়গায় মেরে ভূত বানাচ্ছে।"

"আসলে ওরা উচিত কাজই করছে, কিন্তু ওরা তো আমাদেরও শত্রু। আমাদেরকেও তো ক্ষমা করে না।"

"তা যাই হোক, কমিউনিস্টরা কোন ধর্মকেই সাপোর্ট করে না। ওরা মসজিদ, মাদ্রাসা, গির্জা ও মন্দির সমানভাবে ধ্বংস করছে। আর মুজাহিদরা তা করেনি আর এর কোন প্রমাণও নেই। তাছাড়া ওরা আমাদের ঈসা মসীকে নবী হিসাবে মানে। বলসেবিকরা তো তা মানে না।"

"বাদ দাও ওসব আলোচনা। তুমি কি কাজ জান আর কি কাজ করতে পার বল।"

"আমি কৃষি কাজ ও বাগান পরিচর্যা ভাল করতে পারি।"

"তুমি আমার সাথে যাবে কি? আমার বাগানে কাজ করবে।"

"যদি গরীবের প্রতি দয়া হয় তবে অবশ্যই যাব।"

"কি হিসাবে কাজ কর?"

"মালিক যেভাবে খুশী থাকে।"

"যেমন?"

"কেউ রোজ হিসাবে বেতন দেয়, আর কেউ দেয় মাস হিসাবে। আবার কেউ কেউ করায় চুক্তি হিসাবে। আপনার যেভাবে সুবিধা হয় আমি সেভাবেই করব।"

"খুব সুন্দর কথা। আমি তোমাকে রোজ হিসাবে বেতন দেব। বল কত টাকা রোজ দিতে হবে?"

"আমি দু-তিনদিন বিনা বেতনে কাজ করব। আপনি আমাকে শুধু খাবার দিবেন। দু'দিনের কাজ দেখে আপনি আমার বেতন ধার্য করবেন। এতে আমি রাজি আছি।"

"ভাল কথা চল, আগামীকাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব। আজ রাতে এখানেই অবস্থান কর।"

উছায়েদ গির্জার অতিথিখানায় রাত যাপন করে সকালে পাদ্রীর সাথে চলে গেল পাদ্রীর বাড়িতে। পাদ্রী তাকে তার কাজ বুঝিয়ে দিল। তার কাজ হল—আপেল, আনার, বাদাম, পেস্তা ও অখরুট গাছের গোড়ায় সেচ দেয়া, আগাছা দূর করা। পশুপাখীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করা। আর নতুন নতুন ফলের চারা রোপণ করা।

উছায়েদ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তার কাজ দেখে মালিক খুবই খুশী। অতীতে এমন শ্রমিক আর পায়নি। উছায়েদ সেখানে কাজ করছে আর মনে মনে ওয়ায়েভের খবর নেয়ার চিন্তা করছে। ওয়ায়েভ কোথায় কি অবস্থায় আছে, কি করে উদ্ধার করা যায় এসব নিয়ে ফিকির করছে।

রবিবার দিন হল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সে ছুটির দিন উপলক্ষে আশপাশের গ্রাম ও বাজারগুলো ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিল। উছায়েদের কর্মস্থল থেকে কূরগান দু'কিলোমিটার। কূরগানে রয়েছে বলসেবিকদের বিশাল ঘাঁটি। তাছাড়া মার্ডবার্গ ও আর্থবার্গেও রয়েছে ছোট ছোট ছাউনী। উছায়েদ সাহস করে রবিবার দিন বিকালে কূরগান ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হল। দারোয়ান তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি বলে গেটেই দাঁড়িয়ে রইল।

উছায়েদকে গেটে দাঁড়ানো দেখে একজন সিপাহী এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি হে! তোমাকে রূহানী বলে মনে হচ্ছে, না মুজাহিদদের গোয়েন্দা? তুমি কি তা সত্য করে পরিচয় দাও।"

"স্যার কি আমাকে কিছু বলছেন?"

"(হিঃ হিঃ করে হেসে) কানে কম শোন না কি? তুমি কে রূহানী না গুপ্তচর?"

"স্যার! কি বলছেন তা বুঝি না। আমি আমার মালিকের গাধা খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এসেছি।"

"তোমার মালিকের নাম কি?"

"পাদ্রী ব্রাহুই। আমি তার বাগানের কর্মচারী।"

"অ...। তাহলে তুমি শ্রমিক তাই না?"

"না স্যার! আমি শ্রমিক নই, চাকর বা কর্মচারী।"

"তুমিও তো দেখি লেজ ছাড়া গাধা! শ্রমিক, কর্মচারী আর চাকর একই অর্থে ব্যবহার হয়। তুমি কি শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিয়েছ?"

"স্যার আমি লেখাপড়া জানি না। যোগ বিয়োগ ভাগ কিচ্ছুই পারি না।"

"আরে গাধা! আমি জানতে চাচ্ছি তুমি শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিয়েছ কি-না?"

"আমি তো সে কথাই বলছি। যোগ-বিয়োগ কিছুই জানি না। তাহলে যোগ দেব কিভাবে?"

"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, তুই গাধা, তোর বউ গাধা এবং চৌদ্দ গোষ্ঠী গাধা। তোদের কপালে মুজুরীগিরী ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। তোর সাথে ঐ বাগানে কতজন কর্মচারী কাজ করে?"

"আমাকে সহ আরো এগারজন আছে।"

"ওরাও কি তোর মত শিক্ষিত?"

"হ্যাঁ, ওরাও আমার মত শিক্ষিত। চারা লাগানো, আগাছা দূর করা, ফল পারা ও গোদামজাত করা খুব ভালই পারে।"

"শোন! তোমরা জীবনভর মুটে-মুজুরে কাজ আর কত করবে? আমাদের চিন্তা চেতনার সাথে একমত হয়ে যদি কাজ কর তবে আর গরীব থাকবে না। ধনী আর পুঁজিপতিরা তোমাদের শোষণ করে দিন দিন বড় লোক হচ্ছে আর তোমরা দিন দিন হচ্ছ গরীব। ধনীরা তোমাদের থেকে নামে মাত্র মূল্যে তোমাদের শ্রম নিচ্ছে। আর তোমাদের উৎপাদিত পণ্য তোমাদের কাছেই চড়া মূল্যে বিক্রি করে থাকে। এতে তোমরা হচ্ছ ক্ষতিগ্রস্ত আর ওরা একচেটিয়া হচ্ছে লাভবান।" সে আরো বলল—

"দেখ! তোমরা বারজন শ্রমিকে মিলে বাগানে শ্রম দিচ্ছ, এতে মনে কর উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে মালিকের বাৎসরিক আয় হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা। এতে তোমাদের পিছনে খরচ করছে এক লক্ষ টাকা। আর বাগানের আনুষঙ্গিক খরচ পঞ্চাশ হাজার টাকা। দেখ! তোমাদের শ্রমের কারণেই সে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা আয় করতে পারছে। এতে তোমরা সবাই মিলে পাচ্ছ মাত্র এক লক্ষ টাকা আর বাগানে খরচ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। অর্থাৎ দেড় লক্ষ টাকা খরচ আর সাড়ে আট লক্ষ টাকা তার আয়। সে বসে বসে তোমাদের শ্রম নিচ্ছে আর বড় লোক হচ্ছে। আমরা চাচ্ছি আয়ের অর্থগুলো শ্রমিক আর মালিকদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে। এতে ধনী আর গরীব, মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। সবাই হবে এক সমান। থাকবে না ধনী গরীবের শ্রেণী বৈষম্য। মিটে যাবে হানাহানি, রেষারেষি, ঝগড়া বিসংবাদ। বুঝলে...?"

উছায়েদ সৈন্যের কথা শুনে বলল—

"বাহ্! কত সুন্দর যুক্তি ও ইনসাফ। এমন হলে তো ভালই হয়। মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সবাই হয়ে যাবে এক সমান। এমন সুন্দর সমাজ ব্যবস্থারই তো দরকার। এখন থেকে আমরাও আপনাদের সাথে মিলে যাব। আচ্ছা! আর একটা প্রশ্ন আমার দিলে উঁকি মারছে। তাহল, এত সুন্দর অর্থ বণ্টন থাকতে মুজাহিদরা আপনাদের উপর এত ক্ষ্যাপা কেন? ওরা আপনাদের সাম্যবাদকে মেনে নিচ্ছে না কেন?"

"তা...সে কথা? শোন, ওরা কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করতে চায়।"

"কায়েমী স্বার্থ কি?"

"বুঝলে না কায়েমী স্বার্থ কি? তাহল, ওরা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও গির্জায় বসে বসে গরীবদের শোষণ করে। বসে বসে হাদিয়া-তুহফা কুড়িয়ে সংসার চালায়। জান্নাত আর জাহান্নামের মিথ্যা ভয় দেখিয়ে তোমাদের থেকে অর্থ শোষণ করে। আর এক শ্রেণীর পুঁজিপতি আছে, তারাও পুঁজি খাটায়। অল্প মূল্যে শ্রম নেয়। তারপর বসে বসে লাভটুকু একাই নিয়ে নেয়। এরাই হল কায়েমী স্বার্থবাদী। কমিউনিজম মানলে ওরা একচেটিয়া মুনাফা ভোগ করতে

পারবে না। সে মুনাফা শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন হয়ে যাবে। এ জন্যই তারা বিরোধিতা করে।"

"আচ্ছা, কমিউনিস্টরা শ্রমকে প্রাধান্য দেয় না শ্রমিকদের?"

"শ্রমকে প্রাধান্য দেয়া হয়।"

"শ্রমকে যদি প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে শ্রমিক যদি শ্রম দিতে ব্যর্থ হয়। হয়ত বৃদ্ধ হয়ে গেছে না হয় রোগাক্রান্ত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় সে তো কোন মর্যাদা পাবে না, কারণ শ্রম দিতে পারে না। তখন সে সমাজের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সে সময় সমাজ তার সাথে কোন ধরনের আচরণ করবে?"

"তুমি না বললে, তুমি মূর্খ, লেখাপড়া জান না! এখন দেখি চাপাবাজি আরম্ভ করলে? আমার কথা যদি বুঝে থাক তবে সে মতে কাজ কর।"

"যারা আপনাদের বিরোধিতা করে এদেরকে পাকড়াও করেন না কেন? আর এ পর্যন্ত কয়জনকে ধরে এনে বন্দী করেছেন?"

"তুমি জান না? আমরা ধরে আনি না, মেরে ফেলি। ধরে এনে ঝামেলা বাড়াই না।"

"কেন? আমি তো লোকমুখে শুনেছি, সেদিন গভীর অরণ্যে মুজাহিদদের সাথে আপনাদের তুমুল লড়াই হয়েছে। এতে অসংখ্য মুজাহিদ নিহত হয়েছে। আর আপনাদেরও নাকি ক'জন নিহত হয়েছে। তারপর নাকি আপনারা তাদের আস্তানা গুড়িয়ে দিয়ে এক ঝাঁক মুজাহিদকে গ্রেপ্তার করে এনেছেন। সেসব বন্দীরা নাকি এখনো আপনাদের ঘাঁটিতে বন্দী আছে।"

"এতকিছু কার কাছে শুনলে?"

"অনেকের মুখেই শুনেছি। বিশেষ করে আমার মালিকের কাছেও শুনেছি।"

"শোন! ওসব মিথ্যা গুজব। ভীতি ছড়ানোর জন্য এসব গুজব ছড়ানো হয়। সে যুদ্ধে মুজাহিদ বন্দী করা তো দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে পালানোও ছিল মুশকিল। আমাদের সাথীদের লাশও আনতে পারিনি। যাক ওসব কথা বাদ দাও। যা বলছি তা কর।"

"জ্বি স্যার! তাই করব। এখন যাই।"

উছায়েদ সুকৌশলে সৈন্যটির নিকট থেকে সংবাদ নিয়ে নিল যে তাদের কাছে কোন বন্দী নেই। সে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পাদ্রীর বাড়ি চলে এল। পরদিন বলসেবিকরা আইন পাশ করল যে, "অপরিচিত কোন লোককে এলাকায় থাকতে দেবে না। এরাই নাকি মুজাহিদদের গুপ্তচর।"

এ আইন পাশ হওয়ার সাথে সাথে গোটা এলাকায় তল্লাশি করে কিছু পথিক আর কিছু শ্রমিক গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল। এর মধ্যে উছায়েদও ছিল। হায়

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এক সাথীকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই গ্রেপ্তার হয়ে গেল। এ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে মানুষ এসে বন্দীদের দেখতে লাগল। বন্দীদের উপর চলল অমানুষিক নির্যাতন।

॥ ঊনত্রিশ ॥

আমি উছায়েদকে পাঠিয়ে দিয়ে অশ্ব নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললাম। বনের পর বন আর পাহাড়ের পর পাহাড় পাড়ি দিয়ে চলছি কিন্তু ওয়ায়েভের কোন সন্ধান মিলেনি। চার দিন পর আমার সমস্ত খাবার শেষ হয়ে গেলে উপোস দিন কাটাতে লাগলাম। অশ্ব যখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন তার বাগডোর মুক্ত করে ছেড়ে দেই। সে ইচ্ছামত ঘাস খেয়ে যখন ফিরে আসে তখন চলতে লাগি। এভাবে চলে গেল আরো তিন দিন।

জঠর জ্বালায় শরীর খুবই ক্লান্ত হয়ে গেল। চোখে দেখি সরিষার ফুল। সম্মুখে তাকালে দেখি বিশাল মাঠ জুড়ে শুধু সরিষার ক্ষেত। যেন আকাশ তলে গিয়ে মিশে গেছে। দুর্বলতার কারণে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাও আমার পক্ষে একমত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সপ্তাহে ঘোড়ার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক কায়েম হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি তাকে যুদ্ধের বেশ কিছু কলা-কৌশলও শিক্ষা দিয়েছি। টেক টিলা, পাহাড়-পর্বতে আরোহী নিয়ে কিভাবে উঠা নামা করতে হয়, দুশমন এলাকায় কিভাবে চলতে হয়। পাথুরে অঞ্চলে কিভাবে হাঁটতে হয় এবং খরস্রোতা নদী কিভাবে পাড়ি দিতে হয় তা ভালভাবে শিক্ষা দিয়েছি। এখন আর তাকে কোন সংকেত দিতে হয় না। নিজে নিজেই সে চলতে পারে। কখন কি করণীয় তা করে।

একবার এক নদীর কূলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পারাপারের ছিল না কোন ব্যবস্থা। বহু ঝর্ণার পানি একত্রে মিশে প্রবাহিত হওয়ার কারণেই মনে হয় এ নদীর সৃষ্টি হয়েছে। নদীর দু'কূলে এবড়ো-থেবড়ো ছোট বড় অসংখ্য প্রস্তর পড়ে আছে। এসব প্রস্তরের উপর দিয়ে সতর্ক অবস্থায় মানুষ চলতে পারবে, কিন্তু ঘোড়ার জন্য হবে বিপদজনক। যে কোন সময় পিছলে গিয়ে পা ভাংতে পারে। ঘোটক থেকে অবতরণ করে বিশ্রাম নিচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি কি করে সহজে নদী পার হওয়া যায়। কিন্তু কোন বুদ্ধি মাথায় উপস্থিত হয়নি।

এদিকে ক্ষুধায় এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তিটুকু শরীরে অবশিষ্ট ছিল না। ঘোড়াটি আমার দিকে তাকিয়ে অশ্রুবর্ষণ করছিল। ঘোড়া যে তার প্রভুর চিন্তায় চিন্তিত হয়, দুঃখে দুঃখিত হয় তার প্রমাণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কোন সময় তার চোখ থেকে অমন করে অশ্রু ঝরতে দেখিনি যা আজকে দেখলাম।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ভাবলাম, সময় তো বয়ে যাচ্ছে। যে কোন একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে বের করা দরকার। তা না হলে রাতযাপন করব কোথায়। মনে মনে দোয়া করতে লাগলাম, হে খোদা! এ মুহূর্তে কোন কাঠুরিয়ার সাক্ষাত করে দাও, না হয় কোন শিকারীর। ওদের থেকে কিছু আহার্য চেয়ে খেয়ে নেব। হে আল্লাহ্! না হয় কোন পাহাড়ী বস্তির সন্ধান দিয়ে দাও। আহার বিহনে জীবন তো আর বাঁচে না। তা না হয় খাদ্য ছাড়াই জঠর জ্বালা নিবারণ করে দাও।

অনেক কিছু ভেবে চিন্তে খুব আস্তে আস্তে ঘোটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোটক বুঝতে পেরে সে আস্তে করে শুয়ে পড়ল। আমি আমার দুর্বল শরীরটা স্বজতনে অশ্বের পৃষ্ঠে সওয়ার করিয়ে দিলাম। ঘোড়া দাঁড়িয়ে তার মর্জিমত চলতে লাগল। আমি তার চলার গতি রোধ না করে দোয়া করতে লাগলাম। হে আল্লাহ্! পথ ঘাট কিছুই চিনি না। চিনি না পূর্ব-পশ্চিম। গভীর অরণ্য, নেই কোন লোকজন। আমার অশ্বটির পা সেদিকে পরিচালিত কর, যেদিকে আমার জন্য হয় নিরাপদ।

ঘোটক নদীর কূল ঘেঁষে চলছে। আমি দোয়া করছি। এক সময় চেয়ে দেখি নদীটা আগের চেয়ে বেশ চওড়া হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু স্রোত তেমন নেই। খুবই শান্ত। আবার দু'কূলে যে পাথর ছিল তাও নেই। আছে শুধু বালুর চর। তা দেখে আমি আল্লাহ্র শোকর আদায় করতে লাগলাম। ঘোটক পানি থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল।

অতঃপর আমাকে নিয়ে নদী পার হয়ে গেল। পানি ছিল ঘোড়ার পেট পর্যন্ত। আমার শরীরও ভিজেনি। নদীর কূলে ছিল বিরাট এলাকা জুড়ে সমতল ভূমি। বড় বড় বৃক্ষ না থাকলেও ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়ে ছিল ভরা। সমতল ভূমির পশ্চিম ও উত্তর পাশ দিয়ে ঘেরা সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী। ঘোটক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অগ্রসর হতে লাগল। তখন ছিল বৈকাল বেলা। খরতাপ ছিল মন্দিভূত। ঘোটক চলছে আপন গতিতে আনমনে।

উপত্যকা বেয়ে চলতে চলতে সম্মুখে এক অনুচ্চ পাহাড় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোটক আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর আরোহণ করতে লাগল। এক পর্যাযে শীর্ষে উঠে হাঁপাতে লাগল। অশ্ব পৃষ্ঠে বসে পশ্চিমের নিম্নদেশে তাকিয়ে দেখি কতগুলো কুঁড়ে ঘর নিয়ে ছোট একটি বস্তির মত দেখা যাচ্ছে। আসলে এটা বস্তি কি-না, তা বুঝতে পারিনি। আহা! এটা যদি বস্তি হত, তবে কতই না ভাল হত। এই ছিল দিলের তামান্না।

অশ্বটি এবার নিম্নদেশে নামতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে গোধূলী লগনে উক্ত বস্তিতে এসে পৌছলাম। আমাদের দেখে বস্তির লোকজন দৌড়ে এল। আমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে একজন মুজাহিদ হিসাবেই মনে করেছে। লোকজন আমার পরিচয় জানতে চাইলে বললাম, আমার নাম খোবায়েব, আমি একজন মুজাহিদ। পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। আমি ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। আমাকে কিছু খেতে দিন।

একজন দয়ালু ব্যক্তি সাথে সাথে দু'গ্লাস গরম দুধ আর কিছু রুটি ও ভুনা গোশত এনে দিল। আমি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে তা খেয়ে নিলাম। তারপর একটি মাঠে জামাতে নামায আদায় করলাম। বহুদিন পর জামাতে নামায আদায় করে খুবই তৃপ্তি পেলাম। তীব্র শীতের কারণে সকলেরই শরীর ছিল ঢাকা। এমন কি আমারও। চোখ দুটি ছাড়া দেখার বা চেনার কোন উপায় ছিল না। যে লোক ইমামতি করেছে এবং যে ব্যক্তি ইকামত দিয়েছে এরা জামাত দাঁড়ানোর কারণে আমার পরিচয় জানতে পারেনি।

নামায সমাধার পর একজন অর্ধবয়সী লোক আমার হাত ধরে বললেন, "মুসাফির মিয়া! তুমি তো খুবই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এসো আমার সাথে, আমার ঘরে, সেখানে তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। তিনি অপর একজনকে বললেন, "ঘোড়াটিও খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তার ঘাস, ভূষি, চনা-পানির ব্যবস্থা কর। ঘোড়াটির পেট ভরিয়ে আমার দহলিজে নিয়ে এসো।"

এই বলে লোকটি আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর মেহমান খানায়। সেখানে আরো দু'জন লোককে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলাম। এরা কি এ বাড়ির না এলাকার, না আমার মত মুসাফির তা বুঝতে পারিনি। গৃহকর্তা কিছুক্ষণ পর এক গাঠরী শুষ্ক কাষ্ঠ এনে শীত নিবারণের জন্য আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিয়ে এলেন কিছু বিস্কুট আর চা। আগুনের পাশে কয়েকটি বেতের নির্মিত মোড়া এনে সাজিয়ে রাখলেন। উক্ত দু'ব্যক্তি দুটি মোড়া দখল করে বসলেন। গৃহকর্তা বারবার বলার পর আমিও উঠে একটি মোড়ায় গিয়ে বসলাম। গৃহকর্তা বড় বড় মগ ভর্তি করে দুধপাত্তি চা দিলেন। আমরা চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেলাম ও চা পান করলাম। সত্য কথা বলতে কি? মনে হচ্ছিল এটা চা নয়, শারাবান তহুরা বা মৃতসঞ্জীবনী সূরা! উক্ত চা পান করার সাথে সাথে শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল জীবনে কোনদিন কষ্টই করিনি। অর্থাৎ আরামের আতিশয্যে অতীতের সমস্ত ক্লান্তিকে ভুলে গেলাম। তাই আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর প্রথম সাক্ষাতে যাদের নিকট আমার পরিচয় দিয়েছিলাম, সেসব লোক এসে ছালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। আমরা একটু একটু চেপে বসে তাদেরকেও বসতে দিলাম। অতঃপর একজন প্রশ্ন করলেন, "মুসাফির ভাই! আপনার আলোচনা লোকমুখে শুনেছি। শুনেছি রেডিওতেও। আসলে আপনিই সে ব্যক্তি কিনা তা জানি না।" এতটুকু বলতে না বলতে অপর একজন বলে উঠলেন—না! তিনি সে ব্যক্তি নন। তার ছবি পোস্টারে দেখেছি। ছবির সাথে চেহারার কোন মিল নেই। সে চেহারা কত ভয়ঙ্কর! দেখলেই ভয় লাগে।"

অপর এক ব্যক্তি বললেন, "মুসাফির ভাই! আপনি যখন আমাদের এখানে পা রাখছিলেন, তখন আপনাকে অনেক পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল! মনে হচ্ছিল অনেক দূর পথ সফর করে এসেছেন, আসলে কোত্থেকে কিভাবে এসেছেন তা জানতে ইচ্ছা করে। বলবেন কি?"

"আসলে আমি কোথা থেকে এসেছি তা ঠিক বলতে পারি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল উজিরাবাদ থেকে। তারপর উস্তুবারের উত্তর দিক দিয়ে বনে ঢুকেছিলাম। তারপর দিক হারিয়েছি।"

"বনে ঢোকার কারণ কি ছিল?"

"আমার তিনজন সাথী নিখোঁজ। একটি যুদ্ধের পর তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই খুঁজতে এসেছি।"

"আহা! মুজাহিদদের উপর খুব জুলুম অত্যাচার চলছে। এমন তাড়া খেয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে আমাদের এখানে আরো দু'জন মুজাহিদ এসে আশ্রয় নিয়েছেন। একজন তো খুব মুমূর্ষু ছিলেন। চিকিৎসার পর একটু আরোগ্য হয়েছেন।"

"এরা কোথায়?"

"এই তো আপনার পাশে বসা।"

তখন আমি তাদের পরিচয় জানতে চাইলে বললেন, আমার নাম বরকতুল্লাহ আর (অঙ্গুলি নির্দেশে) ইনি হলেন কুদরতুল্লাহ্। আমরা দুইজন আনোয়ার পাশা শহীদ (রহ.)-এর তরবিয়ত ইয়াফ্তা সহকর্মী। কুকান্দুজের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আমরাও ছিলাম। সেখান থেকে আমরা এদিকে এসেছি।"

"আচ্ছা! আপনাদের সাথে যারা ছিলেন তাদের দু'একজনের নাম বলুন তো শুনি।"

"আমাদের প্রাণপ্রিয় কমান্ডার খোবায়েব জাম্বুলী, ওয়ায়েভ, উছায়েদ, হাম্মাদবেগ ও ইবনে রবি।"

"খোবায়েবের আরো কোন পরিচয় জানা আছে?"

"হাঁ, তিনি বহু হামলার নায়ক। তাঁর প্রত্যেকটি অভিযান অব্যর্থ। তিনি ছায়েমা নাম্নী এক যুবতীকে নিয়ে ওসব যুদ্ধ করেছেন। তারপর আমাদের এখানে আসলে আমাদের আমীর সাহেব রণাঙ্গনে তার বিবাহ পড়িয়ে দেন। তার পর দিনই তুমুল লড়াই আরম্ভ হয়।"

"তিনি কি বেঁচে আছেন?"

"তা বলতে পারি না। তবে রণাঙ্গনে তাঁকে বীর বিক্রমে লড়তে দেখেছি। এখন জীবিত আছেন কি-না তা জানি না।"

এতটুকু শুনে আমি আমার মুখের আবরণ খুলে ফেলি। বরকতুল্লাহ আমার চেহারা দেখে এক চিৎকারে বুকে জড়িয়ে ধরে রোদন করতে লাগলেন এবং বললেন, খোবায়েব! তুমি জিন্দা আছ? শোকরিয়া খোদার! অতঃপর অর্ধরাত পর্যন্ত আমাদের কারগুজারী চলল। তারপর আমি বললাম, "ওয়ায়েভ, হাম্মাদ বেগ ও ইবনে রবিকে তালাশ করছি। ওদেরকে পাচ্ছি না।"

আমরা উক্ত বস্তিতে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করে সাথীদের খুঁজতেছিলাম। একদিন ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলাম বহু দূরে। পৌছলাম এক খরস্রোতা নদীর কূলে। দু'ধারে বিশাল চর। শুধু বালি আর বালি। রোদে চিক্ চিক্ করছে। নদীর কূল ঘেঁষেই চলছি। কিছুদূর গিয়ে দেখি নদীর চরে প্রখর রোদের মধ্যে কে যেন কাঁথা বালিশ ছড়িয়ে দিয়েছে। আরো একটু কাছে গিয়ে দেখি হায়! এরা তো ওয়ায়েভ কাফেলা। আমি তাদের মরণাপন্ন অবস্থা দেখে আমার খাবারগুলো খাইয়ে বস্তিতে নিয়ে এলাম। তারপর একে অপরের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনলাম। সে মেরীর কথা জানতে চাইলে তার উদ্ধারের খবর শোনালাম।

পরদিন উক্ত বস্তিবাসীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উজিরাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এখন আমাদের কাফেলায় লোকসংখ্যা ছয়জন। ঘোড়া মাত্র একটি। তাই সকলের অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য ছামানা পত্র ঘোড়ার পিঠে দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম। এবার আমাদের রাহবর হল ঘোড়া। ঘোড়াটিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। একটানা তিনদিন হেঁটে রাত একটায় দস্তগীরের বাড়িতে পৌছলাম।

॥ ত্রিশ ॥

কৃষ্ণ পক্ষের এক ফালি চাঁদ সবে মাত্র উঁকি দিয়েছে। দূর আকাশে তারকাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। তামাম দুনিয়া শীতের কালো চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মনে হয় কোথাও কোন প্রাণী জেগে নেই। আমরা খুব সন্তর্পণে দস্তগীরের দহলিজে এসে দাঁড়ালাম। এমন সময় মিহিন সুরে ভেসে আসছে হৃদয়-বিদারক বিলাপ গীতি—

"হার তামান্না দিলছে রোখছাত হুগায়ী,
আবতু আ-জা, আবতু খেলোয়াত হুগায়ী ॥

অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তর থেকে চলে গিয়েছে। তোমার সাক্ষাতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে। এখন তুমি আমার নিকট এসে যাও। এ গভীর রাতে তোমার সাথে একাকিনী বসে আলাপ করব।"

"আগার দানাম, তুরা আজ মান জুদায়ী
নমি কার দাম খেয়ালে আঁ সেনায়ী ॥

অর্থাৎ, আগে যদি জানতাম তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে। তাহলে কোনদিন তোমাকে ভালবাসতাম না আর অন্তরে স্থান দিতাম না।

"তেরে ফরকত ছে দিলে গম জাদা এতনা চুড় হে,
রোখনা রোখনা হে কে গুয়া খানায়ে জাম্‌বুর হে ॥

অর্থাৎ, তোমার বিরহ দহনে আমার অন্তর এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। যেমন মধুর চাকের মত ছিদ্র ছিদ্র।

"আয় পিয়ারে কব্ দেখেংগে, ফের তেরে দিদারকু,
তেরে লিয়ে ভুলগায়া মায়, ইয়ে তামাম জাহান কু ॥

অর্থাৎ, ওহে প্রিয়! আবার কখন তুমি আমাকে দেখা দিবে? তোমার জন্য আমি দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গিয়েছি।

"আয় পিয়ারে দেখ তাহুঁ মাই, তুনে মুজকু ভুল গায়া,
তেরী জিকির মেরে দিলমে, হরদম জারি রাহগিয়া ॥

অর্থাৎ, হে প্রিয়তম! আমি দেখেছি তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ। তোমার স্মরণ আমার দিলে সর্বদা জাগ্রত।

এ বিলাপ গাঁথা আর কারো নয়। এ যে ছায়েমার (মেরীর) সুর লহরী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ নিঝুম রাতে, অঘুম নয়নে আমার আগমনের পথপানে চেয়ে আছে। তার এ আচরণে আমার অন্তরে বড় ব্যথা লাগল। আহা! বেচারির অন্তর বিরহ অনলে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হচ্ছিল। তার কলিজা পুড়া গন্ধ আমার নাসিকা রন্ধ্রে এসে লাগছিল। অসহনীয় যন্ত্রণায় আমার অন্তর বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। অনেক কষ্টে আমাকে আমি সামলিয়ে নিয়ে দস্তগীরের দরজায় দাঁড়িয়ে কড়ায় মৃদু আওয়াজ করতেই দস্তগীরের আগেই ও ঘর থেকে মেরীর কণ্ঠ ভেসে এল, "খোবায়েব ভাই এসেছ? খোবায়েব ভাই!"

মেরীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। দস্তগীর টের পেয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। চুপি চুপি সালাম মুসাফাহার পর্ব শেষ করে কুশলাদি জানলাম। দস্তগীর চাপাকণ্ঠে বলল, "খোবায়েব! আমরা ভাল আছি বটে কিন্তু উছায়েদ...। এতটুকু বলে আর কিছুই বলতে পারল না সে। আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয় কোন দুসংবাদ হবে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে খুলে বল শুনি। সে তার কান্না সংবরণ করে বলল, "আজ ক'দিন হয় উছায়েদ বন্দী অবস্থায় থানায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। তার সাথে আরো কয়েকজন বন্দী রয়েছে। প্রতিদিন খুব মাইর মারে। শত শত দর্শকরা তার কষ্ট দেখে চোখের পানি ফেলে। আমিও দেখতে গিয়েছিলাম, আহা! বেচারা আমার দিকে তাকিয়ে খুব কাঁদছিল। আমি তার মুক্তির কোন উপায় পেলাম না। আহা! জানি না সে এতক্ষণে বেঁচে আছে কি-না!"

এর মধ্যে ও ঘর থেকে মেরী বের হয়ে আলু থালু কেশে একজন উন্মাদিনীর মত এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল আর বলছিল, "খোবায়েব! তুমি এসেছ! আল্লাহ্ তোমাকে ফিরিয়ে এনেছেন, কিন্তু আমার ভাই উছায়েদ বন্দী। কাফেরদের হাতে বন্দী। ওকে খুব নির্যাতন করছে। কয়েকবার আমি তার মুক্তির জন্য বটি হাতে নিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু দস্তগীর ভাই ও খালাআম্মা (দস্তগীরের জননী) আমাকে যেতে দেননি।"

ওর কথা শুনে আমি বললাম, আরে পাগলিনী! অমন করে কান্নাকাটি করলে অন্যসব বাড়ি থেকে মানুষ বেরিয়ে আসবে। এতে হিতে বিপরীত হবে। তুমি তো বুঝতেছ না দুনিয়াটা কিভাবে চলছে। সাবধান! বিলকুল খামোশ হয়ে যাও। আর যেন টু শব্দ না শুনি।"

আমি দস্তগীরকে বললাম, এ মুহূর্তে কোন খাবার থাকলে ৫/৬ জনের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আস। দস্তগীর বলল, দধি আর ছাতু ছাড়া এ মুহূর্তে আর কিছু নেই।" আমি বললাম, তাই নিয়ে এস, এক্ষুণি নিয়ে আস। দস্তগীর বলল, মেহমানদের নিয়ে ঘরে বস। বাইরে ঠাণ্ডা খুব বেশী।" আমি ধমক দিয়ে বললাম, যা বলছি তা কর। বেহুদা বাক্য খরচ করে লাভ নেই।

দস্তগীর ও মেরী ছাতু আর দধি এনে দিল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। এর সাথে সাথে মেরী চা নিয়ে এল। চার কাপ আমাদের হাতে দিতে যতটুকু দেরি কিন্তু পান করতে দেরি হয়নি। চা পান করে মেরীকে বললাম, "তুমি রুমে গিয়ে শুয়ে থাক। আমরা উছায়েদের মুক্তির জন্য যাচ্ছি।"

মেরী বলল, "না ভাইজান! আমি শোব না। আমিও আপনার সাথে যাব।"

"তোমাকে যেতে হবে না লক্ষ্মী সোনা! তুমি থাক। আমরা ওকে নিয়ে এক্ষুণি ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ্।"

তারপর দস্তগীরকে থানার অবস্থান ও আনুসঙ্গিক কিছু বিষয়াদী জানানোর জন্যে বলা হলে সে বলল, "শহরের পূর্ব-উত্তর কর্নারে থানা অবস্থিত। থানার চার দিকে রয়েছে থানা রক্ষী প্রাচীর। উক্ত প্রাচীর আনুমানিক ৭/৮ ফুট উঁচু হবে। তার উপর রয়েছে ৩ ফুট উঁচু কাটা তারের বেড়া। দক্ষিণ দিক দিয়ে রয়েছে প্রধান ফটক। ফটকে এক থেকে দু'জন দ্বার রক্ষী ২৪ ঘন্টা মোতায়েন থাকে। পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে ত্রিতল বিশিষ্ট দালান। এগুলোতে পুলিশরা ফ্যামেলী নিয়ে থাকে।"

আমি দস্তগীরের নিকট থেকে সামান্য ধারণা নিয়ে সাথীদের বললাম, প্রিয় ভায়েরা! আমি জানি তোমরা বড়ই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এখন তোমাদের বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন। তোমাদের সাথীকে দুশমনের হাতে বন্দী রেখে ঘুমাতে পারবে না। ঘুম আসবে না। শান্তি পাবে না। অতএব তোমরা যদি বজ্র শপথ নিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বেরিয়ে যাও তাহলে অবশ্য অবশ্যই উছায়েদকে মুক্ত করে এনে তাকে নিয়ে ঘুমোতে পারবে। এই বলে তিনজনকে বললাম, তোমরা প্রাচীর ডিংগিয়ে কাটা তারের বেড়া কেটে থানার ভিতরে গিয়ে পজিশন নেবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি বাঁশি ফুঁক দেব। তখন তোমরা সবদিক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে থানা অফিসে চলে যেও। আর বাকী তিনজন আমার দেহরক্ষী হিসাবে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।

তারপর সবাইকে সামরিক পোষাক পরিয়ে অস্ত্র নিয়ে আমার পিছু পিছু আসতে বললাম। আমরা শহর ডানে রেখে আস্তে আস্তে থানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম। আল্লাহ্র রহমতে পথে কোন অসুবিধা হয়নি। আমার পরনে ছিল ব্রিগেডিয়ার এস, কে পারসানস এর বিশেষ পোশাক। থানার নিকটে গিয়ে তিনজনকে ওয়াল বেয়ে ভিতরে প্রবেশের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। ওরা রশির সাহায্যে প্রাচীরের উপর উঠে প্লাসের সাহায্যে কাঁটাতার কেটে আবার রশি বেয়ে নিচে নেমে পছন্দ মত স্থান বেছে নিয়ে অপেক্ষা করতেছিল।

আমি তিনজন সৈন্য নিয়ে সোজা চলে গেলাম প্রধান ফটকে। তখন একজন পুলিশ কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের আগমন টের পেয়ে চিৎকার দিয়ে বলল, "হোল্ড! তোমরা কে থাম, পরিচয় দাও। আমি হাত উঁচিয়ে বললাম, আমি ব্রিগেডিয়ার এস, কে পারসানস। ও, সি সাহেবের সাথে জরুরী পরামর্শ করতে এসেছি। আমাদেরকে যেতে দাও এবং তাকে ডেকে দাও।

আমাকে দেখে কনস্টেবলের পঞ্চআত্মা উড়ে যাওয়ার উপক্রম। সে তাড়াহুড়া করে বলল, আসুন স্যার! আসুন! আমার সাথে আসুন।"

আমরা তার পিছু পিছু চললাম। কনস্টেবল আমাদেরকে থানার বারান্দায় বসিয়ে দু'জন দারোগা এবং ও,সি সাহেবকে ডেকে পাঠাল। দারোগা অফিস খুলে আমাদেরকে ভিতরে বসতে দিল।

ও,সি সাহেব এসে সেলট দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ও,সিকে বললাম, আপনার এখানে যে কয়জন বন্দী আছে তাদেরকে এখানে আনা হোক। ও,সি, তাড়াতাড়ি দারোয়ানকে হুকুম দিল বন্দীদের আনার জন্য। দারোগা থানার কয়েদখানা হতে সাতজন বন্দীকে নিয়ে এল। চেয়ে দেখি তাদের পরনে শুধু জাইংগা। তাছাড়া আর কোন কাপড়-চোপড় নেই। বন্দীরা ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি সাতজনের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। চেয়ে দেখি সাতজনের মধ্যে তিনজনই উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ। কথায় বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। উছায়েদকে উদ্ধার করতে গিয়ে আরো দু'জন অকুতোভয় জানবাজ মুজাহিদ ওমর খান ও শের খানের সাক্ষাত পেলাম। এ দু'জনই ছিলেন আনোয়ার পাশার সহযোদ্ধা। তাঁরাও কুকান্দুজ থেকে পালিয়ে এসেছে অর্থাৎ ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। আমরা প্রথম দর্শনেই একে অপরকে চিনেছি, কিন্তু তাদের সাথে আমি কোন কথাবার্তা বলিনি আর ওরাও বলেনি।

আমি এক পর্যায়ে ঝাঁঝালো সুরে বললাম, কি হে! এখনো এরা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে, ভালভাবে ঠেংগাওনি কেন? এখনো তো কোমড় বাঁকা করতে পারনি। আমার কথা শুনে দু'জন দারোগা বলল, স্যার! আমরা দু'জনে আর কত মারতে পারি? অন্যেরা কেউ আসেনি। যা করেছি আর যতটুকু করেছি তা নিজ ইচ্ছায়। কেউ আমাদের সাহায্য করেনি।

এবার বুঝতে পারলাম, কয়জনে বন্দীদের উপর নির্যাতন করেছে।

এবার আমি জালেম দু'দারোগাকে বললাম, এ তিনজন আসামীকে রশি দিয়ে বেঁধে আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে চল। আর এ চারজনকে ছেড়ে দাও। আমার অর্ডার পেয়ে চারজনকে ছেড়ে দিল আর তিনজনকে বেঁধে আমার সাথে নিয়ে চলল।

বন্দীরা আমার এ ব্যবহার দেখে মনে মনে ভাবছিল যে, আমি হয়ত কামাল পাশার মত মুর্তাদ হয়ে গেছি। এরা আমার জন্য খুব আফসোস আর হা-হুতাশ করছিল। এমন কি কেউ কেউ অভিসম্পাত করছিল।

আমি বন্দীদেরকে আর অন্যসব সাথীসহ দু'জন দারোগাকে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদূর পথ অগ্রসর হয়ে সবাইকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলাম। সবাই দাঁড়িয়ে গেল। আমি দারোগাদের রাইফেল দু'টি ছিনিয়ে নিয়ে

বললাম, তোমরা যেমনভাবে আমার তিনজন সাথীর উপর জুলুম-অত্যাচার করেছ, তোমার উপরও সে ব্যবহার করব। যদি কণ্ঠ চিরে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসে তাহলে আর রক্ষা নেই। এবার সবাই পাইকারী পিটনী লাগাও। প্রথমে তিন বন্দীকে বললাম, তোমরা ইচ্ছামত সাইজ কর। ওরা মনমত বানিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেল। তারপর সবাই চড়-ঘুষি, কিল, লাথি ও জুতাপেটা করে ছেড়ে দিলাম ও বললাম, যা ভাল হয়ে যা। ভাল হলে টাকা-পয়সা, তেল-মবিল খরচ হয় না।

এতটুকু বলে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে আমরা পথ চলতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে ছুবহে ছাদেকের কাছাকাছি সময়ে আমরা দস্তগীরের বাড়িতে পৌঁছলাম। সবাই দু-দু'রাকাত শোকরিয়ার নামায আদায় করে ফজরও পড়ে নিলাম। তারপর কিছু নাস্তা খেয়ে বাড়ীর ভিতরের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

॥ একত্রিশ ॥

সকাল ১০টা। ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরপর সবাই জাগতে লাগল। মেরী আপাদমস্তক বড় চাদরে ঢেকে আমার শিয়রের কাছে বসা। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি এত কোন মানুষ নয়, বরং কঙ্কাল। চোখ দুটি কোঠরাগত। চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় সূতিকার রোগী। আমি তাকে নিয়ে অপর এক গৃহে বসে তার সার্বিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম, ঔষধ খায় কিনা, এখনো শরীরের ব্যথা আছে কিনা, মুখের রুচি কেমন, মনের অবস্থা কি ইত্যাদি।

উত্তরে সে বলল, "খোবায়েব ভাই! আপনি একজন আলেম, সু-শিক্ষিত ও মুজাহিদ মানুষ। জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। আমি কিছু কথা বলব আশা করি হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে তা বোঝার চেষ্টা করবেন। কথাগুলো হল, আমি নিয়মিত ঔষধ সেবন করে যাচ্ছি, এতে শরীরের ক্ষত স্থান অনেকটা শুকিয়ে গেছে। শরীরের ব্যথারও উপশম হয়েছে কিন্তু মনের ব্যথা দিন দিনই বেড়ে চলছে। ছোট বেলায় মা হারিয়েছি। মায়ের আদর সোহাগ থেকে চিরবঞ্চিত। লালিত-পালিত হয়েছি পিতার স্নেহ মমতায়। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে জালেম পিতার আদর সোহাগ থেকেও নিরাশ হয়েছি। আমার ধন-সম্পদ কম ছিল না। সে সব ধন-সম্পদ থেকেও হয়েছি বঞ্চিত। ধর্ম ত্যাগ করার কারণে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব থেকেও আজ দূরে, বহু দূরে। কেউ আমাকে সুনজরে দেখবে না। সবাই আমাকে আদর সোহাগের পরিবর্তে দিবে ভর্ৎসনা, ধিক্কার, করবে আমায় নিয়ে উপহাস। এই হল আমার জীবনের বর্তমান খতিয়ান।

খোবায়েব ভাই! দিন দিন আমি দুর্বল থেকে দুর্বলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। বসা থেকে দাঁড়ালে মাথায় চক্কর খেয়ে ঘুরে পড়ে যাই। ফুটন্ত কুসুম সদৃশ চেহারা আজ জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছে। যেমন—

লাকড়ি জ্বলকার কয়লা বন্‌তা কয়লা জ্বলকার রাগ হে,
মায়া বেচারা এয়ছা জ্বলতা না কয়লা, না রাগ হে ॥

অর্থাৎ, লাকড়ি জ্বলে হয় কয়লা, আর কয়লা জ্বলে হয় ভস্ম। আমি তোমার বিরহ আগুনে এমনভাবে জ্বলছি যে, কয়লাও না আর ভস্মও না।

খোবায়েব ভাই! আর কতদিন তুমি আমাকে এমন করে জ্বালাবে? আর কতদিন আমাকে বিরহের আগুনে জ্বলতে হবে? তুমি হয়ত মনে মনে ভাবতে পার যে, যৌবনের উন্মাদনায় আমি এমন উতালা হয়ে গেছি। কসম খোদার! আসলে তা নয়। কেন যেন তোমাকে ভাল লাগে, কেন যেন তোমার পাশে বসে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনতে ইচ্ছা করে। কেন যেন তোমাকে নিয়ে হারিয়ে যাই মরু বিয়াবানে, গহন বনে ও গিরি-কান্তারে। কেন যেন মন তোমাকে নিয়ে ছুটে চলে যায় রণাঙ্গনে ও খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে। ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে নিয়ে চলে যাই কল্পনার জগতে, তোমাকে নিয়ে হামলা করি দুশমনের দুর্গে। আর কত কি যে ভাবি তার কোন ইয়াত্তা নেই।

খোবায়েব ভাই! আমি তোমার মনের বিরুদ্ধে কিছু করে তোমার কোমল ও পবিত্র দিলে আঘাত হানব না। আমি আমার মতই একা একা দিন কাটাব। আমি এরাদা করেছি পাক্কা এরাদা। এবার তুমি যখন চলে যাবে নিরুদ্দেশে, তখন আমি একা একাই অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব দুশমনের কেল্লায়। হয়ত দু'একজন কাফির হত্যা করে বিজয়িনী হয়ে ফিরে আসব। না হয় আমার অগ্রজ বোন ছায়েমার মত জীবন দিয়ে আমার ভেজা রক্তে লিখে যাব আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম। এটাই আমার দৃঢ় পণ। আমি আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব। এটা আল্লাহ্‌র হুকুম। এখানে কারো বাধা দেয়ার অধিকার নেই। শুনলে ভাইজান! তোমার হতভাগিনী বোনটির এরাদা! এই বলে মেরী চুপ হয়ে গেল।

আমি তার বেদনামাখা কথাগুলো মনের কান লাগিয়ে শুনছি এবং মনে মনে কল্পনার জাল বুনছি যে, একে আর কিছুতেই বুঝ মানিয়ে রাখা যাবে না। আল্লাহ্‌র প্রেম আর দ্বীনের জয্‌বা যার অন্তরে প্রবল হয়ে আছে, তাকে অযথা বুঝিয়ে লাভ নেই। তাকদিরে যা আছে তাই হবে। এবার তাকে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। এখন আর বিবাহ ছাড়া উপায় নেই। বিবাহ ছাড়া কথাবার্তা বলাও হারাম। তাছাড়া অন্যেরা করবে বদ গোমান। এ সবের ফাঁক বন্ধ করতে হবে। হয়ত দু'একদিনের মধ্যেই শুভ বিবাহ সম্পাদন করতে হবে।

আমার নীরবতা দেখে মেরী আবার প্রশ্ন করল, “কি হে বীর পুরুষ! এত কি ভাবছ? আবার কোথায় যাবে, কোথায় হামলা করবে এই নিয়ে ফিকির, তাই না...?”

“আরে হামলা কি এতই সহজ যে চুপ করে বসে বসে খসরা তৈরী করে হামলা করে বসব? এটা এত সহজ নয়।”

“তাহলে কি ভাবছ?”

“ভাবছি তোমাকে নিয়ে। ভাবছি তোমার কথাগুলো।”

“এত কি ভাবছ ভাইয়া?”

“কি ভাবছি তা দু'এক দিনের মধ্যে খবর হবে।”

“যা ভাবছি তাই। এমন হামলা করবে যা রেডিওতে বলবে।”

“না, ওসব না। তোমাকে বিয়ে করে...।”

মেরী লজ্জাবনত মস্তকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দস্তগীর নাস্তা এনে মেহমান খানায় অপেক্ষা করছে। আমিও ও ঘরে গিয়ে তাদের সাথে নাস্তায় শরীক হলাম।

নাস্তা খেয়ে আমি দস্তগীরকে বললাম, “মেহমানখানা মুক্ত করে আমাদেরকে অন্দরমহলের যে কোন একটি ঘরে নিয়ে যেতে আর মেহমানখানা একটু ময়লাযুক্ত করে রাখতে। কোন মানুষ মেহমানখানা দেখলে যেন মনে করে যে, এ ঘর ১২ বৎসরেও মেহমানের মুখ দেখে না।”

দস্তগীর আমার কথা মত আমাদেরকে অন্দরমহলের একটি বড় ঘরে নিয়ে গেল। তারপর মেহমানখানার চেহারা এমনভাবে পাল্টাল যে, কেউ দেখলে মনে করবে না, দু'চার মাসে এ ঘরে কোন লোক এসেছে। তারপর দস্তগীরকে বলে পাঠালাম যে, তুই বাজারে গিয়ে চা স্টল, রেস্তোরাঁয় ও অন্যান্য স্থানে ঘোরাফেরা করে লোকজন কে কি বলাবলি করে তা শুনে আয়। যত পারিস তত কথা খরিদ করবি কিন্তু কথার বেপারী সাজিসনে।

দস্তগীর চলে গেল বাজারে। আমি সাথীদের নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলাম। এখন আমাদের করণীয় কি তার পরামর্শ চাইলে ওয়ায়েভ বললেন, “মাননীয় আমীর সাহেব! বর্তমানে আমাদের প্রথম কাজ হল যথাশীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করে এরচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া। এখন আমাদের লোক সংখ্যা দশজন। কোন ছুরতে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, এখানে দশজন লোক গোপনে থাকে, তাহলে দস্তগীরের বিপদের সীমা থাকবে না। আর যে কোন সময় আমরা গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারি। কাজেই তাড়াতাড়ি এ স্থান ত্যাগ করার ব্যবস্থা নিন।”

ওযায়েভের কথা শুনে অন্যান্য সাথীরা তার কথার উপর একমত হয়ে গেল। এখন কোথায় যাব, কিভাবে যাব, কখন যাব তা নিয়ে পরামর্শ চাইলে ইবনে রবি বললেন, "মোহতারাম আমীর সাহেব! আমার তো খেয়াল আগামী রাত্রেই চলে যাওয়া। কিন্তু অসুবিধা হল উছায়েদ ভাইকে নিয়ে। জালেমরা তো তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। সে তো হাঁটতে পারবে না। তাই আরো দু'দিন অপেক্ষা করে তাকে ভাল চিকিৎসা দিয়ে একটু সুস্থ করে নিতে হবে।"

ওছায়েদ বলল, "ভাইসব! আপনারা আমাকে নিয়ে এত চিন্তিত হবেন না। আমার শরীর যতই খারাপ থাক না কেন এখনো আল্লাহ্‌র রহমতে আপনাদের সাথে সমান তালে দৌড়াতে পারব। আনোয়ার পাশা আমাদেরকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। কাজেই আমার ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না।"

কমান্ডার কুদরতুল্লাহ্ বললেন, "আমার মনে হয় গত রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ক্রেকডাউন লাগাবে। পরপর যে কয়টি ঘটনা ঘটেছে, এতে বিরাট একটা প্রভাব পড়েছে। কাজেই এরা চুপচাপ বসে থাকবে না। একটা কিছু অবশ্যই করবে। কাজেই আজ সন্ধ্যা রাত্রেই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হোক।

তাদের কথার উপর চিন্তা ফিকির করে বললাম, "ইনশাআল্লাহ্ আজ রাত নয় টায় আমরা বেরিয়ে যাব। গিরি-কান্তার ছাড়া আমাদের জন্য আর কোন নিরাপদ আশ্রয় নেই। আমরা সেখানে দু'তিন দিন অবস্থান করব। এর মধ্যে আমরা কমপক্ষে দশটি সাওয়ারীর ব্যবস্থা করব। সাওয়ারী ছাড়া চলা যাবে না। বিশ হাজার টাকা হলেই ভাল ভাল ঘোড়া খরিদ করা যাবে। প্রয়োজনে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে নেব।" আমার কথায় সবাই খুশী হল।

উছায়েদ বলল, "সব পরামর্শই হল কিন্তু আরো একটি পরামর্শ বাকি রয়ে গেল। সেটা কখন হবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা আবার কি?

সে বলল, "বিয়ের পরামর্শ।" এটা বলার সাথে সাথেই অট্টহাসিতে ঘর ভরে উঠল।

এর মধ্যে দস্তগীর বাজার থেকে ফিরে এসে বলল, "এক পুলিশ চায়ের দোকানে চা পান করতে করতে বলল, "মুজাহিদরা আশ পাশ এলাকায় ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। আজ রাত্রে যৌথ মহড়ার মাধ্যমে ক্রেকডাউন লাগিয়ে মুজাহিদ ধরার চেষ্টা করা হবে।"

অতঃপর দস্তগীরকে আমাদের পরামর্শ জানালাম। সে বলল, "আমার ইচ্ছা ছিল তোরা এখানেই থাকবি। কিন্তু বিপদের কারণে যেতে দিতে হয়। মাঝে মধ্যে খবর নিস। তারপর আরম্ভ হল বিয়ের আলোচনা। দেন মোহর ধার্য করা হল একটি ক্লাসিনকভ। আর আকদ অনুষ্ঠিত হবে বাদ আসর। দস্তগীর বাজার

থেকে বিয়ের বাজার নিয়ে এল। তারপর আছরের নামাযের পর ছায়েমার (মেরী) সাথে আমার বিয়ে পড়িয়ে দিল।

আমি সাথীদেরকে নিজ নিজ ছামান গুছিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলাম। সবাই তা পালন করলেন। তারপর এশার নামায আদায় করে খানাপিনা সেরে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় বেলা দস্তগীর আমাকে ও ছায়েমাকে (মেরী) দু'টি ঘোড়া উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে দিল।

॥ বত্রিশ ॥

আমাদের মধ্যে উছায়েদ ছিল রুগ্ন ও দুর্বল। তাছাড়া আরো ক'জন ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সবগুলো ছামানা দু'টি অশ্বের পিঠে বেঁধে দিলাম আর একটিতে ছায়েমাকে (মেরী), অপরটিতে উছায়েদকে বসিয়ে খুব সতর্ক অবস্থায় চলছিলাম। সবাই নিজ নিজ অস্ত্রগুলো সাবধানে বহন করছিল।

নিঝুম রাত। কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। কালো চাদরে ঢাকা সুপ্ত ধরণী। মাঝে মধ্যে কলা-বাদুরের ডানার পত্ পত্ শব্দে অথবা ঝিঁঝি পোকার ডাকে রাতের নীরবতা ভঙ্গ হচ্ছে। এতক্ষণে আমরা লোকালয় ছেড়ে অনাবাদী ভূমিতে এসে উপনীত হলাম। উজিরাবাদের ওয়ারলেছ টাওয়ারের লাল বাতি ছাড়া অন্য কোন বাতি নজরে পড়ে না। আনুমানিক ছয় কিলোমিটার পথ এগিয়ে এসেছি। সবাই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। একটু বিশ্রাম না নিলে আর হয় না।

ওয়ায়েভ বলল, "খোবায়েব ভাই! আমাদের উপর রহম করুন! আর পারছি না।" তার করুণ আকুতি আমার দিলে রেখাপাত করল। তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভাই! আর একটু ছবর কর, সামনের টিলায় গিয়ে বিশ্রাম নেব। নতুন করে কোমর বেঁধে আর একটু অগ্রসর হও।" এভাবে আরো আধা ঘন্টা পথ চলে সম্মুখের টিলার শীর্ষদেশে পৌঁছলাম। তখন রাত আনুমানিক দুটো। শৈত্য প্রবাহ আরম্ভ হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে বিশ্রাম নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের সাথী প্রায় অর্ধেকেরও বেশী রোগী। তাদের স্বাস্থ্যের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই বড় একটি তাঁবু আর ছোট একটি তাঁবু রচনা করার নির্দেশ দিলাম। দশ মিনিটে তাঁবু রচনা হয়ে গেল। বড় তাঁবুতে আটজন বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর ছোট তাঁবুতে বসলাম ছায়েমা আর আমি। হাম্মাদ বেগ ফ্লাক্স থেকে গরম চা ঢেলে পরিবেশন করতে লাগল আর ইবনে রবি পরিবেশন করল টোস বিস্কুট।

এক এক জনে দু'থেকে তিন মগ চা পান করল। কম্বল মুড়ি দিয়ে গরম চা পান করার যে এত মজা আর এত স্বাদ তা অনেকেরই জানা ছিল না। বড় তাঁবুর সদস্যরা সফরজনিত ক্লান্তিতে একে অপরের উপর গাদাগাদি করে শুয়ে ঘুমিয়ে

পড়ল। কেউ আর জেগে নাই, সবাই নিদ্রাপুরীর যাত্রী। আমি ছায়েমাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তারপর আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে দিয়ে বললাম, এখন ভাল মানুষের মত ঘুমাও। ফজরের সময় ডেকে দেব।

সে হুড়মুড় করে কম্বল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "তুমি পালাচ্ছ বুঝি? এ ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাউকে কি আবার মনে পড়ল? আমি ঘুমাব না, তোমার সাথে যাব। আমার সাথে চালাকি? হয় দু'জনই শোব না হয় তুমি যেদিকে যাও আমিও সেদিকে যাব।" এই বলে স্টেনগানটি শিয়র থেকে টেনে উরুতে স্থাপন করে বসল। আমি তার অবস্থা দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেললাম। সে আবার বলে উঠল, "ইস্! আবার হাসছে। বেশরম ধোঁকাবাজ! দাগাবাজ! পামর!" আমি জিজ্ঞাসা করলাম তারপর কি? এমন কয়টি গালি কণ্ঠস্থ করেছ মেরী?

"আমি মুসলিমা, আমি মেরী নই। এখন আমি মুমেনা, আমার নাম ছায়েমা। ভালভাবে মনে রেখো, মেরী নই, ছায়েমা।"

"সরি! ভুল হয়ে গেছে সুন্দরী, ক্ষমা করো।"

"এবারের মত ক্ষমা করা হল। ভবিষ্যতে মেরী ডাকলে কিন্তু...।"

"না, আর কোনদিন আমার মুখ থেকে এ ডাক শুনবে না।

এবার শোন ছায়েমা! (এ ডাক শুনে সে মিটমিট করে হাসছে) সাথীরা সব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাহারাদারী করার কেউ নেই। তাই আমি পাহারা দিতে যাচ্ছি। তুমি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়। যাও লক্ষ্মী, যাও।"

"ইস্-রে! সে একা একা পাহারা দেবে আর আমি আরাম করে ঘুমাব। ছায়েমা অমন করে ঘুমাতে শেখেনি। তার চোখে ঘুম নেই। চল দু'জনে মিলে পাহারাদারী করি। দুশমন এলে একেবারে...।"

"একেবারে আবার কি? লক্ষীমণি...?"

"একেবারে কি বুঝলে না? জাহান্নামের ভিসা লাগিয়ে দেব।"

ছায়েমাকে কিছুতেই মানাতে পারলাম না। অগত্যা তাকে নিয়েই পাহারায় বেরিয়ে পড়তে হল। আমরা সাথীদের থেকে একশ মিটার দূরে একটি টিলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছি। বন্য বরাহগুলো দল বেঁধে ঝোপ-ঝাড় উল্টিয়ে যখন ছুটে যায় তখন ছায়েমা ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে। আমি তার কাণ্ড দেখে মুচকি হেসে বললাম, এই দেখলাম বাহাদুরী! কত বড় পালোয়ান! হায়েনার পদচারণায় কবুতর ছানার মত কাঁপছে। আমি তার বক্ষ দেশে হাত স্থাপন করে দেখি তার বক্ষে কে যেন হাতুড়ী পিটাচ্ছে। সে আমার হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বলল, ইস্ বরফের মত ঠাণ্ডা হাত। আবার শয়তানী। আমি বললাম, "আরে এটা শয়তানী নয়। দেখলাম বীরাঙ্গনা ছায়েমার বক্ষদেশে হাতুড়ী

পেটার অবস্থা। জিহাদ করা এত সহজ নয়। অনেক কঠিন। জিহাদের ময়দানে ভয়, ক্ষুধা, ক্লান্তি আর পেরেশানী হচ্ছে নিত্যদিনের সাথী। এসব ভয়ভীতি আর অসুবিধার সাথে বুক টান করে মোকাবেলা করে বিজয়ী হতে হবে। মনে কর, তোমার আশ-পাশে সাহায্যকারী কেউ নেই। দুশমন তোমাকে ঘিরে আছে। সে দুশমন চাই মানুষ হোক, চাই বনের হিংস্র কোন প্রাণী হোক, তখনো তোমাকে হতবুদ্ধি হলে চলবে না, ঘাবড়ালে চলবে না। সে সময় মনে করবে মহান রাব্বুল আলামীন আমার সাথে আছেন, তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। এর চেয়ে বড় আর কোন মদদগার নেই। এ ধরনের বিশ্বাস রেখে তোমাকে একাই লড়তে হবে। তোমার দেহের মালিক আল্লাহ্। হায়াত আর মওতের মালিকও আল্লাহ্। তুমি হাজার চেষ্টা করেও দুনিয়াতে থাকতে পারবে না। এক সময় না এক সময় তোমাকে চলে যেতেই হবে। কাজেই সে মৃত্যুটা যদি তোমার আল্লাহ্র জন্য হয় তবে কতই না উত্তম, কতই না মঙ্গল। এসব ভেবে তুমি যদি মরণ পণ আক্রমণ কর তাহলে দুশমনের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হবে। তাদের হৃদকম্পন আরম্ভ হবে। তখন এক সময় দেখবে দুশমন ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

অনেক সময় আমি ক্লান্ত হয়ে যেতাম। তখন প্রথম ছায়েমা (শহীদ রহ.) আমাকে সাহস জোগাত, হিম্মত দান করত। এমন কি সে একাই আক্রমণে চলে যাবে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে যেত, তখন বাধ্য হয়েই আমি আমার অলসতা আর ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে তার সাথে ছুটে যেতাম। অনেক সময় তাকে কোথাও রেখে চলে যেতে হত নিরুদ্দেশে। কেটে যেত মাসের পর মাস। তখনও সে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। সে নতুন নতুন মুজাহিদ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে দুশমনের ঘাঁটিতে হামলা করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসত। তার প্রতিটি হামলাই ছিল রহস্যে ঘেরা। তার এবাদাত-বন্দেগীর কথা আজও ভুলতে পারিনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও প্রায় সময় দেখতাম ঘন্টার পর ঘন্টা নামাযে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে। কখনো তাকে দেখিনি অলসতা করতে। হয়ত তিলাওয়াত, না হয় নামায, অথবা যিকিরে মশগুল থাকত। আবার শরীয়তের মাসআলা, মাসায়েল জিজ্ঞাসা করে আমাকে পেরেশান করে তুলত। আমার মধ্যে যে সামান্য এলেম ছিল, তা সে বহুবার ছিনিয়ে নিয়েছিল। অর্থাৎ, যে কোন একটা বিষয়ের উপর যত ধরনের মাসআলা আছে তা একাধিকবার জিজ্ঞাসা করে জেনে নিত। যেমন পাক-নাপাকের মাসআলা, হালাল-হারামের মাসআলা, পর্দার মাসআলা। ভয়কালীন সময়ে কিভাবে নামায পড়তে হয়। জিহাদের ময়দানে কি করে নামায আদায় করতে হয়। বন্দীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হয়। এসব ছাড়াও অনেক ধরনের মাসআলা জেনে নিত। অনেক সময় মনে হত আমরা মাদ্রাসায় অবস্থান করছি।

ছায়েমা বলল, "প্রিয় খোবায়েব! আমি কি তোমার প্রাক্তন ছায়েমার মত হতে পারব না?"

"চেষ্টা করলে পারবে না কেন, অবশ্যই পারবে।"

"আমি কিছু জানতে চাইলে রাগারাগি হয় না যেন।"

"রাগ করবো কেন? মাসআলা জানবে তো ভাল কথা।"

এতক্ষণে রাত প্রায় শেষ। শেষ রজনীর তারকাটা পূর্ব আকাশে উদিত হয়ে অনেকটা উপরে চলে এসেছে। একটু পরেই সুবহে সাদিকের রেখা পূর্বাকাশে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। আমি আস্তে আস্তে সাথীদের জাগিয়ে দিলাম শেষ রজনীর দু'চার রাকাত নামায আদায় করে নিতে।

সাথীরা ঘুম থেকে উঠে আমার আর ছায়েমার দিকে তাকিয়ে দেখে আমাদের কম্বলের উপরে শ্বেত বর্ণের বরফের আস্তর লেগে আছে। একজন চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, "আয় আল্লাহ্! আমাদের মাফ করো। আমরা সারারাত বেহুঁশ অবস্থায় আরামে ঘুম গিয়েছি। আর আমাদের প্রাণপ্রিয় কমান্ডার ও নওমুসলিম বোনটি হাড় কাঁপানো শীতে সারারাত দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছেন।" তার কথা শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে কে যেন বলল, "আরে, নওমুসলিম বোন নয়, ভাবী।" ওর কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠল। এমন কি ছায়েমার মুখেও বিদ্যুতের ঝলকের ন্যায় হাসি খেলে গেল।

তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে সাথীরা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাত দুটি প্রসারণপূর্বক বলতে লাগল, "ও গো আমার মাওলা! রাহমানুর রাহীম খোদা! তোমার নাফরমানিতে আমরা দিন রাত হাবুডুবু খাচ্ছি। তোমার দয়া ছাড়া তা থেকে উদ্ধারের আর কোন গত্যান্তর নেই। ওগো আমার মাওলা! শয়তান আমাকে তার কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছে, এখন গোনাহ ছাড়া কোন নেক কাজ করতে পারি না। তোমার দয়া আর অনুগ্রহ যদি আমাদের পক্ষে না থাকে তাহলে আর কোনদিন শয়তানের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। অতএব তোমার রহমতের হস্ত প্রসারণ করে আমাদের উদ্ধার কর। ওগো রাহ্মানুর রাহীম! তোমার হুকুম জিহাদ আমরা ভুলে গেছি। তোমার পথে রক্ত দেয়া নেয়া ছেড়ে দিয়েছি। শাহাদাতের তামান্না দিল থেকে দূরে সরে গেছে। দুনিয়ার মহাব্বত আর মউতের ভয় আমাদের ঈমানী শক্তিকে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছে। যার কারণে তোমার দুশমনের সামনে বুকটান করে দাঁড়াতে পারি না। তাই চারদিক থেকে একমাত্র তোমারই খাছ বান্দাদেরকে হত্যা করছে। প্রভু হে! আমরা মাত্র কয়েকজন গোনাহগার বান্দা জিহাদী প্রোগ্রাম নিয়ে পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুশমনের তুলনায় আমাদের হাতে কিছুই নেই।

মাওলা গো! তুমি যদি এ কয়জন মুজাহিদকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেল, তাহলে জিহাদের নাম নেয়ার মত কেউ থাকবে না। অতএব তুমিই আমাদের কমান্ডার হয়ে আমাদের পরিচালিত কর। তুমি আমাদের রাহাবর হয়ে সরল পথে নিয়ে চল। আমরা তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আমাদের প্রিয় জান আর মাল তোমারই হাতে সঁপে দিয়েছি। দয়া করে এগুলো তুমি কবুল করে নাও। তোমার পথে জীবন দিতে আমাদের সাহায্য কর। আমীন! ইয়া রাব্বুল আলামীন।”

তাদের মোনাজাত ছিল কান্না মিশ্রিত। সে সময় অশ্রুর প্লাবনে পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত হচ্ছিল। আমিও অদূরে দাঁড়িয়ে আমীন! আমীন! বলে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলাম। ছায়েমার অবস্থাও ছিল একই ধরনের। মোনাজাত শেষে ছায়েমা বলল, “এভাবে প্রার্থনা করলে নিশ্চয় আমরা বিজয়ী হব। আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। আমি কোনদিন দেখিনি গির্জার মধ্যে কোন ধার্মিক পাদ্রীকে এভাবে রোনাজারি করতে। এভাবে প্রার্থনা করতে। আজকের এ কান্নার দৃশ্য দেখে আমার ঈমান আরো মজবুত হয়েছে। আমার শরীর বেমালুম সুস্থ হয়ে গেছে। মহা আনন্দে আমার দিল ছুটাছুটি করছে। অনাবিল শান্তিতে আমার অন্তর কানায় কানায় ভরে গেছে। এ ধরনের প্রশান্তি জীবনে কোনদিন উপভোগ করিনি। সত্যি আল্লাহ্ যে কত মহান, এর মধ্যে কণা-পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। হে প্রভু! সত্যিই তুমি মহান, প্রজ্ঞাময়।”

এদিকে সাথীরা ফজরের নামাযের জন্য তৈরী হচ্ছে। আমি বললাম, “তোমরা নামায পড়ে নাও। আমি পাহারায় আছি।” ওরা নামায পড়ে দু'জন পাহারায় আসলে আমি ছায়েমাকে নিয়ে খিমায় চলে গেলাম। ওকে আমার পিছনে দাঁড় করিয়ে নামায পড়লাম। সে আমার অনুকরণ করল।

অতঃপর সাথীদের বললাম, “তোমরা খানা তৈরী কর কিন্তু ধোঁয়া যেন কোনক্রমেই জমাট হয়ে উপরের দিকে না উঠে। কারণ, এখানে ধোঁয়া দেখে দুশমনরা ক্ষেপণাস্ত্রে আঘাত হানতে পারে।” এই বলে আমি ছায়েমাকে নিয়ে আমার খিমায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল ১০ টায় ঘুম থেকে উঠে সবাইকে নাস্তা খাওয়ার নির্দেশ দিলাম। সবাই নাস্তা খাওয়ার পর টাকা দিয়ে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলাম দস্তগীরের কাছে। সে যেন ভাল ৮টি ঘোড়া কিনে দু'একটি করে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেয়। দশটি ঘোড়ার ব্যবস্থা হলেই আমরা অন্যত্র যাত্রা করতে পারব। দু'জন চলে গেল দস্তগীরের নিকট।

॥ তেত্রিশ ॥

আমরা উক্ত বনেই অবস্থান করতে ছিলাম। তিনদিন পর দস্তগীরসহ পাঠানো দুজন সাথী মিলে তিনটি ঘোড়া নিয়ে এল। ঘোড়াগুলো দেখে মন জুড়িয়ে গেল। দেখতে যেমন মোটাতাজা, তেমনি সুন্দর। আমি ঘোড়ার কপালে স্বস্নেহে হাত বুলালে ঘোড়াও আনন্দে নেচে উঠল। আমি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে বললাম, "ঘোড়াগুলো খুবই ভাগ্যবান। তা না হয় মুজাহিদদের কাছে আসত না। পরদিন দস্তগীরের সাথে পাঠিয়ে দিলাম অন্য তিনজন। ওরা পাঁচদিন পর এ ধরনেরই আরো তিনটি ঘোড়া নিয়ে আসল। আবার লোক পাঠালে আরো দু'টি ঘোড়া নিয়ে এল। একেকটার চেয়ে এক একটা সুন্দর কম নয়। সবাই খুব আনন্দিত।

ঘোড়া পেলাম আটটি, এর মধ্যে টাকা যা দিয়েছিলাম প্রায় সব টাকাই ফেরত পেলাম। কিছু টাকা কম। এত টাকা ফেরৎ আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওয়ায়েভ বলল, "আটটি ঘোড়া থেকে মাত্র দু'টি আমাদের কেনা। আর ছয়টি হল আর্মীদের।"

"আর্মীদের অশ্ব কি করে পেলে?"

"আর্মীদের আস্তাবল ঘাঁটি থেকে একটু দূরে। সেখানে পাহারাদার মাত্র দু'জন। আমি সে এলাকায় ঘোরাফেরা করে একটু সম্পর্ক কায়েম করেছি। তাহল আমি ছোলা ও ভূষির ব্যবসায়ী সেজে দু'জনের সাথে আলাপ করি। দর দাম সাব্যস্ত করি। আমি ছোলা ও ভূষির যে নমুনা দেখিয়েছি তা অন্যদের তুলনায় খুবই ভাল এবং দামেও অনেক কম। এ হিসাবে ওরা আমার নিকট থেকেই মাল নেয়ার ওয়াদা করেছে। তারপর আমি এক ঠেলা গাড়ি ছোলা, বুট নিয়ে আস্তাবলে পৌঁছে দিলাম। এতে ওরা খুবই খুশী।

পরদিনও এক ঠেলা বোঝাই করে ছোলা, বুট আর ভূষি নিয়ে গেলাম। তখন ছিল বিকাল পাঁচটা। ঠেলাওয়ালাকে তার ভাড়া দিয়ে বিদায় করে দিয়ে আমি রয়ে গেলাম আস্তাবলে। আলাপ জমিয়ে ফেললাম খুব মজা করে। ভাব জমল খুব বেশী। আমি চলে আসতে চাইলে ওরা বলল, "একটু পরে যাও, এখন গিয়ে কি করবে?" এভাবে বেজে গেল রাত আটটা।"

সে সময় একজন সৈন্য আস্তাবলের অপর পার্শ্বে গেল ঘোড়াকে ছোলা দিতে। এ সুযোগে আমি একটি রশি নিয়ে উল্টা দিক থেকে আমার পাশের সৈন্যটির গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিলাম। হায় যতই নড়াচড়া করে, ততই ফাঁস বেশী লাগে। এভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তার জীবন লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। তারপর আর একটি রশি হাতে নিয়ে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলাম

এবং উক্ত সৈন্যটির সাথে ঘোড়াকে ছোলা দিতে লাগলাম। এক পর্যায়ে ওর সাথেও এমন ব্যবহারটি করলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই, সবাই নিথর হয়ে পড়ে রইল। তারপর বেছে বেছে ছয়টি ঘোড়া নিয়ে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেলাম। এভাবে কয়েকটি দস্তগীরের খালার বাড়ি আর কয়েকটি তার বাড়িতে রেখে পালাক্রমে নিয়ে আসি। আর বাকি দু'টি বাজার থেকে খরিদ করে দিয়েছে দস্তগীর।

ওয়ায়েভের কথা শুনে আমি হেসে বললাম, "চুরি তো ভালই শিখেছ! মানুষ মারার কৌশলও ভালভাবে রপ্ত করেছ।" আমার কথা শুনে সে বলল, "কি বলেন খোবায়েব ভাই! মানুষ মারার পদ্ধতি কত প্রকার ও কি কি তা পবিত্র কুরআনে সুন্দর করে বলে দিয়েছেন। তাছাড়া কোথায় কিভাবে বানাতে হবে, কিভাবে ছাইজ করতে হবে এর সবকিছুই আল্লাহ্ তাআলা বলে দিয়েছেন।"

আমাদের প্রাণপ্রিয় কমান্ডার হযরত আনোয়ার পাশা শহীদ (রহ.) আমাদেরকে এ বিষয়ে খুব ভালভাবে তালিম দিয়েছেন। এখন তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু রয়ে গেছে তার শিক্ষা। আমরা যে কয়জন আছি, সবাই মিলে যদি সাথী তৈরী করে আবার কোমড় বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হই তবে আল্লাহ্ আমাদের মদদ করবেন। মানুষ হত্যা করা সবচেয়ে বড় গোনাহ। আবার আল্লাহ্র হুকুম মত মানুষ হত্যা করা সবচেয়ে বেশী সওয়াবের কাজ।

আমি সবাইকে এক সাথে জমায়েত করে বললাম, আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ও ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ্র জন্য পিতা-মাতা, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, বাগ-বাগিচা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে জিহাদের উদ্দেশ্যে চলে এসেছ। অনেকের যুবতী স্ত্রীরা স্বামীহারা বিরহ বেদনা বুকে নিয়ে সারারাত কেঁদে বালিশ ভিজাচ্ছে। আবার কারো কারো মাছুম বাচ্চারা আব্বু আব্বু বলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারো বৃদ্ধ জননী পুত্র শোকে কাতর হয়ে বুক চাপড়িয়ে বিলাপ করছে।

এ সবকিছুই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্কে রাজি খুশী করার জন্য। এর মধ্যে অন্যকিছুর দখল নেই। তোমরা তো পারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অঢেল সম্পদের মালিক হতে। তোমরা পারতে মোদাররেছি, ইমামতি করে চারটা ডালভাতের ব্যবস্থা করতে। ইচ্ছা করলে পারতে চাকরী করে খাওয়া পরার সুব্যবস্থা করতে। তোমরা তা করনি! তোমরা নিজের অমূল্য সম্পদ জানটি নিয়ে এসেছ আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে চিরশান্তির বেহেস্ত খরিদ করতে। আল্লাহ্ তোমাদের নেক বাসনা কবুল করান।

হে আমার প্রিয় সাথীরা! এখানে আমাদের দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। এর মধ্যে কোন ধরনের হামলা করতে পারিনি। তাছাড়া তোমরাও ছিলে দুর্বল ও অসুস্থ। এখন তো দু'একজন ছাড়া প্রায় সবাই সুস্থ। এখন আর বিশ্রাম নেয়া আমাদের পক্ষে জায়েয মনে করি না। আর এখানে বসে কোন আক্রমণ করা এ মুহূর্তে সঙ্গতও মনে করি না। কারণ পরপর বেশ কয়েকটি হামলা হয়ে গেছে। এর মধ্যে গির্জায় হামলা, বনে হামলা, থানায় হামলা, মেরীকে মুক্ত করা, ফাদারের মৃত্যু, আবার সেনাবাহিনীর ছয়টি ঘোড়া চুরি। এগুলো সাধারণ বিষয় নয়। একটিকেও হাল্কা নজরে দেখার মত নয়। এসব বিষয় নিয়ে নিশ্চয় হাই কমান্ডে আলোচনা হচ্ছে। কুকান্দুজের হামলার মত বড় ধরনের একটা হামলার আশংকা করছি। এর আগে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার।

আর আমরা যা করছি তা কিন্তু গেরিলা হামলার উসুলের খেলাফ। গেরিলা হামলার উসুল হল ঃ (ক) এক সাথে একই স্থানে বেশীদিন না থাকা, (খ) আবার হঠাৎ হামলা করে হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়া, (গ) যেদিক দিয়ে হামলা করবে তার বিপরীত দিকে আশ্রয় নেয়া, (ঘ) যেখানে হামলা হবে এর ১৫-২০ মাইল দূরে চলে যাওয়া, যেন কল্পনা করতে না পারে যে, কোন দিক থেকে হামলা আসছে। এদিক লক্ষ্য করলে কিন্তু আমরা বেউসূলের উপর আছি। কাজেই বিলম্ব না করে অন্যত্র যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়া দরকার। এদিকে ছায়েমা প্রশ্ন করে বসল, "কোন ফাদার নিহত হয়েছে প্রিয়তম?"

ওর প্রশ্নের উত্তর দেব কি দেব না তা নিয়ে ঘাবড়ে গেলাম। কারণ সে যদি তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ পায়, তবে কোন অবস্থা হয় তা নিয়ে ভাবছিলাম। অবশেষে বলেই ফেললাম যে, তোমার ফাদার।

একথা শোনার সাথে সাথে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল, "জয় হোক যীশুখৃস্টের, জয় হোক পলের।" এতটুকু বলেই সে জিহ্বা কামড়ে ধরল এবং মস্তকে কর স্থাপনপূর্বক বলল, "তওবা! তওবা! আমি ভুল করে ফেলেছি, আল্লাহ্ মাফ কর। তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, তোমারই সব তারিফ। আমার ধোঁকাবাজ, জালেম পিতার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত খুশী।"

উপস্থিত মুজাহিদরা মেরীর কথা শুনে হেসে ফেলল। সে লজ্জা পেয়ে দৌড়ে আমার খিমায় আশ্রয় নিল। তারপর আল্লাহ্র শোকর আদায় করার লক্ষ্যে দু'রাকাত নামাযের অভিনয় করল। অর্থাৎ সোবহানাল্লাহর নামায পড়ল।

তারপর আমি একজন একজন করে জিজ্ঞাসা করলাম কে কে অশ্ব চালাতে জানে। সোবহানাল্লাহ্! সবাই বলল, "আমি পারি, আমি পারি।" কেউ বাদ

যায়নি। তারপর আমি বললাম, "হ্যাঁ, তোমরাতো সবাই দেখি ঘোড়সওয়ারীতে পারদর্শী। ভিক্ষুকরাও ঘোরসওয়ারী। ওরা অশ্বের পিঠে বসে থাকে আর অশ্ব তার ইচ্ছামত চলতে থাকে। এমন শাহসওয়ারী তো আমাদের মেরীও। দেখলে না দস্তগীরের বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল।

আমার কথা শুনে এক মুজাহিদ বলল, "আমাদেরকে আমাদের ভাবীর সাথে তুলনা দিচ্ছেন, আশা করি এর চেয়ে একটু ভালই পারব, দু'চারগজ হলেও এগিয়ে থাকব।" তার কথা শুনে আমি বললাম, "এটা মজাক করার কথা নয়। তোমরা যারা শাহ্সওয়ারীতে পারদর্শী না, বা সামরিক বিদ্যা জান না, তাদেরকে জরুরীভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যেমন, বাতাসের আগে ঘোড়া ছুটানো। খাল, বিল, নদী, নালা পেরিয়ে যাওয়া। পাহাড়-পর্বতে উঠানামা কিভাবে করতে হয়, দুশমনের এলাকায় কিভাবে প্রবেশ করতে হয়, বিমান আসলে কিভাবে চার ঠ্যাং উপরে তুলে দূরবীনের চোখে ধাঁধা লাগানো হয়। সরু পথে, বাঁকা পথে, প্রশস্ত পথে, কাদা, কাঁকর, বালি ও পাথুরে পথে কিভাবে চলতে হয় তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখতে হবে। এতে তোমাদেরও শেখার রয়েছে আর ঘোড়ারও। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়া আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্য এ দু'এর সংমিশ্রণে যুদ্ধের ময়দানে বিজয় আনা যায় তাই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি।"

আমার কথা শেষ হলে ইবনে রবি বলল, "মাননীয় সিপাহ সালার! আপনি যা যা বলছেন তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আপনার সম্মুখের সব সৈন্যরা। আমরা সবাই শাহসওয়ারীর উপর পি,এইচ,ডি নিয়েছি আনোয়ার পাশার নিকট। এখন আমাদের থেকে পরীক্ষা নিতে পারেন। আমরা পরীক্ষা দেব ঠিক, কিন্তু ভাবী...?" সবাই হেসে কুটপাট। আমি বললাম, ওর জন্য তো আমিই যথেষ্ট। দু-চার দিনে তাকে কমপ্লিট করে দেব।

আমাদের কথোপকথন শুনে ছায়েমা কম্বল মুড়ি দিয়ে খিমা থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁঝাঁলো কণ্ঠে বলল, "আমাকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে বুঝি! আমি আঁতুর ঘরের খুকী নই যে ঘোড়া দৌড়াতে শিখিনি! এই বলে এক লম্ফে একটি অশ্বে সওয়ার হয়ে চলে গেল বহুদূর। আবার ফিরে এসে বলল, এবার দেখ পরীক্ষা কারটা আগে হয়েছে।" আমরা সবাই অবাক! সে যে এতটুকু এগিয়ে আছে তা কল্পনাও করিনি। সকলের অন্তরেই আনন্দ ঢেউ খেলছিল। তারপর আমরা পরামর্শ করে বন পাড়ি দিয়ে ওপারের লোকালয়ে যাওয়ার জন্য নিজ নিজ ছামানা গুছিয়ে নিলাম। তারপর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এগিয়ে চললাম।

॥ চৌত্রিশ ॥

আমাদের রাহাবর হিসাবে ওয়ায়েভকে দায়িত্ব দেয়া হল। কারণ বন জঙ্গলের ধারণা আমাদের চেয়ে ওয়ায়েভের অনেক বেশী। ওয়ায়েভ বলল, "খোবায়েব ভাই! রাহাবর বলে পথপ্রদর্শককে, প্রদর্শকের জন্য প্রয়োজন পথের। এখানে তো পথই নেই। এ হিসাবে আমার নাম দেয়া হোক জঙ্গল প্রদর্শক।" ওর কথা শুনে কেউ হাসি চেপে রাখতে পারেনি। সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি বললাম, "সত্যিই তো। তুমি জঙ্গল প্রদর্শক। আমাদেরকে যেদিকে নিয়ে যাবে, আমরা সেদিকেই যাব।"

কাফেলা চলল বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে। এর মধ্যে ছোট বড় বেশ কয়েকটি নদীও পেরুলাম। এতক্ষণে এমন এক দুর্গম এলাকায় এসে উপনীত হলাম যা অতিক্রম করার সাধ্য নেই। কারণ আকাশ চুম্বি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত পর্বতমালা। এ অঞ্চলে কোন প্রাণী আছে কি-না তা আল্লাহ্ই জানেন। এ অঞ্চলে শীতও খুব বেশী। পাথরের উপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে হাঁটা অসম্ভব। একটু পা পিছলে গেলে আর রক্ষা নেই। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঘোড়াগুলো খুব দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ক্ষুধার তাড়নায় জীবন যায় যায়। চলার শক্তি ঘোটকেরা হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের এ অবস্থা দেখে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলাম। কাফেলা পর্বতশৃঙ্গে যাত্রা বিরতি দিল। আমরা অশ্ব পৃষ্ঠ খালি করে বাগডোরমুক্ত করে দিলাম। এরা লতাপাতা টেনে উদর পূর্ণ করতে লাগল। আমরা শেষ সময়ে আসর পড়ে নিলাম। তারপর তাঁবু তৈরী, পানি, জ্বালানী সংগ্রহ ও রান্না বান্নার জন্য লোক ভাগ করে দিলাম। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। আমি ছায়েমাকে নিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু দূরে লতাগুল্মের আড়ালে বসে নামাযের তালিম দিতে লাগলাম। মাগরিবের আগেই তাকে অর্থসহ সূরা ফাতিহার তিনটি আয়াত সহীশুদ্ধভাবে মুখস্ত করালাম। ছায়েমার কয়েকটি বিষয়ের উপর আমি এতই খুশী হলাম যা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এর মধ্যে হল ঃ (১) পবিত্র কুরআনের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা; (২) প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ জানার আগ্রহ; (৩) আমি যেভাবে যে শব্দটি মশ্‌ক করেছি, সে শব্দটি সে হুবহু ঐভাবেই উচ্চারণ করেছে; (৪) এবং তার অপরিসীম স্মরণ শক্তি। এসব ব্যাপারে আমি তার প্রতি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। এভাবে সে যদি তালিম গ্রহণ করে তবে খুব অল্প সময়ে শরীয়তের অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারবে।

অতঃপর আমরা জামাতের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তারপর কার কতটুকু কাজ বাকি আছে তা জানতে চাইলে একজন বলল, খিমা

খাটানোর কাজ প্রায় শেষ। অল্প একটু বাকি আছে তা এখনই শেষ হয়ে যাবে। জ্বালানি সংগ্রহ হয়ে গেছে, উনুন তৈরীও শেষ। এখন শুধু পানির অপেক্ষায় আছি। পানি নিয়ে সাথীরা এখনো পৌঁছেন নি। পানি ওয়ালারা এখনো পানি নিয়ে না আসাতে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। ওরা মশ্‌ক নিয়ে কোনদিকে গেছে তা কেউ বলতে পারেনি।

উছায়েদ বলল, "খোবায়েব ভাই! এ অঞ্চলে শ্বেত ভালুকের খুবই উপদ্রব। আমরা যখন লাকড়ি আনতে গেছি তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ওদেরকে চলাফেরা করতে দেখেছি। ভালুকগুলো আকৃতিতে তেমন বড় না হলেও খুবই হিংস্র। আমাদেরকে দেখে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের দিকে আসতেছিল। আমরা অস্ত্র তাক করলে ওরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। এতে বুঝলাম ওরা হাতিয়ারকে খুবই ভয় পায়।"

উছায়েদের কথা শুনে আমার দিলে সন্দেহের সৃষ্টি হল। বারবার দিল সাক্ষী দিচ্ছিল যে, এতক্ষণে হয়ত তাদের প্রাণবায়ু দেহ পিঞ্জির ত্যাগ করেছে। তাছাড়া বিলম্বের কোন কারণই থাকতে পারে না। পানি পাক বা নাই পাক এতক্ষণে অবশ্যই ফিরে আসত। তারপর জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, অনেকের ধারণা এমনটিই। কে কে পানি সংগ্রহে গিয়েছিল তা জানতে চাইলে ওয়ায়েভ বলল, "জনাব! আপনিই তো পানির জন্য পাঠিয়েছিলেন ভাই হাম্মাদবেগ ও ইবনে রবিকে।"

এদিকে পানির অভাবে রান্না বান্নার কাজ একদম বন্ধ। আমি ওয়ায়েভের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম পাঠিয়ে দিলাম পানি সরবরাহ টিমকে খুঁজে আনার জন্য। ওরা রাইফেল, স্টেনগান ও ক্লাসিনকভ নিয়ে, বিপুল সংখ্যক গোলা বারুদ আর গ্রেনেড নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওরা বিদায় লগ্নে বলে গেল, "খোবায়েব ভাই! আমাদের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। যেভাবেই হোক আমরা তাদের সন্ধান না করে মোর্চায় ফিরে আসব না। হয়ত দুদিন দেরীও হতে পারে।" আমি বললাম, "তোমরা সবাই লাইট, দূরবীন ও ওয়ারলেছ সাথে নিয়ে যাবে। প্রতি ঘন্টায় তিনবার সংবাদ দেবে।" ছায়েমা বুদ্ধি করে কিছু শুকনো খাবার, যেমন ছাতু, খুরমা ও কিসমিসের একটি গাঠরী তৈরী করে বলল, "জনাব! এগুলো ওদেরকে দিয়ে দেন। তাছাড়া খাবে কি?" আমি তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ওগুলো সাথীদের দিয়ে দিলাম। কাফেলা ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মোর্চার অন্যান্য সাথীরা ক্ষুদ-পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করছিল। তাদের এ অবস্থা দেখে উছায়েদকে বললাম, "তুমি দু'জন সাথী নিয়ে বরফের শীলা গুঁড়া

করে কৃত্রিম উপায়ে পানি তৈরী কর। এ পানি আপাতত তৃষ্ণা ও রান্না বান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে।" উছায়েদ আমার কথামত ৮/১০ মিনিটের মধ্যে কিছু পানি তৈরী করে ফেলল। তার সব সাথীদেরকে ছাতু ও খুরমা খেতে বললাম। সবাই দু'এক মুঠো ছাতু আর খুরমা খেয়ে পানি পান করে জঠর জ্বালা নিবারণ করল। তারপর সাথীরা আস্তে আস্তে রুটি তৈরী করে সবাই মিলে খেল। সাথীরা সবাই ক্লান্ত। পাহারাদারী করার হিম্মতও হারিয়ে ফেলেছে ওরা। তাই এশার নামায আদায় করে বললাম, "বন্ধুরা তোমরা এক ঘন্টা খিমায় বসে সতর্কতার সাথে গল্প গুজব করে কাটিয়ে দাও। আমি এক ঘন্টা একটু ঘুমিয়ে নেই। তারপর আমি সারারাত পাহারা দেব, তোমরা চোখ ভরে ঘুমাবে।" ওরা তাই করল। আমি আর ছায়েমা ছোট্ট-খিমায় শুয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।

এক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। অতঃপর সাথীদেরকে শুইয়ে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলাম। আনুমানিক রাত একটার দিকে বিস্ফোরণের আওয়াজে রাতের নীরবতা ভেঙ্গে গেল। এ শব্দে ছায়েমার ঘুমও ভেঙ্গে যায়। সে আঁধারে আমার শয্যা তালাশ করে আমাকে না পেয়ে খোবায়েব বলে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। আমি তাকে ডেকে বললাম, "ছায়েমা! আমি পাহারা দিচ্ছি। এসো, এদিকে এসো।" আমার ডাকে কোন সাড়া দেয়নি ও। এক চিৎকারে নীরব হয়ে যাওয়াতে বুঝলাম এ আর কিছু নয়, স্বপ্নের ঘোরে সে চিৎকার দিয়েছে।

বিশ মিনিট পর আবারো ডাকলাম, ছায়েমা! এসো দু'জনে মিলে পাহারা দেই। কিন্তু এবারও তার কোন সাড়া মেলেনি। ছায়েমার ঘুম তো অনেক হাল্কা। কোন কিছুর সামান্য শব্দ পেলেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাহলে আজ কি হল তার! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা নিয়ে ভাবছি। তারপর আস্তে আস্তে খিমায় প্রবেশ করে লাইট ফোকাস করলাম এবং বললাম—আমায় বাদ দিয়ে খুব মজা করে ঘুমাচ্ছ দেখি সুন্দরী! উঠ, তোমার প্রেমাস্পদ তোমার শিয়রে খাড়া। আঁখি মেলে চেয়ে দেখ। এসব বলে ডাকাডাকির পরও তার আঁখি খুলেনি। অগত্যা আমি হাত ধরে টান দিলাম, তারপর বুঝতে পেরেছি সে প্রকৃতস্থ নয়, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। আমি তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে চাইল সে। আমাকে দেখামাত্র তার দু'বাহুতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "প্রিয় খোবায়েব! কিসের এক বিকট শব্দ শুনে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তোমাকে তালাশ করতে গিয়ে দেখি শয্যা শূন্য। তখন বুঝতে পেরেছি সে আমাকে ঘুমন্ত রেখে দুশমনের সাথে লড়াই করতে চলে গেছে। জানি না ফিরে আসে কি-না। তোমার এ

বিরহ-যাতনা সইতে না পেরে বুক ফেটে বেরিয়ে আসে গগনবিদারী কান্না। তারপর আর কিছুই বলতে পারিনি।"

আমি বললাম, "তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কর সুন্দরী?"

সে বলল, "এটা অবিশ্বাস নয়। আবেগ।"

রাত ১২টা পর্যন্ত ওয়ারলেছের যোগাযোগ ঠিক মত ছিল। ১২টায় ওয়ারলেছে জানতে পেরেছি এখনো ওদের সন্ধান পায়নি। ১২টার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আর কোন সংবাদ না পেয়ে খুব পেরেশান উপলব্ধি করতেছিলাম। তারপর বিস্ফোরণের আওয়াজে আরো বেশী বিচলিত হয়ে গেলাম। শব্দে বোঝা যাচ্ছিল এটা গ্রেনেট বা ডিনামাইটের আওয়াজ। কোন গোলাগুলীর শব্দ নয়। কেন হল কি হল তা জানতে না পেরে চিন্তার সীমা রইল না।

রাত পোহায়ে ভোর হল। ভোর পেরিয়ে দুপুর, তবু কোন বার্তা আসেনি। বিকাল দু'টায় তিনজন সহীসালামতে অক্ষত অবস্থায় মোর্চায় ফিরে এল। তারপর নামায ও খানা পিনা সেরে ওয়ায়েভ তাদের কারগুজারী শুনাতে গিয়ে বলল, "আমরা মোর্চা থেকে বেরিয়ে অকূল অরণ্যে ঘুরতে লাগলাম। কারণ ওরা কোনদিকে গিয়েছিল আমাদের নিকট স্পষ্ট ছিল না। তাই এলোপাথারী খুঁজতেছিলাম। নেই রাস্তা, নেই চলার মত একটু ফাঁকা জায়গা। লতা-গুল্মে ভরে আছে সমস্ত কান্তার। নিচে সাপ, আর গাছে গাছে শ্বেত ভালুক। এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছি। হাঁটতে হাঁটতে যখন সাথীরা ক্লান্ত হয়ে জমিনে পড়ে যাওয়ার উপক্রম, তখন বাধ্য হয়ে যাত্রা বিরতি দিলাম। এ এলাকায় অন্য এলাকার চেয়ে বন-জঙ্গল একটু হাল্কা ছিল। তাই এখানেই রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি দু'জনকে শোয়ায়ে দিয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি শত শত ভালুক এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। লাইট ফোকাস করলে এরা আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে হা করে এগিয়ে আসে যখন দেখলাম এক্ষুণি এরা একযোগে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। তখন বাধ্য হয়ে গ্রেনেডের রিং মুক্ত করে, 'ওয়ামা রামাইতা ইজ রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা' বলে গ্রেনেড নিক্ষেপ করলাম। সাথে সাথে বেশ কয়টা মারা গেল আর বাকিরা হুমড়ি খেয়ে চোখের পলকে কোথায় জানি মিলিয়ে গেল। তারপর আমরা নিরাপদে রাত কাটিয়ে দিলাম।

আজ ভোরে আবার তালাশ করতে লাগলাম কিন্তু কোন পাত্তা মেলেনি। নিরাশ হয়ে আমরা ভিন্ন পথ ধরে মোর্চায় ফিরে আসার পথে চেয়ে দেখি দু'জনের লাশ পড়ে আছে। পার্শ্বে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে আছে পানির খালি মশক ও তাদের অস্ত্রগুলো। তাদের শরীরে কোন যখম দেখিনি। মনে হয় বিষধর

সাপে দংশন করেছে। অথবা ভালুকে কেতুকুতু দিয়ে শহীদ করেছে। আমরা তাদের নামাযে জানাযা পড়ে অস্ত্রগুলো নিয়ে ফিরে এসেছি। দুঃখের বিষয় দাফন করার কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি।" ওয়ায়েভের কথা শুনে আমরা খুব দুঃখভরা মন নিয়ে তাদের মাগফেরাতের দোয়া করলাম।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

রেডিও সংবাদে জানতে পারলাম, মিকাইলী শহরের দিকে দিকে বলসেবিকদের জুলুম-অত্যাচার খুব বেশী বেড়ে গেছে। সেখানকার মুসলমানরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল হারেছ মিকাইলীর কথা। তাঁর মেয়ে মাহমুদা মিকাইলীর কথা। আহা! বেচারা কতই না ভাল মানুষ, মুজাহিদদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও হিতৈষী। আড়ালে থেকে মুজাহিদদের কাপড়, ঔষধ, খাদ্য ও অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করতেন। তার মেয়ে মাহমুদা আমার কতই না খেদমত করেছিল। বিদায় বেলা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছিল। সে দৃশ্যগুলো আজও ভুলতে পারিনি। দিলের মধ্যে পাথরাঙ্কিত নকশার ন্যায় দাগ কেটে আছে।

আমার কথা শুনে ওয়ায়েভ জিজ্ঞাসা করল, "খোবায়েব! আপনি যে হারেছ মিকাইলীর কথা বলতেছেন, তিনি কি রাওয়ান্ডের অধিবাসী? না অন্য কোথাকার?"

"তোমার প্রশ্ন আমি কিছুই বুঝি না। কারণ রাওয়ান্ড আর মিকাইল তো একটাই জানি।"

"না হযরত, মিকাইল হল থানার নাম, আর রাওয়ান্ড হল গ্রামের নাম। উক্ত থানার অধিবাসীদের নামের শেষে মিকাইলী বলে ডাকা হয়।"

"অ...আচ্ছা, তাহলে আমি তা জানতাম না।"

"তাহলে হারেছ মিকাইলী যদি সেখানকার অধিবাসী হন তাহলে আমিও তাকে ভাল করে চিনি। তিনি আমাদের বহুত বড় উপকার করেছেন। তা সত্যিই ভোলার মত নয়।"

"তা কেমন, বলো তো শুনি।"

"হারেছ মিকাইলীর বাড়ী জৈন্তা নদীর পূর্ব অববাহিকায় অবস্থিত। তিনি সে এলাকার জন্য উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা। তিনি দ্বীনদার, দয়ালু ও দানশীল। জিহাদ ফান্ডে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছেন। তাছাড়া কাপড়, তাঁবু, পোষাক, খাদ্য ও ঔষধ দান করেছেন। তিনি অস্ত্রও খরিদ করে দিয়েছেন অনেক। তাঁর ১৪ বৎসরের ছেলে মাহমুদ আনোয়ার পাশা (রহ.) এর নিকট জিহাদের ট্রেনিং নিয়ে আমাদের সাথেই জিহাদ করে শাহাদাৎ বরণ করেন। আমরা সবাই এ ছোট

মুজাহিদকে ছোট ভাই এর চেয়ে বেশী আদর করেছিলাম। শাহাদাতের পর তার রক্ত থেকে মেশ্‌ক আম্বরের মত সুঘ্রাণ বেরিয়েছে। আমরাই তাকে অতি যত্ন সহকারে দাফন করেছিলাম। দাফনের পর তার কবর থেকেও সেরূপ খোশবু বের হয়ে গোটা এলাকা সুরভিত হয়েছিল। সে এলাকায় আমরা অনেক দিন অবস্থান করেছিলাম।

ওয়ায়েভের কথা শুনে বললাম, "হ্যাঁ, তুমি যে বর্ণনা দিয়েছ আর আমি মাহমুদা মিকাইলীর নিকট যা শুনেছি তা হুবহু মিল রয়েছে। আমি চাচ্ছি সে এলাকায় চলে যাওয়া, সেখানকার মুসলমানদের রক্ষা করা। সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি জানতে চাই।" আমার কথার উপর সবাই একমত হয়ে গেল। তারপর ওয়ায়েভকে বললাম, "ভাই! তুমি তো আমার চেয়ে প্রবীণ। পথ ঘাটও জানা আছে অনেক। সব এলাকা চষে বেড়াচ্ছো। তোমাকেই হতে হবে আমাদের রাহবর, এতে তুমি কি বল?"

আমার কথা শুনে ওয়ায়েভ একটি ম্যাপ বের করে গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ম্যাপে চোখ বুলিয়ে বলল, "ভাই খোবায়েব! বর্তমানে সম্ভবত আমরা (আঙ্গুলের ইশারায়) এ স্থানে আছি। আমার ধারণা সঠিক হলে এখান থেকে মিকাইলী পশ্চিম-উত্তর কোণে অবস্থিত। আমরা সোজা যদি যেতে পারতাম তাহলে দূরত্ব হত একশত ত্রিশ মাইল। সোজা যাওয়ার মধ্যে অসুবিধা রয়েছে প্রচুর। কারণ, এখানে দেখা যায় বিশাল পার্বত্য এলাকা ও অনেক নদী পেরিয়ে যেতে হবে। পর্বতের পর পর্বত আর নদীর পর নদী পার হওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এখানে বড় বড় তিনটি নদী রয়েছে আর ছোট রয়েছে অন্তত ১১টি। আমরা বনাঞ্চল পেরিয়ে লোকালয়ে পৌছলে সেখান থেকে বড় শহর পাওয়া যাবে দু'টি আর ছোট শহর পড়বে ১২টি। কাজেই সোজা যাওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। আর মনে হয় এভাবে যাওয়াও যাবে না। আর যদি উত্তর দিক দিয়ে যাই তাহলে ঘুরতে হবে কম পক্ষে ৫০ মাইল। তাই আমাদের মোট দূরত্ব দাঁড়াবে দুশ মাইল। আমরা যদি আরাম ও আছানির সাথে যাই, তাহলে অবশ্যই মঞ্জিল কায়েম করে যেতে হবে। আমরা যদি গড়ে ১৫ মাইল পথ দৈনিক চলি অর্থাৎ গড়ে ৫ মাইল পরপর মঞ্জিল কায়েম করি তাহলে তের থেকে চৌদ্দ দিন লাগবে মিকাইলী পৌছতে। কিন্তু আমাদের হাতে আরো কম পক্ষে দশদিন সময় বেশী রাখতে হবে। কারণ পাহাড়ী পথ কখনো সারা দিনে পাঁচ মাইল অতিক্রম করা যাবে, কখনো ১০/১২ মাইল। সমতল ভূমিতে পৌছলে তখন হয় দৈনিক ২০/২৫ মাইল যাওয়া যাবে। কোন মঞ্জিলে দু-তিন দিন বা তার চেয়েও বেশী অবস্থান নেয়া লাগতে পারে। এসব মিলিয়ে

পঁচিশ থেকে ত্রিশ দিনে সেখানে পৌছা যাবে বলে আশা রাখি। বাকি আল্লাহ্র ইচ্ছা। এখন আপনি মোরাকাবা, মোশাহেদা করে যে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা সে মোতাবেকেই আমল করব। এখন বলুন কি করবেন?" ওয়ায়েভের তথ্যবহুল আলোচনায় আমি খুবই অবাক হলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "ওয়ায়েভ! তোমাকে দেখছি ম্যাপ সম্মুখে নিয়ে একজন নজ্জুমের (গণকের) মত আলোচনা করে গেলে। যা বললে আসলেই কি তা সত্য?"

আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে উছায়েদ বলল, "সব সত্য না হলেও বার আনি অবশ্যই সত্য হবে। তিনি যা বলেছেন তা মুখস্ত বলেননি। তিনি আনোয়ার পাশার নিকট ভূমানচিত্রের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নিয়মিত ক্লাশ করে পরীক্ষাও দিয়েছেন। আনোয়ার পাশা (রহ.) জীবিত থাকাকালীন সময়ে সবগুলো হামলার ম্যাপ ওয়ায়েভের দ্বারাই করাতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হামলা করলে ম্যাপ তৈরী করতে হয় তা তো কোনদিন শুনিনি? দুশমনের এলাকায় যাব আর সুযোগ বুঝে হামলা করব। না পারলে ফেরৎ আসব। এর মধ্যে ম্যাপের প্রয়োজন কি? আমি তো এ পর্যন্ত কোন ম্যাপ তৈরী করিনি বা ম্যাপানুসারে হামলা করিনি। তাহলে কি আমার এগুলো হামলা হয়নি?"

আমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে ওয়ায়েভ বলল, "মাননীয় আমীর সাহেব! আপনার কথা শুনে না হেসে থাকতে পারবে এমন কোন মুজাহিদ আছে? আপনি এত বড় একজন মুজাহিদ, বাতেলের আতঙ্ক। আপনি মাঝে মধ্যে এমন কিছু কথা বলেন, যা সাধারণ সিপাইরাও বলবে না। ম্যাপ বা নক্সা ছাড়া আক্রমণ খুবই বিপদজনক। তাই সামরিক ডিপার্টমেন্টে নক্সা তৈরীর উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নক্সা করে হামলা করার অর্থই হল সুপরিকল্পিত আক্রমণ। এতে নিজেদের ক্ষতি কম হয় আর দুশমনের ক্ষতি বেশী হয়।" ওর কথাগুলো চিন্তা করে দেখলাম কথাগুলো খুবই সুন্দর, সত্য এবং বাস্তব। এ জন্যই যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়া আল্লাহ্ তাআলা ফরয করে দিয়েছেন। হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ নিয়মিত যুদ্ধের ট্রেনিং করেছেন।

অতঃপর ওয়ায়েভকে বললাম, "ভাই তুমি আমাদের রাহাবর। আমাদেরকে যেদিক দিয়ে ইচ্ছা সেদিক দিয়ে নিয়ে যাও। আশা করি এর মধ্যে কারো কোন দ্বিমত থাকবে না।" তারপর সবাই সম্মতি জানাল। পর পর যার যার অস্ত্রগুলো নিজ নিজ জিম্মায় রেখে বাকি তাঁবু, খাদ্য, রশি, গ্রাউন্ডশীট ও অন্যান্য ছামানা মালিকবিহীন দু'টি ঘোড়ার উপর বেঁধে দিয়ে কাফেলা সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। মুখে সকলের আল্লাহ্র নাম।

যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছি ঘন বন আরো বেশী ঘন দেখতে পাচ্ছি। রাহাবর আমাদেকে নিয়ে কখনো পাহাড় পাড়ি দিচ্ছে আবার কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাঁটার আঘাতে আঘাতে সাথীদের কেবলই বিরক্ত করে তুলছে। এসব কাঁটাগুলো কাপড় ছেড়া থেকে ক্ষমা করেনি। সারাদিন পথ চলে ঘোটকগুলো খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আসর নামাযের সময় আমরা যাত্রা বিরতি দিয়ে নামাযের ব্যবস্থা নিচ্ছি। এর মধ্যে অশ্বগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হতবিহ্বল হওয়ায় আমরা ভাবছিলাম, হয়তো সফরজনিত ক্লান্তির কারণে এ রকম করছে। আমরা সারিবদ্ধভাবে নামাযের মুছাল্লায় দাঁড়াচ্ছি। একজন ইকামত দিচ্ছিল। একটু দূরে কিসের একটা ভয়ঙ্কর শব্দ এল। অশ্বগুলো রশি ছিড়ে পালানোর উপক্রম। আমরা খুব তাড়াতাড়ি দু'রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরালাম। চেয়ে দেখি, ইয়া আল্লাহ্! শত শত বিশালাকৃতির বনমানুষ আমাদের ঘিরে ফেলেছে।

এক একটা মহিষের মত বড়, কালো পশমে শরীরে ঢাকা। দেখতে বানরের মত। কিন্তু হাঁটে পিছনের দু'পায়ে, সম্মুখের দু'পা দিয়ে হাতের কাজ করে। এরা এক গাছ থেকে অপর গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এরা যে শুধু গাছে গাছে চলে এমনটি নয়। মাটিতেও চলতে পারে সমান তালে। এরা গাছ থেকে লাফিয়ে পরে নাচতে লাগল আর হাততালি দিচ্ছিল। এরা আসলে আনন্দ করছে, নাকি খেলা করছে তা কিছুই বুঝতে পারিনি। প্রাণিগুলোর দৃষ্টি ছিল ছায়েমার দিকে। ওরা ছায়েমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকছে। তাদের নাচ আর হাততালিতে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করছে। এদের বিভিন্ন অশালীন অঙ্গ-ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে এরা অত্যন্ত নারী লোভী।

সাথীরা সব ভীতসন্ত্রস্ত। সবাই যার যার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। শুধু হুকুমের অপেক্ষায়। হুকুম পেলেই এক যোগে গর্জে উঠবে ৮টি হাতিয়ার। কিন্তু আমি হুকুম দেইনি, দেখি ওরা কি করতে চায়।

আমি একজনকে বললাম, "হাতিয়ার রেখে তুমি দশ-বিশ কদম তাদের দিকে এগিয়ে যাও তো দেখি ওদের মনোভাব কি তা বুঝি। একজন আমার কথামত একটু এগিয়ে গেল কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া দেখলামনা। তারপর ছায়েমাকে যেতে বললাম। ছায়েমা ভয়ে ভয়ে দু'চার কদম এগিয়ে যেতেই ওরা হাততালি আর নাচ আরম্ভ করল। আবার কোন কোনটি হাতের ইশারায় ডাকছিল। এবার কারো বুঝতে বাকি রইল না এসব প্রাণী যে কত বড় শয়তান।

ছায়েমা ফিরে আসার সময় তিনটি প্রাণী ক্ষিপ্ত গতিতে ছায়েমার দিকে এগিয়ে আসলে গুলি ছুড়ে একটিকে হত্যা করে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো

প্রাণী একজোট হয়ে গাছের বড় বড় ডাল ভেঙ্গে আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। যে সব ডাল ভাঙ্গতে লাগল এমন একটা ডাল ১০/১৫ জন মিলেও ভাঙ্গতে সক্ষম হব না। অবস্থা গুরুতর দেখে গুলির হুকুম দিয়ে দিলাম। আমরা অস্ত্র হাতে নেয়ার সাথে সাথে ওরা ভাগতে লাগল। এরই মধ্যে আমরা ১০/১২ টিকে হত্যা করে ফেলেছি। বাকি সব প্রাণী চলে গেল নাগালের বাইরে।

আমরা মাগরিবের নামায সমাপ্ত করে তাঁবু নির্মাণ ও রান্না বান্নার কাজ সমাপ্ত করলাম। তারপর আমরা একত্রে খানা খেতে বসলাম। ছায়েমা আমার তাঁবুর অভ্যন্তরে বসে খানা খাচ্ছে আর আমরা বাইরে। একজন সাথী বলল, "দুষ্ট প্রাণীরা তাড়া খেয়ে ভেগেছে।" অপরজন বলল, "ভেগেছে তো ভেগেছে পালের বড় বড় পাঠা কয়টি হারিয়েছে।" একজন বলল, "প্রাণীজগতে এদের মত ইতর আর খবিছ প্রাণী আছে কি-না তা জানা নেই।" অন্যজন বলল, "এদেরকে তো প্রায় মানুষের মতই দেখায়, আবার বুদ্ধিও মানুষের মত।"

খানার ফাঁকে ফাঁকে এসব আলাপ-আলোচনা চলছে। এর মধ্যে চারদিক থেকে ছোট বড় নানা আকারের পাথরের ঢিল আসতে লাগল। একটি পাথর এক সাথীর মাথায় আঘাত হানলে সঙ্গে সঙ্গে সে শহীদ হয়ে যায়।

আমরা নিরুপায় হয়ে চারদিকে ব্রাশ ফায়ার করতে লাগলাম। এবারও ওরা গগন ফাটা চিৎকার দিতে দিতে ছুটে পালাল। আমরাও ফায়ারে ফায়ারে দৌড়াতে লাগলাম। এবার তারা আক্রমণের সাধ বুঝতে পেরেছে। এবারও ১০/১৫টি প্রাণী আমাদের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাল। পিছনে চেয়ে দেখি ছায়েমাও আমার পিছু পিছু ফায়ার করতে করতে দৌড়াচ্ছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম, কি ব্যাপার? হিংস্র প্রাণীরাও দেখি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে অপহরণ করতে চাচ্ছে। এরা কি যীশু খৃস্টের ফোর্স নাকি? ছায়েমা লজ্জায় নতশিরে দাঁড়িয়ে রইল।

ছায়াদ শহীদ হয়ে গেল। তার রূহ জান্নাতে চলে গেল। আহা কি আনন্দ। আমরা রাত্রেই ছায়াদের মরদেহ সমাধিস্থ করলাম। দুশমন প্রাণীর আক্রমণের ভয়ে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। পাহারাদারী বণ্টন করতে চাইলে সবাই বলল, আজকের পাহারাদারী আমরা সবাই এক সাথে করব। কেউ ঘুমাব না। এ অবস্থায় কারো ঘুম হবে না। তারপর আমরা সবাই সারারাত জেগে থাকি। আল্লাহ্র রহমতে রাতে আর কোন আক্রমণ আসেনি।

॥ ছত্রিশ ॥

অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে আমরা ২৮ দিনে মিকাইলের ২০ মাইল পূর্ব দিকে কুহেস্তানের বনভূমিতে এসে আশ্রয় নিলাম। ওয়ায়েভ, উছায়েদসহ সবাই এ অঞ্চলটা খুব ভালভাবেই চেনে। এমন কি প্রতিটি গাছের সাথেও রয়েছে তাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব। কারণ আনোয়ার পাশা (রহ.) এ অঞ্চলে বহুদিন অবস্থান করেছিলেন। বহু শহীদের লাশ বক্ষে ধারণ করে কুহেস্তান গর্বিত। ইমাম শামেল (রহ.) অনেক সঙ্গী সাথী নিয়ে চির নিদ্রায় শায়িত এই বনে। আনোয়ার পাশার অনেক মুজাহিদরাও শুয়ে আছেন এই বনভূমিতে। এ হিসাবে এ স্থানটির মর্যাদা অন্যান্য স্থান থেকে অনেক বেশী।

মুজাহিদদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্যই মনে হয় হিংস্র প্রাণীরা এ অঞ্চল থেকে দূরে সরে গেছে। নেই সাপ, বিচ্ছু, নেই কাঁটা যুক্ত কোন গাছ। সচরাচর পিপিলিকাও বড় একটা নজরে পড়ে না। মাঝে মধ্যে দু'একটি খেজুর গাছ ও অন্যান্য ফলমূলের গাছও পাওয়া যায়। আমাদের আশ-পাশে যে কয়টি খেজুর গাছ দেখেছি সবকটির মধ্যে রয়েছে কাঁদি কাঁদি খেজুর। তবে পাকার সময় এখনো হয়নি। কুহেস্তানের বুক চিরে আঁকা বাঁকা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে খরস্রোতা আমুজান নদী। আনার নিংড়ানো পানির মত পানিগুলো টলমল করে। আমুজানের স্বচ্ছ পানির ভিতর দিয়ে হরেক রকম মাছ দৌড়াদৌড়ি করে, তা স্পষ্ট দেখা যায়।

আমরা অশ্বগুলো ছেড়ে দিয়ে একটু একটু পায়চারি করছি। ঘোটকগুলো মনের আনন্দে এক প্রকার লতানো ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে উদর পূর্ণ করতে লাগল। উছায়েদ আমাদের নিয়ে অনেকগুলো শহীদদের মাকবারা (কবর) জিয়ারত করল। প্রতিটি কবরের কাছে গেলেই মন আনন্দে ভরে যায়। তাদের কবরের সংযোগ রয়েছে জান্নাতের সাথে। এর বাস্তব নমুনা কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেই অনুমান করা যায়। ফুটন্ত কুসুমের সুরভিত সুষমায় কবর পাড়া উদ্ভাসিত। এসব কবরের পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করলেই হৃদয় থেকে গায়রুল্লাহ্‌র মহব্বত বিদূরিত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে চলে যায়। ছায়েমাও আমার সাথে ঘুরে ঘুরে তা অনুভব করছিল।

রাত্রে মিকাইলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য জরুরী পরামর্শে বসা হল। মিকাইল একটি থানা শহর। অনেক পূর্ব থেকেই এ শহরটি ছিল বলসেবিকদের দখলে। যদিও শহরটি এক সময় মুসলমানদের ছিল, এখন আর তা নেই। উক্ত শহরে প্রাচীন আমলের যে কয়টি মসজিদ ছিল তা আনোয়ার পাশার জীবদ্দশায়ই বলসেবিকরা শহীদ করে দিয়েছিল। তিনটি কওমী মাদ্রাসার মধ্যে একটিতেও তালিম হচ্ছে না। এসব মাদ্রাসাগুলোকে বলসেবিকরা তাদের ক্যাম্প বানিয়েছে।

এ কারণে এসব অঞ্চলে ঘোরাফেরা করা খুবই ভয়ের কারণ। সেখানে যাকে তাকে পাঠালে কাজ উদ্ধার নাও হতে পারে। তাই বিচক্ষণ ও সাহসী দু'জন ব্যক্তিকে পাঠানো হলে ভাল হবে। আমি এসব দিক আলোচনা করে নিজ নিজ মত প্রকাশের জন্য নির্দেশ দিলাম।

ওয়ায়েভ বলল, "মুহতারাম আমীর সাহেব! আমি মনে করি এ কাজের জন্য আমি আর উছায়েদই যথেষ্ট। পথঘাট আমরা ভাল করেই চিনি। তাছাড়া অনেক পরিচিত লোকও আছে আমাদের। আমরা প্রয়োজনে আড়ালে থেকেও তাদের দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব। থাকা খাওয়ারও তেমন একটা অসুবিধা হবে না।" ওয়ায়েভ আরো বলল—

"খোবায়েব ভাই! আমার খেয়াল হয় আমরা আপাতত কোন ঘাঁটি বা ছাউনীতে আক্রমণ করব না। ঘাঁটি বা ছাউনীতে আক্রমণ করার পূর্বে যে কয়জন মুনাফিক আছে তাদেরকে হত্যা করতে পারলে বিরাট ফায়দা হবে। মুনাফিকদের মাধ্যমে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তা বলসেবিক দ্বারা হইনি। এরা বেশ-ভূষায় গাউসুল আযম দস্তগীর আর ভিতরে মুনাফেকির ঘন অন্ধকার। আমরা দু'এক মাসে মাত্র দু'একটি মুনাফিক জবাই করব। কাজে খুব তাড়াহুড়া করব না। তাহলে আমাদের কাজ স্থায়ী হবে বলে আশা করা যায়। এভাবে কাজ করলে নিরাপত্তাও হবে বেশী। উজিরাবাদ থেকে এ পর্যন্ত আসতে অশ্ব পৃষ্ঠ খালি হল তিনটি। এখন একজন মহিলা সহ আমাদের সংখ্যা মাত্র সাতজন। কিছুদিনের মধ্যে যে সংখ্যার পরিবর্তন হবে না তা কেউ নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবে না। ভবিষ্যতে যে আমরা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারব, তারও কোন আশা নেই। আমার জানা মতে বর্তমানে গ্রাম-গঞ্জে ও শহর-বন্দরে মুজাহিদদের একজন মুবাল্লীগও নেই। এক সময় সে সব মুবাল্লীগগণ প্রতিটি মসজিদে মসজিদে ও মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় গিয়ে অগ্নিঝরা বয়ান করে, শহীদের ফাযায়েল আর জিহাদের ফাযায়েল বর্ণনা করে যুবকদের নাচিয়ে তুলতেন। যুবকরা তাদের বক্তৃতা শুনে পাগলপাড়া হয়ে জিহাদে ছুটে যেত, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। এভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার আমল চালু ছিল।

বলসেবিকরা চিন্তা করে দেখল যে, এত এত মুজাহিদ শহীদ করার পরও তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে না। তাহলে নিশ্চয়ই মফস্বলে কাজ চলছে। তারপর তারা গোয়েন্দা পাঠিয়ে দেখল কোন কোন মসজিদের ইমাম ও খতিব সাহেবরা জিহাদের উপর বয়ান করে মুসল্লীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তারপর মুসল্লীরা স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়ে জিহাদে চলে যাচ্ছে। তারপর বলসেবিকরা সেসব মসজিদের ইমাম ও খতিবদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। আবার অনেককে শহীদ করে দিয়েছে। তারপর

আমরা যেসব মুবাল্লীগগণকে এলাকায় পাঠিয়েছিলাম, সে সব মুবাল্লীগগণকে ইমাম নামধারী কতিপয় পেটপূজারী, খোদাদ্রোহী, বলসেবিকদের গোলামরা ধরিয়ে দিয়েছে। মুবাল্লীগদের ধরে দেয়ার জন্য ইমামগণ মোটা অংকের পুরস্কার পেত। এভাবে সব মুবাল্লীগ শহীদ করে দিয়েছে। আপনার অনুমতি হলে আমি ঘুরে ঘুরে মুনাফিকদের লিস্ট তৈরী করতে পারব।" সে আরো বলল—

আমরা ২০/২৫ মাইল পথ সবটুকু ঘোড়ায় যেতে পারব না। কারণ আমাদের অশ্বগুলো সেনাবাহিনীদের। এগুলো সাধারণ মানুষে দেখলেও চিনতে পারবে যে এগুলো আর্মীদের। তাই আমি মনে করি, আমাদের তিনটি ঘোড়ার সহিস নেই। এ তিনটি ঘোড়া থেকে আমরা তুলনামূলক দুটি দুর্বল ঘোড়া নিয়ে যাব। রাস্তায় গিয়ে এ দুটি বিক্রি করে দেব। বাকি পথ আমরা টাংগায়, বাসে এবং পদব্রজে যাব। এভাবে যাওয়াটা আমার নিকট বেশী নিরাপদ মনে হয়। এখন হযরতের বক্তব্য শুনতে চাই।"

ওয়ায়েভের কথাগুলো আমার নিকট খুবই পছন্দ হল। আর পছন্দ হওয়ারই কথা। কারণ সে হল একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক লড়াকু মুজাহিদ। আর আমি হলাম জজবাতী মুজাহিদ। তার চিন্তা-চেতনার কাছে আমি একজন বালক মাত্র। তাই তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বললাম, "প্রিয় ওয়ায়েভ! তোমার সিদ্ধান্তই আমার নিকট চূড়ান্ত। এখানে আমার আর কোন কথা নেই। এখন বল, কখন যাবে?" উত্তরে সে বলল, "এখন তো যাওয়ার সময় নেই। আল্লাহ্ চাহেত আগামীকাল ভোরে রওয়ানা হব।"

তারপর আমরা পালাক্রমে পাহারা দিয়ে রাতটি কাটিয়ে দিলাম। আমার পাহারার সময় ছায়েমাও আমার সাথে পাহারা দিয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু আয়াত ও মাসআলাও মুখস্ত করেছে। এ কয়দিনে সে সূরা ফাতিহাসহ ৫টি সূরা, তাশাহুদ ও দরূদ শরীফ মুখস্ত করেছে।

পরদিন ওছায়েদ ও ওয়ায়েভ ফজরের নামায পড়ে সামান্য নাস্তা করে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে সামান্য আহার্য ও রাস্তা খরচ নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার পথে আমি তাদেরকে অস্ত্র নিয়ে যেতে বলেছিলাম। ওরা বলল, "আমরা মোটামুটি জরীপ করে তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসব। এর মধ্যে আশা করি অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না। আবার যখন যাব তখন অবশ্যই অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যাব।" তাই অস্ত্র সাথে নেয়নি।

চলতে চলতে বিকাল দুটার দিকে মিকাইল থেকে ৬ মাইল দূরে ইস্কান্দারিয়া বাজারে এসে উপস্থিত হল। ইস্কান্দারিয়া ঘোড়ার বাজারের জন্য প্রসিদ্ধ বহুযুগ থেকে। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ঘোড়া কিনতে আসে এ বাজারে।

ওয়ায়েভ এখানে ঘোড়া বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে দাঁড়াল। এ ধরনের ঘোড়া বাজারে বড় একটা পাওয়া যায় না। তাই দু'টি ঘোড়ার পেছনে ক্রেতাদের ভিড় জমে গেছে। চলছে দর দাম।

অনেক দামা-দামী আর মুলামুলির পর দুটির দাম উঠল ১০ হাজার টাকা। ওয়ায়েভ ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘোড়া বিক্রি করে দিল। ক্রেতা সাবখানায় গিয়ে রশিদ কেটে দিতে-বলল। সাথীরা ঘোড়া ক্রয় বিক্রয়ের নতুন নিয়ম জানত না। সাবখানা থেকে চেয়ারম্যান ও স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতাদের লিখিত সনদ পত্র তলব করল। সাথীরা ওসব কাগজ পত্র ও প্রমাণাদী দেখাতে ব্যর্থ হল।

এদিকে সাবখানার একজন লেখক তাদের ঠিকানা জানতে চাইল। উভয়ে একটি ছদ্ম ঠিকানা বলে দিল। এতে গ্রামের নাম বলেছিল আযিমাবাদ। ক্রেতা বিস্মিত হয়ে বার বার উভয়ের দিকে তাকিয়ে দেখছিল এবং মনে মনে ভাবছিল যে, এ ধরনের লোক তো আযিমাবাদে কোনদিন দেখিনি। তাহলে তো এ ঘোড়া চুরির ঘোড়া। এসব সন্দেহ করে ক্রেতা জিজ্ঞাসা করল, আযিমাবাদের দু'চারজন লোকের নাম বলো তো? বিক্রেতাদ্বয় নীরব। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, "বল তো আযিমাবাদের চেয়ারম্যানের নাম কি?" এবারও বিক্রেতাদ্বয় নীরব। এবার সাথীরা বুঝতে পেরেছে যে, আমরা ফেঁসে গেছি। মিথ্যা বলার খেসারত ভোগ করতে হবে। তাই আল্লাহ্‌র দরবারে মিথ্যার জন্য বার বার তওবা করতে লাগল এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন মিথ্যা না বলার অঙ্গীকার করল।

সাবখানার লোকজন ঘোড়াসহ দু'জনকে বেঁধে রাখল। তারপর চলল গণপিটুনী। পিটুনির চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে উভয়ে। আহা! বেচারাদের সাহায্যকারী আর সুপারিশকারী আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই। একের পর এক শুধু ঈমানের পরীক্ষা দিয়েই চলছে। কেউ কেউ এমনও বলাবলি করছিল যে, এরা মুজাহিদ। কেউ বলছে চেহারা নমুনায় এমনটিই মনে হয়। আবার কেউ বলছে, আরে! মুজাহিদরা কোনদিন চুরি করেছে তা দেখেছ না শুনেছ? মুজাহিদরা কোনদিনই চুরি করে না। এরা আসলেই চোর। আস্তা চোর। দেখ না চোখ দুটি! এভাবে মুখে মুখে উঠেছে মন্তব্যের ঝড়। বাজারের সব মানুষ দর্শকদের ভূমিকা পালন করতে লাগল। এমন কি দোকানদাররাও এক নজর দেখার জন্য দোকান ছেড়ে আসতে লাগল।

দর্শকদের মধ্যে ছিল ঐ এলাকার জামে মসজিদের একজন ইমাম। সে ওয়ায়েভকে দেখেই চিনে ফেলল এবং বলতে লাগল, "ইয়ে...এতো সেই লোক, যে আমার মসজিদে তিনদিন কাটিয়েছিল। তার সাথী ছিল আরো দু'জন।

একজন আনোয়ার পাশা আর অপরজন তাদেরই সাথী। এই বলে সে তার দু'চারজন মুসল্লীকে ডেকে এনে তার কথার প্রমাণ করাতে লাগল আর বলতেছিল এরা মুজাহিদ, দ্বীনের শত্রু, আল্লাহ্র শত্রু, নবীর শত্রু এবং দেশের শত্রু। এদের কারণেই আমরা অপদস্ত হয়েছি।" ওয়ায়েভের দিকে লক্ষ্য করে বলল, "এই শালা আমাকে চিনিস?"

"অবশ্যই চিনি।"

"বলত আমি কে?"

"তুমি আল্লাহ্র একজন বড় ধরনের নাফরমান এবং উচ্চ পর্যায়ের মুনাফিক। তুমি দেশ ও জাতির গাদ্দার। এতটুকু বলে ওয়ায়েভ জিব্বায় কামড় দিয়ে মনে মনে ভাবল হায়! এখানে প্রশ্নের উত্তর দেয়া তো মরণ ডেকে আনারই নামান্তর। তাই সে চুপ হয়ে গেল। ওয়ায়েভের কথাগুলো শোরগোলের মধ্যে তেমন কোন প্রভাত পড়েনি বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি।

সন্ধ্যার একটু আগে সাবখানার লোকজন পুলিশ ডেকে এনে ঘোড়াসহ দু'জনকে পুলিশের হাতে দিয়ে দেয়। পুলিশ হাত কড়া লাগিয়ে ঘোড়াসহ দু'জনকে নিয়ে গেল থানায়। পুলিশরাও কিছু মারপিট করে থানাগারদে ঢুকিয়ে দিল। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের সাথে আর কে কে আছে তা বললে মারব না।" ওয়ায়েভ বলল, যারা আমাদের সাথে ছিল, তারাই বিপদ দেখে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে। এখন যদি তাদের নাম বলে দেই, তাহলে ওরাও গ্রেপ্তার হয়ে যাবে। তারপর আমাদেরকে ছুটানোর তদবীর কে করবে? এখন যদিও ওরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছে, তা নিরুপায় হয়ে। ওরা আমাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা তদবীর করবে।"

পুলিশ চোখ দুটি কপালে তুলে দাঁত কট্‌মট্ করতে করতে বলল, "তোদের বাবাদের নাম বলতে লজ্জা পাও! রাখ কথা কিভাবে বের করি তা দেখবা। এই বলে রক্ত খোলার জন্য ইয়া বড় একটি সিরিঞ্জ নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এ সুবাদে উছায়েদ বলল, "স্যার শাস্তি দিবেন না। আমরা তাদের নাম বলছি।" এই বলে ইমাম সাহেব ও দু'জন সাবখানার লেখকের নাম বলে দিল। ও,সি এ রাত্রেই উক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এল। তারপর ইচ্ছামত বানিয়ে গারদে ঢুকিয়ে দিল। এবার দেখে ওরা সবাই একই গারদের বাসিন্দা।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ছায়েমা সহ বাকি তিনজন সাথী নিয়ে আমি জনহীন কান্তারে অবস্থান করতে লাগলাম। এখানে আমরা এবাদত-বন্দেগী করছি আর ছায়েমাকে শিক্ষা দিচ্ছি নামায, কুরআন তিলাওয়াত, বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল ও সব ধরনের অস্ত্র চালানো। এগুলোর উপর চলছে অনুশীলনের উপর অনুশীলন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা। ছায়েমা পাঁচ ওয়াক্ত নামায খুব সুন্দরভাবে আদায় করতে শিখেছে। আর শিখেছে পার্টে পার্টে অস্ত্র খোলা, লাগানো ও চালানো। এবার তার আনন্দ দেখে কে? সে চায় আমাকে নিয়ে এখনই কোন অভিযান পরিচালনা করতে। ছুটে চলতে দেশ থেকে দেশান্তরে।

এগুলোর মধ্য দিয়ে কেটে গেল চারদিন। এখনো উছায়েদরা ফিরে আসেনি। কথা ছিল তিনদিনের মধ্যে অবশ্যই ফিরে আসবে। এখন পার হল চারদিন। তাহলে কি তারা কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে? তা না হলে এখনো ফিরে আসছে না কেন? এসব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তা ধারণ করার ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি।

অন্যান্য সাথীরাও এ ধরনের আশংকা ব্যক্ত করছে। ছায়েমার অন্তরে সাথীদের জন্য যে এত দরদ, তা আমি জানতাম না। তাদের চিন্তায় তার অন্তর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সে বারবার আমাকে বলছিল, "খোবায়েব! আমার মনে হয় যে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখন আর বসে বসে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আপনি আমাকে এজাজত দিন, আমি গিয়ে ওদের খোঁজ নিয়ে আসি। তারপর যে কোন সিদ্ধান্ত নিবেন।"

আমি বললাম, পথ-ঘাট অচেনা, থাকবে না কোন রাহাবর; এভাবে কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাবে প্রিয়তমা? উত্তরে সে বলল, "মানুষ আবার হারায় নাকি? পথ ঘাট যতই অচেনা হোক, মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছা যাবে। যাই হুজুর...?" তার এত জযবা দেখে বললাম, "ছায়েমা! এত জযবা দেখানো মেয়েদের পক্ষে মোটেই উচিত নয়। তোমার মত একজন অপূর্ব সুন্দরীকে পেলে বলসেবিকরা কি করবে তা কল্পনাও করা যায় না। কাজেই তুমি এখানে অবস্থান কর, আমি তাদের খোঁজ নিয়ে আসি।"

"কি বল প্রিয়তমে...! না, একা তোমাকে যেতে দেব না। মরি আর বাঁচি, এক সাথেই যাব। বন্দী হলেও এক সাথে বন্দী হব। আর হামলা করার সুযোগ হলে তাও এক সাথে করব।"

"ছায়েমা! এক সাথে হামলা করা যাবে তা ঠিক, কিন্তু গোয়েন্দাগিরী এক সাথে করা কখনো সম্ভব নয়। আমাকে এক এক সময় এক এক রূপ ধরতে

হবে। অবস্থা বুঝে কাজ করতে হবে। আমি এক দিকে তোমার স্বামী, অপর দিকে তোমার আমীর বা কমান্ডার, অন্যদিকে তোমার মুরুব্বী। আমার হুকুম বা নির্দেশ মানা তোমার উপর ফরয। এখন খুব চিন্তা করে বল, তুমি কি করবে?"

"স্বামী গো! আপনার হুকুম পালন করতে এক বিন্দু পরিমাণও ইতস্তত আমার দিলের মধ্যে নেই। কিন্তু আপনাকে ছাড়া একা থাকা খুবই কষ্টকর। তাই বারবার এ মিনতিই করছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যান, ওদের সংবাদ নিয়ে যত শীঘ্র পারেন ফিরে আসুন। অধিক বিলম্বে আমাকে আমি শামলাতে ব্যর্থ হব কিন্তু।"

"আচ্ছা প্রিয়তমা! তোমার কাছে আমি ওয়াদা করছি, চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে অবশ্যই ফিরে আসব। আশা করি এর মধ্যে ব্যতিক্রম হবে না।

ছায়েমাকে এসব কিছু বলে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এবং অন্যান্য সাথীদের কিছু কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে মিকাইল অভিমুখে ঘোড়া ছুটালাম। পথ-ঘাট সবই অচেনা। শুধু ধারণার উপর চলছি। বনাঞ্চল পাড়ি দিয়ে দুপুর ১২টার দিকে লোকালয়ের সন্ধান পেলাম। এতক্ষণে আমার ঘোটকও অনেকটা ক্লান্ত হয়ে গেছে। বিশ্রাম না নিলেই আর নয়। তাই একটি মনোরম জায়গা দেখে ঘোড়া থামিয়ে অবতরণ করলাম। এখানে রয়েছে ছায়াদার বড় বড় বৃক্ষ, তার পাশেই রয়েছে একটি জলাশয়। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত ময়দান। সে জমিনের কাঁচা ঘাস দেখলে মন জুড়ায়। মনে হয় কুদরতীভাবে মাঠ জুড়ে সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে।

আমি বাগডোর মুক্ত করে ঘোড়াটি উক্ত মাঠে ছেড়ে দিয়ে নিজে একটি গাছের শিকড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম নেয়া যে আমার জন্য কত আরামদায়ক ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কখন যে আমি দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম তা বুঝতেই পারিনি।

বেলা দু'টায় মানুষের কলরবে আমার নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখি আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোকজন। কেন এত লোকের সমাগম তা কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এতটুকু অনুমান হল ওরা কোন নেক উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়নি। নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ শুনতে হবে। এর মধ্যে একজন বলে উঠল, "এ চোর সেই গ্রুপেরই সদস্য, তাকে ধর।" কথাটি আমার কানে এসে বাজল। কিন্তু তার আসল রহস্য বুঝতে পারিনি। অপর এক ব্যক্তি বলল, "ক্ষতিপূরণ ছাড়া যেতে দেব না।" আরো অনেকেই অনেক কিছু বলতে লাগল।

আমি তাদের কথাগুলো খুব ঠাণ্ডা মাথায় শুনছি আর মনে মনে বুদ্ধি করছি কিভাবে কি করা যায় এবং বারবার আল্লাহ্‌র নিকট কায়মনোবাক্যে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এখনো ওরা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। এবার আমি মাথা উত্তোলন করে সবাইকে একবার দেখে নিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "বন্ধুগণ! আপনারা কি বলাবলি করছেন, তা আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"

একজন অর্ধবয়স্ক মুরুব্বী বললেন, "বাবা! তোমার ঘোড়ায় তো আমাদের একজনকে লাথি মেরে দাঁত সব কয়টা ফেলে দিয়েছে। সে এখন মরণাপন্ন। তাকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। তারপর ঘোড়াকে ধরার জন্য আরো কয়জন চেষ্টা করলে এদের উপরও আক্রমণ করেছে। এরাও হয়েছে আহত। এখনও কোন লোক ঘোড়ার কাছে যেতে পারেনি।"

অপর একজন বলল, "মিয়া! আপনার মতই দু'জন লোক ঘোড়াসহ ধরা পড়েছে। তারা দু'টি ঘোড়া চুরি করে ইস্কান্দারিয়া বাজারে তুলেছিল বিক্রি করার জন্য। ওরা তাদের ঠিকানা, চেয়ারম্যান ও স্থানীয় নেতাদের পরিচয় পত্র দিতে ব্যর্থ হয়। তাই তাদেরকে চুরির অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে ঘোড়াসহ সোপর্দ করা হয়েছে। ওদেরকে দেখতে অনেকটা আপনার মত। আবার ঘোড়া দু'টিও হুবহু আপনার ঘোড়ার সাথে মিল রয়েছে। তাই আমাদের ধারণা আপনিও সে গ্রুপের একজন সদস্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আপনাকেও থানায় যেতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "জনাব! ঘোড়াটি লোকগুলোকে কিভাবে এবং কেন আঘাত দিয়েছে তা বলতে পারবেন কি?"

"হ্যাঁ, বলতে পারব না কেন? চুরির সন্দেহে আমরা ঘোড়াটার কাছে গিয়ে ধরতে চেয়েছিলাম, ঠিক তখনি পিছনের দু'পা দিয়ে লাথি মেরে দাঁতগুলো ফেলে দিয়েছে। এভাবে কয়েকজনকে সে আঘাত করেছে। এখনো আমরা ঘোড়াটিকে ধরতে পারিনি।"

তাদের কথা শুনে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, উছায়েদ ও ওয়ায়েভের পরিণতি কি হয়েছে। অতঃপর ওদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, "ভাইসব! আপনারা অহেতুক একজন নিরপরাধ মানুষকে চোর বানিয়ে তার ঘোড়া ধরতে যাওয়াটা ঠিক করেননি। ঘোড়া কোন জ্ঞানী প্রাণী নয় বা আপনাদেরকেও চিনে না। যদিও সে একটি নিরীহ প্রাণী কিন্তু তার বাঁচার অধিকার রয়েছে। অযথা তাকে হয়রান-পেরেশান করা ঠিক হয়নি। সে যা করেছে তা একমাত্র বাঁচার তাগিদেই করেছে। দোষ সবটুকু আপনাদেরই।

কাজেই উচ্চবাচ্য পরিহার করুন। অন্যথা এর চরম খেসারত আপনাদেরকেও দিতে হবে।”

আমার কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বললেন, “মিয়া! কোথায় এসে এত বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছ তা হয়ত আন্দাজ করতে পারনি। এক্ষুণি তোমাকে থানায় প্রেরণ করা হবে। সে জন্য তুমি তৈরী হয়ে যাও।”

লোকটির কথা শুনে ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমি আমার স্টেনগানটি কম্বলের নিচ থেকে বের করতে করতে বললাম, আমার এ হাতিয়ার বহু জনপদ বিরাণ করেছে। অনেক মায়ের বুক খালি করেছে। অনেক রমণীকে করেছে বিধবা, আর সন্তানকে করেছে এতিম। এটা যদি রোষে উঠে তাহলে শত শত প্রাণ রক্তাক্ত হয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে। আজ তোমরা যে কাজ করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

আমরা আজ চার পাঁচটি মাস পাগল হয়ে খেয়ে না খেয়ে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি খোবায়েব নামক এক বিদ্রোহীকে ধরার জন্য। আমাদের শান্তির দূত লেলিন তাকে ধরার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। তোমরা আমাদের মিশনকে বানচাল করতে তৎপর হয়ে গেছ। তোমরা যে রূহানী ও মৌলবাদী তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার দু-সহকর্মীকে তোমরাই চুরির অভিযোগ এনে থানায় দিয়েছ। এর প্রতিশোধ অবশ্যই নেয়া হবে। মনে হয় তোমরা মুজাহিদ গ্রুপের সাথে গোপন আঁতাত করেছ। তাছাড়া তাদের উকালতি করতে না। এসব কথা বলতে বলতে ব্রিগেডিয়ারের পোশাকটি বের করে গায়ে দিলাম।

আমার বক্তব্য শুনে ও হাবভাব দেখে সবাই ঘাবড়ে গেল এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, “এরা তো সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা। আমরা তো না জেনে ভুল করে ফেলেছি। এখন উপায় কি?” অন্য একজন বলল, “স্যার! মাফ করবেন! আমরা না জেনে ভুল করে বসেছি। তাঁরা যদি তাদের পরিচয় দিয়ে দিত তাহলে তো এমনটি হত না।”

আমি বললাম, তোমরা কি পাগল হয়েছ যে, গোয়েন্দা হয়ে তার পরিচয় নিজে দেবে? আমি তো পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, কোথাও ধরা পরলে ও মার খেলে এমন কি জীবন নাশের আগ পর্যন্ত পরিচয় গোপন রাখবে। কোন পুলিশের লোকও যেন ধরতে না পারে। তবে শেষ মুহূর্তে পরিচয় দিয়ে জীবন রক্ষা করবে। ওরা তো আমার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তাদের কোন দোষ নেই। এ মহল্লা যদি রক্ষা করতে চাও তবে আজকের মধ্যে সে দু'জন সাথীকে থানা থেকে ছিনিয়ে আন। তা না হয়...।

“স্যার! এদেরকে আনার উপায়?”

"উপায় তো সহজ, একজন সাজ ঘোড়াওয়ালা আর এক দল সাজ সাপোর্টার। আর কয়েকজন সাজ আসামী পক্ষের লোক। তারপর থানায় গিয়ে বল আমরা এ বিষয়টি গ্রামে বসে শেষ করব। অতএব আসামীসহ ঘোড়া দুটি দিয়ে দাও। প্রয়োজনে থানা অলাদের কিছু পয়সা ধরিয়ে দিও। আমার কথামত তারা দুই পক্ষ সেজে থানায় গিয়ে আমার শেখানো কথাগুলো বললে ওসি ওদেরকে দিয়ে দেয়। রাত আটটার দিকে বন্দীদের ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হয়। আমি আহতদের চিকিৎসা বাবদ তিন হাজার টাকা তাদের পরিবারের নিকট দিয়ে দিলাম। তারপর রাত্রে সেখানে অবস্থান করে পরদিন মার্কাজে ফিরে আসি।

॥ আটত্রিশ ॥

আসামীদের ছাড়িয়ে আনার পর গ্রেপ্তারকৃত ইমাম সাহেবও ছাড়া পেল। ইমাম সাহেব মুক্তি পেয়ে সাবখানার লেখককে নিয়ে চলে গেল আর্মী ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করে ওয়ায়েভ ও উছায়েদের গ্রেপ্তারির সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলল, "স্যার! আমি কছম খেয়ে বলতে পারি সে লোক মুজাহিদ। এ আনোয়ার পাশার একজন শক্তিশালী সালার। আপনাদের আগমনের আগে এরা আমার মসজিদ ব্যবহার করেছিল।"

"তখন তুমি কোন কমিউনিস্ট নেতৃবর্গকে এ সংবাদ জানিয়েছিলে?"

"স্যার! তখন তো কমিউনিস্ট কি জিনিস তা ভালভাবে বুঝতাম না। আর সে সময় আমাদের এলাকায় কমিউনিস্ট কারা ছিল তাদেরকে চিনতাম না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় এটাই ছিল যে, মসজিদ কমিটির লোকজন ছিল আনোয়ার পাশার ভক্ত এবং এরা ছিল অস্ত্রধারী। তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা কি আমাদের মত ইমাম সাহেবদের পক্ষে সম্ভব ছিল?"

"আচ্ছা বুঝলাম তোমার এসব কথা। এখন কি বলতে চাও বল।"

"স্যার! এখন আমার কথা হল, ঘোড়াসহ দু'জন মুজাহিদ বন্দী হল। তাদেরকে চোর হিসাবে জনগণ সাব্যস্ত করে থানায় দিয়েছে। সেখানে পুলিশের পিটুনি খেয়ে আমাদের নামও বলেছে। তারপর কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই আমাদের গ্রেপ্তার করে এনেছে এবং ইচ্ছামত মারধোর করেছে। দেখুন আমাদের শরীরের কি অবস্থা।"

"এসব কথার মতলব কি তা বল।"

"স্যার! এরা যে মুজাহিদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরা সম্ভবত বিপুল শক্তি নিয়ে এই এলাকায় প্রবেশ করেছে। এদের ব্যাপারে আপনাদের অভিযান

চালানোর দরকার। আর যেসব লোক তাদের পক্ষে উকালতি করেছে অর্থাৎ ছাড়িয়ে নিয়েছে তাদেরকেও কিছু করা দরকার।"

"তুমি এত ভাল মানুষ তা বুঝি কি করে? আমি তো বুঝতেছি, তুমি মুজাহিদদের সোর্স, এসেছ আমাদের চাকুরী খাওয়ার জন্য। লেলিন এসব এলাকা মুজাহিদমুক্ত করার জন্য এক হাজার সৈন্য দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন। যদি আমরা তা করতে না পারি তবে আমাদেরকে এক বৎসর বিনা বেতনে চাকুরী করার হুকুম দিয়েছেন। আমরা এসব এলাকায় আজ তিন মাস যাবৎ চষে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তাদের কোন পাত্তাও মেলেনি। তাই গত মাসের ২৫ তারিখে ঘোষণা দিয়েছি, মিকাইল মুজাহিদমুক্ত এলাকা। আমার এ সংবাদ প্রতিটি দৈনিকের মধ্যে ছাপা হচ্ছে। এতে কমিউনিস্ট নেতারা আমাদের প্রতি খুবই খুশী। এখন যদি তোমার কথার উপর কোন কিছু করি তাহলে লোকমুখে উঠে যাবে যে, এ এলাকায় মুজাহিদরা প্রবেশ করেছে। তাহলে আমাদের পরিণাম কি হবে তা ভেবে দেখেছ? আর তোমার কথা যদি সত্যও হয়ে থাকে তবু তো আমরা আক্রমণ করতে পারি না। কারণ, আনোয়ার পাশা নেই বটে কিন্তু রয়ে গেছে তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক মুজাহিদ। তাছাড়া বর্তমান কমিউনিস্টদের মহাতঙ্ক খোবায়েব এখনো জীবিত রয়েছে। তার কথা শুনে হৃদকম্পন আরম্ভ হয়নি এমন লোক কমই আছে। তার যে ছবি! তা দেখলেই কাপড় ভিজে যাওয়ার উপক্রম হয়। কাজেই বাজে কথা বাদ দিয়ে এখান থেকে চলে যাও।"

"স্যার! আমার দায়িত্ব ছিল সতর্ক করার, তাই করেছি।"

"বাজে কথা বাদ দাও, তোমাকে কে দায়িত্ব দিয়েছে?"

"স্যার! দায়িত্ব আমাকে কেউ দেয়নি, তবে হামলা হলে টের পাবেন।"

ইমাম সাহেবের কথা শুনে আর্মী অফিসার রেগে উঠে চাবুকের পর চাবুক মারতে লাগল। চাবুকের আঘাতে উভয়ের শরীর থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল। চাবুকের আঘাত সইতে না পেরে ইমাম সাহেব ও পশু বাজারের রশিদ লেখক অফিসারের পায়ে ধরে জীবনে এসব বলবে না তার ওয়াদা করে ফিরে এল।

যারা মুনাফিক তাদের শাস্তি দুনিয়াতেও হয় আবার আখেরাতে তো আছেই।

ইমাম সাহেব নিজ মহল্লায় ফিরে এলে অনেকেই তার গ্রেপ্তারির কারণ জানতে চাইল। ইমাম সাহেব সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করল। এক মুসল্লী বলে উঠলেন, "বুঝলাম মিথ্যা অভিযোগ এনে থানায় নিয়েছে কিন্তু আর্মীরা চাবুক মারল কেন?" উত্তরে ইমাম সাহেব বলল, "ভাইসব! মুজাহিদদের ব্যাপারে আর কোনদিন কিছুই বলবেন না। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে

বলতে গিয়ে আমার এ অবস্থা। এটা শুনে স্থানীয় কমিউনিস্টরা আবার ইমাম সাহেবকে পিটাতে লাগল। তারপর কতিপয় মানুষের সহায়তার পিটুনি বন্ধ হল।

আমরা মার্কাজে ফিরে এলাম। সাথীরা আমাদেরকে ঘিরে অনেক কিছু জানতে চাইল। ওয়ায়েভ এক এক করে সমস্ত ঘটনা সাথীদের শোনাল। এর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক যে সংবাদ তা হল, ওয়ায়েভদেরকে থানায় নিয়ে গেলে শত শত লোক দেখার জন্য ভীড় জমাল। এর মধ্যে ছিল সর্বস্তরের জনগণ। একেক জনে একেক মন্তব্য করছিল, কিন্তু নামধারী আলেমদের মন্তব্য ছিল সবচেয়ে জঘন্য। আলেমদের মধ্যে অনেকেই বলতেছিলেন, "এরা আসলে চোর নয়, এরা মুজাহিদ। এদের কারণেই আজ মসজিদ মাদ্রাসার এ অবস্থা। এরা জিহাদ না করলে তাদের (বলসেবিকদের) কথা মেনে চললে এমন হত না।" ওয়ায়েভ এ ধরনের পাঁচজনকে তো ভালভাবেই চিনেছে। এদের মধ্যে দু'জন দু'মসজিদের ইমাম আর তিনজন মাদ্রাসার শিক্ষক। এসব মাদ্রাসায় আগে কুরআন ও হাদীসের আলোচনা হত। এখন সে শিক্ষাকে অনেক ছাটকাট করে কমিউনিজমের নাস্তিকী শিক্ষা ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেসব উস্তাদরা বিরোধিতা করছিলেন তাদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে, আর যারা নাস্তিকী মতবাদ সাদরে গ্রহণ করেছে এবং কমিউনিস্টদেরকে খোদা মানতে পেরেছে একমাত্র তারাই জীবিত আছে ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছে। ওয়ায়েভ তাদের খোদাদ্রোহী মন্তব্য শুনে মনে মনে শপথ করেছিল যে, আল্লাহ্ যদি কোনদিন এ অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তিদান করেন তাহলে এ চার পাঁচজন আল্লাহ্র দুশমনকে এবং আলেম নামের কলঙ্ক ও মুনাফিকদেরকে দুনিয়ার আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত করবই করব ইনশাআল্লাহ্। যারা জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে ও মন গড়া যুক্তি আর কুপরামর্শ দাঁড় করায়, তারা কক্ষনো মুমেন নয়। তারা মুর্তাদ। আর মুর্তাদদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কাজেই এদেরকে শেষ করতেই হবে।"

ওয়ায়েভের কথা শুনে সবাই উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, "আমরা সবাই একমত, আমীর সাহেবের এজাজতক্রমে আমরা এখনই যেতে প্রস্তুত। জীবন দিয়ে হলেও আগে মুনাফিকদেরকে হত্যা করতে হবে, তাছাড়া আমরা কামিয়াব হতে পারব না। কামিয়াবীর প্রথম শর্ত মুনাফিক না থাকা। ইসলামের শুরু লগ্ন থেকে মুনাফিকদের মাধ্যমে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা কাফিরদের দ্বারা হয়নি। কাজেই দেশ থেকে মুনাফিক দূর করতেই হবে।" একজন জিজ্ঞাসা করল, "তাদের চেনার উপায় কি?" অন্যজন উত্তর দিল, আরে বর্তমানে যেসব আলেম আছেন, তাদের মধ্যে নব্বইজনই মুনাফিক। আর যারা সত্যিকার হাক্কানী আলেম, পীর, মাশায়েখ, বুজুর্গ, আল্লাহ্র ওলী ছিলেন, তারা আর বেঁচে নেই।

কেউ ইন্তেকাল করেছেন আর কেউ শাহাদাতের অমৃত সুরা পান করে জান্নাতে চলে গেছেন। এখন যারা মাওলানা, মুফতী, মুহাদ্দিস, খতিব, মুফাসসীর আর পীর মাশায়েখ দাবী করছেন, তারা সবাই বলসেবিকদের পা চাটা গোলাম। তারা পবিত্র কুরআন হাদীসের মতাদর্শ বাদ দিয়ে কমিউনিজম মেনে নিয়েছে। এরা কমিউনিজমের পক্ষে কথা বলে। পবিত্র কালামের ৬৮০ আয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলে ও ফতোয়া দেয়, অর্থাৎ জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। কাজেই তাদেরকে হত্যা করার জন্য কোন মুফতির ফতোয়ার প্রয়োজন নেই।"

উক্ত সাথীর কথা শুনে আমি ধমক দিয়ে বললাম, "সাবধান এমন কথা বললে ঈমানের উপর আঘাত আসবে। উলামায়ে কেরামগণ মাথার তাজ। আলেম ছাড়া পৃথিবী আর সূর্য ছাড়া দিন এক সমান। কাজেই মুখ সামলে কথা বল।"

"হযরত আমি যা বলছি তা অনেক তাযরেবার (অভিজ্ঞতার) পরে বলছি। আমি আনোয়ার পাশা শহীদ (রহ.) এর সময় তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীতে কাজ করেছি। তখন বিভিন্ন বেশে, বিভিন্ন সুরতে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও সরকারী অফিস আদালতে ঘুরেছি। প্রয়োজনে কথা বলেছি, তাদের কথা শুনেছি, মত বিনিময় হয়েছে। আমার সে জরীপে দেখেছি, যে কয়জন আলেম ইসলামের পক্ষে কথা বলেছেন, বলসেবিকরা তাদেরকেই শহীদ করে দিয়েছে, একটিও ব্যতিক্রম হয়নি। যে মাদ্রাসার দু'একজন উস্তাদ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ছিলেন, অন্য উস্তাদরা তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়ে দিত। তারপর হঠাৎ একদিন গাড়ী এসে তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আজ পর্যন্ত সে সব আলেমের কোন সন্ধান মিলেনি। সেসব বুজুর্গ আলেমদের ধরিয়ে দিয়ে মুনাফিক আলেমরা মাদ্রাসায় বহাল তবিয়তে দিন কাটাচ্ছে। এ জন্যই আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি বর্তমানে আলেম যারা আছে তারা নব্বইজনই মুনাফিক। তাদেরকে কতল করা জায়েয।"

বর্তমানে আমরা মোট লোক সংখ্যা মাত্র সাতজন। এর মধ্যে একজন হল মহিলা। এ অল্প সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে কোথায় কি ধরনের হামলা করা যায়, সে হামলার পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে সাথীদের থেকে পরামর্শ চাইলাম। এর মধ্যে ছায়েমা বলে উঠল, "আমার নামটিও যেন লিখা হয়, তা নাহলে কিন্তু...।"

আমি বললাম, "আরে পাগলিনী! তুমি এত পেরেশান হলে কেন? আমীরের হুকুম মানা যে ফরয, তা কি ভুলে গেছ?" আমার কথায় সে বলল, "আপনি বার বার একটি কথা বলে আমাকে দমন করতেছেন। এর বিপরীতে আর কোন হাদীছ নেই? আমি যদি সম্পূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল জানতাম, তাহলে হয়ত এক কথা বার বার বলে আমাকে দমন করে রাখতে পারতেন না।" ছায়েমার কথা

শুনে সবাই হেসে ফেলল। অতঃপর আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "শোন ছায়েমা! তোমার যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ইচ্ছা থাকে তবে আমীরের হুকুম মানার মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আমীর যদি তোমাকে বলে যে, তুমি মোর্চায় থেকে মুজাহিদদেরকে পাক করে খাওয়াবে অথবা রোগীর সেবা করবে। তাহলে এটাই তোমার উপর ফরয। তুমি তা করলে জিহাদেরই সওয়াব পাবে। যারা ময়দানে জীবন বাজী রেখে লড়াই করছে, তারা যতটুকু সওয়াব পাবে, তুমিও খিমায় বসে বসে সে সওয়াবই পাবে, এতে কোন কম-বেশী হবে না। আমীরের হুকুম মেনে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করাও জিহাদে যাওয়ার সওয়াব হয়। আমীরের হুকুম অমান্য করলে জিহাদ কেন, কোন নেক আমলই কবুল হবে না।" আমার কথা শুনে সে বলল, "প্রিয়তম! আর কোনদিন এসব নিয়ে বক্ বক্ করব না। দোয়া করবেন আপনাদের হুকুম যেন মেনে চলতে পারি। আর আল্লাহ্‌ যদি আমার রাস্তা খুলে দেন তাহলে কেউ আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না।"

অতঃপর পূর্বের পরামর্শ চাইলে উছায়েদ বলল, "মুহতারাম আমীর সাহেব! আমরা দু'জন তো অসুস্থ! যে মার মেরেছে আমাদের, তা কবে নাগাদ ভাল হয় তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। তবে আমার পরামর্শ হল আরো ১৫ দিন অপেক্ষা করা তারপর হামলা করা। এ ১৫ দিন আমরা মোবাইলে (ঘুরাফেরায়) থাকব। এক স্থানে বেশী সময় থাকা ঠিক হবে না। দুশমন থেকে গাফেল থাকা মোটেও উচিত নয়।"

ওয়ায়েভ বলল, "আমরা মোবাইলে থাকব তা ঠিক। তবে দু'তিনজনে যতটুকু অপারেশন করা যায় তা জারি রাখা দরকার। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, খুবই খারাপ। সারা দেশে মুজাহিদ তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যে কয়জন এখানে আছি এরা ছাড়া মনে হয় আর কোন মুজাহিদ জীবিত নেই। একজনও যদি থাকত তবে কোন না কোন এলাকায় হামলা করত। আজ দু'তিন মাস যাবত পত্র-পত্রিকায় হামলার কোন সংবাদ আসছে না। আমরা বসে বসে সময় নষ্ট না করে ছোট খাট হামলা চালিয়ে যাব। আর এ হামলা হবে শুধু মুনাফিক খতম করা। এ পরমার্শ যদি আমীর সাহেবের নিকট গৃহীত হয় তবে বলব, তিনজন ইমাম আছে। তারা পাশাপাশি মসজিদের হুজরায় থাকে। এদেরকে এক রাত্রেই উঠিয়ে নিয়ে আসা যাবে। এ ব্যাপারে হযরত মুফতী সাহেবের মতামত শুনতে চাই।"

ওয়ায়েভের কথা শুনে আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে কি আমাদের মধ্যে কেউ মুফতী আছেন? কে সেই ব্যক্তি?" ওয়ায়েভ অঙ্গুলীর ইশারায় দেখিয়ে বলল, "ইনিই তো মুফতী। ভাই আঃ রহমান।"

আমি খুবই বিস্মিত হয়ে বললাম, জনাব! আমার অপরাধ কি মাফ করবেন? আপনার চাল-চলন ও কথাবার্তায় আপনাকে বড় আলেম হিসাবে মনে করতাম, কিন্তু কেন যেন আপনাকে আমাদের মাঝে লুকিয়ে রেখেছেন যদ্দরুন আমি না জেনে অনেক সময় অনেক কাজের হুকুম দিয়েছি, তা না দিলেও পারতাম। অতএব, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্ষমা করে মহত্বের পরিচয় দেবেন বলে আশা রাখি।"

আমার কথা শুনে মুফতী আঃ রহমান সাহেব বললেন, "জিহাদের ময়দানে উঁচু-নীচু সব সমান। তাকাব্বুরী আর গৌরবী ধ্বংস করার স্থানই হল জিহাদের ময়দান। জিহাদে আসার পরও যদি আমাকে মুফতীআনা পোশাকে সাজিয়ে রাখি, আর আমীর সাহেব আমাকে মান্য করে কোন দায়িত্ব না দেন, তাহলে আমার মত কমবখ্‌ত আর কে হতে পারে? আমাকে আমি মিটিয়ে দিতে পেরেছি বলে আল্লাহ্‌ আমাকে দয়া করে জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ আমল করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তা না হয় এতদিনে বলসেবিকদের গোলামী করতে হত। আমার সম্মুখে যদি একজন কালো, কানকাটা, ঠোঁট মোটা গোলামকেও আমীর হিসাবে আনা হয় তবে তাকেই আমি মানতে পারব। কোন অসুবিধা হবে না। আর আমাদের প্রিয়নবীর নির্দেশও এটাই।" এসব নসিহতের পর তিনি বললেন, "আমারও খেয়াল হামলা চালিয়ে যাওয়া। সময় আর নেই। বসে থাকা আমাদের জন্য আর ঠিক হবে না। যে কয়জনে যা করা সম্ভব তাই করতে হবে। এখন হযরতের মর্জি।"

উনাদের পরামর্শে আমিও একমত হয়ে হামলা চালিয়ে যাওয়ার এজাজত দিয়ে দিলাম।

॥ উনচল্লিশ ॥

আমরা সন্ধ্যার পর আহারাদি করে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ যা লওয়ার প্রয়োজন তা নিয়ে অপারেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। পরামর্শক্রমে আমার সাথে নিলাম মুফতী আঃ রহমান ও মাওলানা ইজ্জত উল্লাহ্‌ আরেফিনকে। বাকি চারজনকে মোর্চার হেফাজতের জন্য রেখে দিলাম। দু'জন রোগীর প্রতি বিশেষ নজর রাখার জন্য উপদেশ দিলাম। অতঃপর তিনজনে তিনটি ঘোড়া নিয়ে মোর্চা ত্যাগ করলাম। বিদায়ের সময় ছায়েমা অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল আর আল্লাহ্‌র দরবারে কাতর সুরে প্রার্থনা করছিল যে, "হে আল্লাহ্‌! তুমি এ ক্ষুদ্র কাফেলার হেফাজতকারী হয়ে যাও। প্রভু হে! তুমি যদি তাদেরকে সাহায্য না কর তাহলে কে করবে তাদের সাহায্য? তোমাকে ছাড়া তো আর কোন সাহায্যকারী

নেই। এ ক্ষুদ্র কাফেলাকে তোমার কুদরতি হাতে সোপর্দ করলাম। সমস্ত বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করে আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!"

আমরা বিদায় নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে চলতে লাগলাম। রাত ১২ টার দিকে বনাঞ্চল পেরিয়ে লোকালয়ে পৌছলাম। অশ্বের খুরধ্বনিতে যেন মানুষ টের না পায়, আমরা সেভাবে চলতে লাগলাম। কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই, নেই কোন কোলাহল। গোটা এলাকা শীতের কালো চাদর মুড়ি দিয়ে গভীর শয্যায় শায়িত। দূর আকাশের অগণিত তারকারাও যেন আমাদের সাথে আকাশ পথে চলছে। মাঝে মধ্যে দু'একটি কলা বাদুরের ডানার শব্দ কানে আসছে। জোনাকীরা মাঝে মাঝে একটু দূর দিয়ে ছোটাছুটি করছে। এতে রাতের শোভা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাত দু'টার দিকে আমরা ওয়ায়েভের দেয়া নক্সা অনুযায়ী প্রথম মসজিদে গেলাম। দুঃখের বিষয়, হুজরাখানার বাইরে রয়েছে তালা ঝোলানো। এত কষ্ট করে এসে যদি শিকার না পাওয়া যায় তবে কত কষ্টের কথা। আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল।

আবার আল্লাহ্ পাকের উপর ভরসা করে দ্বিতীয় মসজিদের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রথম মসজিদ থেকে দ্বিতীয় মসজিদের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। আমরা আস্তে আস্তে চললাম। মসজিদের একটু দূরে অশ্বগুলোকে বেঁধে রেখে চললাম পায়ে হেঁটে। মসজিদের প্রায় নিকটে পৌছতেই কিছু লোকের ক্ষীণ আওয়াজ কানে এল। আমরা চলার গতি থামিয়ে এদিক সেদিক তাকালাম, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। মুফতী সাহেব হাতের ইঙ্গিতে সবাইকে শুয়ে পড়তে বললেন, আমরা অস্ত্রগুলো বুকের নিচে রেখে শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দেখি মসজিদের হুজরা থেকে এক ঝলক আলো এসে সামনের চত্বর আলোকিত করে দিল। এর মধ্যে দু'জন লোক মনে হয় পেশাব করতে বেরিয়েছিল। এরা বাইরে একটু পায়চারি করে হুজরা অভ্যন্তরে চলে গেল। সাথে সাথে দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আমরা ক্রুলিং করে আস্তে আস্তে হুজরার প্রাচীরের নিকট চলে গেলাম। তারপর আমি আস্তে আস্তে বাতায়নের পাশে আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে সরু ছিদ্র পথে একটি চোখ লাগিয়ে দেখলাম উক্ত রুমে লোক সংখ্যা নয়জন। শশক শাবকের ন্যায় কান দু'টি খাড়া করে তাদের গোপন পরামর্শ এবং কথোপকথন শুনতে লাগলাম। এদের কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনায় ধরে নিয়েছি নয় জনের মধ্যে তিনজন হল তিন মসজিদের ইমাম ও অন্যরা এলাকার বলসেবিক মস্তান। ওরা পরস্পর আলাপ করছিল এবং চা পান

করছিল। তাদের পার্শ্বে কতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র শোভা পাচ্ছিল। তাদের সম্মুখে ছিল কতগুলো দামি দামি কাপড় আর তার এক পার্শ্বে ছিল বেশ কিছু টাকা পয়সা আর স্বর্ণালঙ্কার। এসব কিছু দেখে বুঝতে পারলাম, এটা আর কিছু নয়, এগুলো দ্বীনদার পরহেজগার ও আলেমদের বাড়িঘর লুট করে এনেছে। আহা! পাষণ্ডরা নাজানি কত মুসলিম ললনার শরীরে হাত দিয়ে এসব জেওয়র পাতি ছিনিয়ে এনেছে। কত পরিবারকে নাজানি ওরা পথের ভিখারী বানিয়ে তাদের সহায় সম্পদ লুট করে এনেছে। মা বোনের ইজ্জত যে হরণ করেনি তা কে জানে? এরা যে দারুন অসভ্য এতে কোন সন্দেহ নেই।

ওদের মধ্য থেকে একজন বলল, "হুজুর! এসব রূহানীরা আর জিন্দেগীতে আমাদের বিরোধিতা করবে না।" অন্য একজন বলল, "হুজুর মানুষের ঘরে এত জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা এল কোত্থেকে? নিশ্চয় এরা গরীবের হক নষ্ট করে এসব অর্থের মালিক হয়েছে।" অপর একজন বলল, "আরে না! মৌলবাদীদের কৌশল অন্য রকম। তারা কাল্পনিক জান্নাত আর জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে অনেক টাকা মারে। ওরা বলে দান খয়রাত করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে, বালা-মুছিবত দূর হবে, কবর আযাব মাফ হবে। এসব কিছু বলে ধোঁকা দিয়ে তাদের দ্বারা দোয়া করায়, এতেও পায় প্রচুর টাকা।" আর একজন বলল, "আরে বাদ দাও বেহুদা কথা! ওরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই মাল জমা করুক, আমরা তো আছিই। ওরা মাল না জমালে আমরা আনব কোত্থেকে?"

এসব আলাপ আলোচনার পর একজন হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা করল, "হুজুর! এগুলো কিভাবে বণ্টন করা আপনার হাতে করুন।" লম্পট হুজুর বলল, "এগুলো মালে গনিমত। সরকারের বিরোধিতা যারা করে তারা বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহী, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েজ। তাদের মাল ও মেয়েরা আমাদের জন্য হালাল। আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু রেখে বাকিগুলো গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।"

অতঃপর নয়জনের মধ্যে টাকা পয়সা ও স্বর্ণালঙ্কার বণ্টন করে কাপড়-চোপড়গুলো গরীবদের জন্য রেখে দিল। তারপর আগামীকাল রাত্রে কোন কোন বাড়ি লুট করবে তাদের নাম লিস্ট করল এবং কার কি দায়িত্ব তা বুঝিয়ে দিল।

থানা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ইমাম সাহেব বলল, "আমীদেরকে মুজাহিদদের সংবাদ দেয়ার কারণে চাবুক খেয়েছি, রক্ত ঝরিয়েছি। এখন আর চুপ থাকব না।

শালারা সরকারের বেতন খায় বসে বসে। এরা সরকারের বা দেশের কোন কাজ করে না। আমি বার বার বুঝিয়ে বলেছি যে, এরা আনোয়ার পাশার গ্রুপের লোক। তাদেরকে আমি ভালভাবে চিনি। এরা হয়ত আবার বনে জমা হচ্ছে। এত মতে বুঝানোর পরও এরা আমলে আনেনি। সত্য সংবাদ দেয়ার কারণে উল্টা রিয়েকশন হয়েছে। এদের প্রতিশোধ নেবই নেব। আর মুজাহিদদেরও ১২টা বাজাব। আমি আগামীকাল তিনজনকে কাঠুরিয়া বেশে বনে পাঠাব। ওরা বনে বনে তালাশ করে মুজাহিদদের আস্তানার সন্ধান করবে। বনের মধ্যে যদি ঘোড়ার পায়ের চিহ্নও পাওয়া যায়, তাহলে বুঝব নিশ্চয় মুজাহিদরা রয়েছে। কাঠুরিয়াদের সংবাদ পেলেই আমি চলে যাব আর্মী হেডকোয়ার্টারে। সেখানে গিয়ে আমি সব ঘটনা খুলে বলব। তখন জেনারেলরা বনে অভিযান চালাবে আর ঐসব শালাদেরকে বিনা বেতনে চাকুরী করাবে।"

অন্য এক ইমাম বলল, "আমাদের হুজুরের চিন্তা খুবই সুন্দর। এভাবেই কাজ করতে হবে, তা না হয় কিছুই করা যাবে না।

আমি এসব বদমাইশ আর লম্পটদের কথা শুনে ঠিক থাকতে পারিনি। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্তের স্রোত বয়ে গেল। মন চাচ্ছিল, এদেরকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলি। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দন্তপাটি ঘর্ষণ আরম্ভ করে দিল। আমি মনে মনে এরাদা করলাম, এদেরকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না। সবগুলোকে হত্যা না করা পর্যন্ত সাধ মিটবে না। রাগ দূর হবে না। কলিজা ঠাণ্ডা হবে না।

তারপর ভাবছিলাম, এখানে তো গনিমত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। আবার ভাবলাম, না এগুলো তো তাদের পরিশ্রমের অর্থে অর্জিত সম্পদ নয় সবগুলো অর্থই ডাকাতি করে আলেম উলামাদের বাড়ি থেকে এনেছে। এগুলো তাদের সম্পদ নয়। অতএব মালে গনিমত হবে না। তবে অর্থ আর স্বর্ণগুলো উদ্ধার করতে পারলে, কোন ছুরতে মালিকদের নিকট পৌছানো যেতে পারে। তাই এগুলো কিভাবে হেফাজত করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম।

অনেক চিন্তার পরও মাল হেফাজতের কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। এরা হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যে যার যার বাড়ি চলে যাবে। এরা যদি রুম থেকে বেরিয়ে পড়ে তাহলে হত্যা করা খুবই কঠিন হবে। ওরাও তো অস্ত্রধারী। সহজে কাবু করা যাবে না।

এসব ভেবে চিন্তে সাথীদের বললাম, "আপনারা একটু দূরে গিয়ে পজিশন নিন। আপনারা আমার হেফাজতের জন্য তৎপর থাকবেন। আমি গ্রেনেড ছুড়ে

এদেরকে শেষ করব। কিন্তু গ্রেনেড নিক্ষেপের কোন রাস্তা ছিল না। দরজা জানালা সবই ছিল বন্ধ। আমি সাথীদের দূরে সরিয়ে দিয়ে খুব সন্তর্পণে দরজার বাইরে গ্রেনেডের রিং খুলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এরই সামান্য একটু পরে দরজা খুলে গেল। এবার আর কি! আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে গ্রেনেড ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। বিকট শব্দে হুজরা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। যে দরজা খুলেছিল সে চিৎকার দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু দশ কদমও যেতে পারেনি। সে মুফতী সাহেবের হাতে ধরা পড়ে গেল। এদিকে হুজরার আটজন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে প্রাণ হারাল। রুমটি সাথে সাথে আগ্নেয়গিরীতে পরিণত হয়ে গেল। মুনাফিকদের তাজা রক্তে হুজরা গোসল করল।

গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের লোকজন জাগ্রত হয়ে ভয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আমরা বিলম্ব করে সময় নষ্ট না করে অশ্ব নিয়ে সরে আসতে লাগলাম। বন্দীকে মুফতী সাহেব তার ঘোড়ায় তুলে নিলেন। এদিকে সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। পূর্ব আকাশে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাঙা রবি উদিত হবে। আমরা অশ্ব থেকে অবতরণ করে নামায আদায় করলাম।

নামায শেষ করে আবার আমরা উর্দ্ধশ্বাসে অশ্ব হাকালাম। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতারা আমাদের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু কিছু বলার সাহস পায়নি। আর আমরা যে মুজাহিদ তা তারা সহজেই বুঝতে পেরেছে।

সকাল ১০টার দিকে আমরা লোকালয় পেরিয়ে অরণ্যের ভিতর ঢুকে পড়লাম। উঁচু-নিচু বনবাদার পেরিয়ে দুপুর ১২টার দিকে মার্কাজে পৌঁছলাম। তারপর নদীতে গোসল করে বন্দীকে নিয়ে খানা খেলাম। অতঃপর বন্দীকে বেঁধে রেখে আমরা শুয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। ছায়েমা আমার পাশে বসে দাড়িগুলো নিয়ে খেলা করছিল।

বিকাল দুটায় নামায আদায় করে সাথীদের নিয়ে বসলাম এবং সম্পূর্ণ কারগুজারী শুনলাম। সকলেই সফল অভিযানের জন্য নফল নামায পড়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন গাইতে লাগল। তারপর বন্দীকে নিয়ে বসলাম এবং তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করলাম। তারপর বন্দীকে বললাম, "তওবা করে আবার মুসলমান হবে?" অসভ্য বলল, "আমি তো মুসলমানই, আবার মুসলমান হব কেন? উত্তরে আমি বললাম, কমিউনিস্টে বিশ্বাসী হলে তার ঈমান থাকে না। তারপরও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। আমরা তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ছায়েমাকে বললাম তাকে হত্যা করার জন্য। ছায়েমা ব্রাশ ফায়ারে তাকে ঝাঁঝরা করে দিল। এটাই তার প্রথম অপারেশন।

॥ চল্লিশ ॥

নয়জন মুনাফিক হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। লাশ দেখার জন্য ভোর থেকেই নেমে এল জনতার ঢল। আবাল, বৃদ্ধ-বনিতা কেউ বাদ পড়েনি। থানায় সংবাদ দিলে থানা থেকে এক ভ্যান পুলিশ এসে সবকিছু দেখল, শুনল ও বুঝল। তারপর লাশ থানায় নিয়ে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিল হাসপাতাল মর্গে। ময়না তদন্তের পর লাশগুলো অলী-ওয়ারিশদের হাতে হস্তান্তর করল। এজাহার লেখা হল মুজাহিদদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়েছে।

উক্ত হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে এলাকার কোন লোকজন জড়িত কি-না সে তথ্য সংগ্রহের জন্য ছেড়ে দেয়া হল ছয়জন গোয়েন্দা। আর প্রকাশ্যভাবে পুলিশরাতো তল্লাশির উপর তল্লাশি চালিয় যাচ্ছে। সুখের বিষয়, এলাকার কোন লোকজনের উপর কোন দোষ চাপিয়ে দেয়নি। গোয়েন্দাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল; মুজাহিদরাই সুপরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেয়া এবং কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে তা জানার একান্ত প্রয়োজন। এসব তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে সামনে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় তা স্থির করা খুবই মুশকিল। তাই সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করলাম কিভাবে কি করা যায়।

উছায়েদ বলল, "খোবায়েব ভাই! এলাকার তথ্য অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে এতে কোন অলসতা করা যাবে না। এর আগে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার আমরা কোথায় অবস্থান নেব। আপনারা অপারেশন করে যখন ফিরছিলেন তখন তো ছিল ভোর বেলা, বনের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে সময় হয়েছিল সকাল ১০টা। এর মধ্যে অনেকেই দেখেছে আপনারা বনে ঢুকছেন। দুশমনরা এটাই ভাববে যে, মুজাহিদরা বনে আছে। কুকান্দুজের মত প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আক্রমণ করে বসতে পারে। এর আগেই আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া দরকার। তা না হয় কিন্তু...।"

ওয়ায়েভ বলল, "ভাই তোমার কথা সত্য তবে এ স্থান ত্যাগ করা অত সহজ মনে করো না। কারণ আমি এখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। একটু নড়াচড়া করলেই যখম থেকে রক্ত ছুটে। যখমগুলো মনে হয় আগের চেয়ে তাজা হয়ে গেছে। আবার খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ ফুরিয়ে গেছে। এসব সংগ্রহ ছাড়া কোথাও পা বাড়ানো কি ঠিক হবে? আর এখানে থাকাও মোটেও নিরাপদ নয়। এখন খুব চিন্তা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমীর সাহেব সবদিক লক্ষ্য করে যে ফায়সালা দেন, আমরা তা মাথা পেতে মেনে নেব।"

ছায়েমা খিমার অভ্যন্তর থেকে ক্ষীণ সুরে বলল, "হে আমার মুজাহিদ ভায়েরা! "আমাদের চারদিকে বিপদ আর বিপদ। আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। চলুন সবাই মিলে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করি।"

সকলের কথাবার্তার অন্তরালে ভয়, ভীতি ও আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে। আমার মনের গহীনেও এমন একটা কিছু লুকিয়ে ছিল। তারপরও অভয় দিয়ে বললাম, "ভাইসব! আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকব, তা বিশ্বাস করি না। দুনিয়া থেকে তোমাকে, আমাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যেতে হবে। সে চলে যাওয়াটা যদি আল্লাহ্র রাস্তায় হয় তবে কতই না উত্তম, কতই না উত্তম। তোমরা ভয় পেয়ো না, হীনবল হয়ো না। আমি যাচ্ছি সংবাদ ও হাটবাজার করে আনতে। আর তোমাদের চিকিৎসারও একটা ব্যবস্থা করব। যা কিছু করি না কেন সুস্থতার প্রয়োজন আছে। তোমরা দোয়া করতে থাক। আমি দু'দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

অতঃপর স্টেনগানটি ম্যাগাজিন ভরে কম্বলের নিচে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম এবং দু'টি গ্রেনেড ও পাঁচ ম্যাগজিন গুলি নিয়ে অশ্বে আরোহণ করে ভিন্ন পথে মিকাইলের দিকে রওয়ানা হলাম।

ছায়েমা আমার অশ্বের বাগডোর টেনে ধরে রাস্তা আগলে দাঁড়াল এবং বলল, "প্রিয়তম! আমাকে রেখে তুমি একাই চলে যাচ্ছ? দোয়া করি আল্লাহ্ যেন তোমাকে আবার আমার বুকে ফিরিয়ে আনেন।" এই বলে সে কিছু টাকা বের করে আমার হাতে দিতে দিতে বলল, "প্রিয়তম! এ টাকাগুলো দিয়ে আমার জন্য কাফনের কাপড় খরিদ করে নিয়ে আসবেন। কখন কি হয় তা জানা নেই। কাফনের কাপড় সাথে রাখা দরকার।"

ছায়েমার হৃদয় বিদারক আকুতি শুনে আর তার আঁখি যুগলের পানি টপ্ টপ্ করে পড়তে দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। অনিমেষ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এর মধ্যে আমার দাড়িগুলোও অশ্রু দিয়ে গোসল করে নিল। তারপর তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আমার কর্তব্য পালনে অশ্ব হাকালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছায়েমার দৃষ্টির আড়ালে, গভীর বনে হারিয়ে গেলাম।

বিকাল ৬টা। সন্ধ্যার আগমনী গান গেয়ে পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে। সূর্য লাল আভা ছড়িয়ে গোধূলির আগমন বার্তা জানিয়ে দিল। আমি চিন্তা করলাম, এ অসময়ে শহরে প্রবেশ না করে হারেছ মিকাইলীর বাসায় রাত্র যাপন করি। তাঁর কাছ থেকেও অনেক সংবাদ পেতে পারি। তাছাড়া আমার তো ওয়াদা ছিল আবার আসব। ক'মাস আগে আমি যখন কফিনে অস্ত্র লুকিয়ে এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বিদায় হচ্ছিলাম, তখনও মাহমুদা আমার নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছিল। আজ সে ওয়াদা পূরণের সময় এসেছে। এটাই সুবর্ণ সুযোগ। তাই চলে গেলাম হারেছ মিকাইলীর বাসভবনে। ততক্ষণে সূর্য অস্ত গিয়েছে। আমি প্রথমেই ডাকলাম মাহমুদাকে, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। কয়েকবার ডাকার পর এক মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এল, "মাহমুদা বাসায় নেই; আপনি কে?"

কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলাম এটা মাহমুদার আম্মার কণ্ঠ। আমি আস্তে আস্তে বললাম, আমি একজন পথিক। ওর আব্বা কোথায়? উত্তর এল, "বাজারে। আপনি মেহমানখানায় বিশ্রাম নিন। তিনি হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন।"

আমি অশ্বটি সম্মুখের চত্বরে বেঁধে রেখে মেহমানখানায় প্রবেশ করে মাগরিবের নামায আদায় করে নিলাম। এর মধ্যে সেবিকা চা-নাস্তা নিয়ে হাজির হল এবং বলল, "জনাব! চা পান করে বিশ্রাম নিন। একটু পরে খানার ব্যবস্থা হবে। মেয়েটির বয়স আনুমানিক ৮ থেকে ১০ বছর। আমি যখন কিছুদিন এ বাড়িতে ছিলাম, তখন তাকে দেখিনি। আমার সেবা যত্ন করেছিল মাহমুদা। তাহলে মেয়েটি কে, তা জানতে ইচ্ছা জাগল। আমি ভাবছিলাম এতদিনে হয়ত মাহমুদা বিয়ে করে সংসার জীবনে পা দিয়েছে। এখন হয়ত সে শ্বশুর বাড়িতে বউ সেজে বসে আছে।

আমি চা পান করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম, খুকুমনি! তোমার নামটা জানতে পারি কি?"

"আমার নাম আমেনা খাতুন।"

"মাহমুদার আব্বু তোমার কি হন?"

"তিনি আমার মনিব, আমি এ বাড়ির কাজের মেয়ে।"

"কতদিন হয় তুমি এ বাড়িতে আছ?"

"দু'তিন মাস হবে। আপনি মাহমুদা আপাকে চেনেন কিভাবে?"

"আমি এ পথ দিয়ে অনেকবার আসা-যাওয়া করেছি। এ বাড়িতে মেহমান হয়েছি সেই থেকে তাকে আমি চিনি।"

"অ...তাহলে অনেক পুরোনো খাতির তাই না?"

"হ্যাঁ, তাই তো। এখন সে কোথায় আছে?'

"মাহমুদা আপুর চাকুরী হয়েছে তাঁর মামার হাসপাতালে। এখন তিনি সেখানেই থাকেন।"

"বাসায় আসে না ও?"

"আসে মাঝে-মধ্যে।"

"ওর স্বামীও কি ডাক্তার?"

"ওম্-মা! আপুর বিয়েই তো হয়নি।"

"বিয়ের জন্য কোন লোক আসেনি?"

"অনেক জায়গা থেকেই এসেছে। তিনি বিয়ে করবেন না। তাঁর ছোট ভাই এর মত জিহাদ করে শহীদ হবেন। এ জন্যই বিয়ে করতে রাজি হননি। আর

যদি বিয়ে বসেনই, তাহলে মুজাহিদের কাছে বিয়ে বসবেন, যেন জিহাদ করতে পারেন।"

"এখনও কোন মুজাহিদ আছে নাকি? সব মুজাহিদদের তো বলসেবিকরা হত্যা করে ফেলেছে। এখন সে মুজাহিদ পাবে কোথায়?"

"খোবায়েব নামক এক মুজাহিদ নাকি কথা দিয়েছে আসবে। অনেকেই বুঝিয়েছে যে, সে তো চলে গেছে, জীবিত আছে কি-না কে জানে? আর জীবিত থাকলেও তো নাও আসতে পারে। কিন্তু সে দৃঢ়তার সাথে বলে যে, মুজাহিদরা মিথ্যা বলে না, সে অবশ্যই আসবে।"

"খোবায়েব! সে তো ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য তো সরকার পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছে।"

"না! সে খোবায়েব নয়। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আপু বলেছেন, "আমার খোবায়েবের চেহারার সাথে পোস্টারের ছবির সাথে কোন মিল নেই।"

আমাদের আলাপের মধ্যে কলিং বেল বেজে উঠল। পরিচারিকা দরজা খুলতেই হারেছ মিকাইলী ঘরে প্রবেশ করলেন। অমনি আমি সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং হস্ত দুটি বাড়িয়ে দিলাম। হারেছ সাহেব আমাকে দেখে সালামের উত্তর দিতে দিতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "বাবা খোবায়েব! তুমি এখনো জীবিত আছ! সেই কতদিন হয় তোমার কোন খোঁজ খবর নেই। পত্র-পত্রিকায় তোমাদের সংবাদ পড়ি আর অশ্রু বিসর্জন দেই। এছাড়া তো কিছু করার নেই। মুজাহিদদের শাহাদাতের সংবাদ প্রতিদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে আসছে। আমি তো মনে করেছিলাম তুমিও শহীদ হয়ে গেছ। আল্লাহ্ এখনো তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন, আল্লাহ্র শোকর। তুমি এখন কোথা থেকে কিভাবে এসেছ?"

"বর্তমানে ছোট একটি কাফেলা নিয়ে উজারা অরণ্যে আছি। এর আগে আমরা উস্তুবার, উজিরাবাদ ও আরমবার্গ এলাকায় ছিলাম। জানতে পারলাম, বলসেবিকরা মিকাইলের মুসলমানদের উপর খুব জুলুম অত্যাচার করছে। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই আমরা এতদূর পথ সফর করে এসেছি। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দু'জন সাথী থানায় বন্দী ছিলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছেন, তবে সীমার বাইরে নির্যাতন হয়েছে তাদের উপর। বর্তমানে দু'জনই শয্যাগত। তা না হয় দু'চার দিনের মধ্যেই বড় ধরনের একটা হামলা করার খেয়াল ছিল। তা আর এখন সম্ভব নয়। বলুন চাচাজান! এলাকার কি অবস্থা?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, সব আলাপই হবে। চল, এখন নামায পড়ে খানা খেয়ে নেই। তারপর অনেক আলাপ হবে।" এই বলে তিনি আমার জন্য অযুর পানি ও জায়নামায নিয়ে এলেন।

অতঃপর অজু করে দু'জনে নামায আদায় করলাম। এরপর আমাকে নিয়ে গেলেন অন্দরবাটিতে। সেই পুরাতন গৃহে। যেখানে আমি আমার জীবনের ১০/১৫ দিন সময় অতিবাহিত করেছিলাম। যে গৃহে প্রথম সাক্ষাত হয় মাহমুদার সাথে এবং জিহাদের খুটি-নাটি অনেক মাসআলা আমার নিকট থেকে শুনত। এর মধ্যে কাজের মেয়ে খানা এনে হাজির করল, আমরা দু'জনে একসাথে বসে খানা খেলাম।

হারেছ মিকাইলী বললেন, "বাবা! এলাকার পরিস্থিতি খুবই জটিল। তা অল্প সময়ে বলে শেষ করা যাবে না। তবে এতটুকু জেনে রাখ, মিকাইলিতে হয়ত আর থাকা যাবে না। হিজরতের চিন্তায় আছি। এখন তোমার সাথে কথা হল, দু'একদিনের মধ্যে উজারা অরণ্যে ক্রেকডাউন দেবে। বিশেষ সূত্রে এ সংবাদ পেয়েছি। তুমি এখানে বিলম্ব না করে আগামীকাল চলে যাও। ওদেরকে হেফাজত করে আবার ফিরে এস। তখন সব ধরনের পরামর্শ হবে। আমি বললাম, "জনাব! এমন রিক্ত হস্তে আমি ফিরে যেতে পারি না। দু'জন সাথী মরণাপন্ন অবস্থা! তাদের ঔষধ অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া দু'এক বেলার খাবার আছে। সেখানে খাদ্য নাই, হাটবাজারেও যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কমপক্ষে এক সপ্তাহের খাবার ও ঔষধ অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। তারপর তাদেরকে ৭/৮ দিনের জন্য অন্য কোথাও নেয়া যেতে পারে।

আমার কথা শুনে হারেছ মিকাইলী বললেন, "কথা তো সত্যই! তবে এ মুহূর্তে কি করা-যায়? এখন তো শহরে কারফিউ, ঢোকা যাবে না। আচ্ছা আমি আগামীকাল সকাল আটটার দিকে এগুলোর ব্যবস্থা করে দেই। তুমি চলে যাও।"

পরদিন সকাল নয়টায় হারেছ সাহেব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী নিয়ে এলেন এবং বললেন, "বাবা! জলদি যাও, দেরী করো না। ওদেরকে নিরাপদে রেখে অবশ্যই আসবে। অতঃপর সালাম দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে উজারা অরণ্য অভিমুখে ছুটে চললাম।

॥ একচল্লিশ ॥

আমি হারেছ মিকাইলীর বাড়ি থেকে চলে আসার একটু পরেই মাহমুদা বাড়ি এসে আমার কথা জানতে পারে। তারপর পরিচারিকাকে তার রুমে ডেকে এনে আমার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল। পরিচারিকার সাথে আমার যে আলাপ হয়েছে, তা এক এক করে সব শুনল।

মাহমুদা আমার কথা শুনা মাত্র তার প্রতিটি শিরা-উপশিরা দিয়ে উষ্ণ শোণিত ধারা তড়িৎ বেগে ছুটাছুটি করতে লাগল। সে যেন কি পেয়েও হারিয়ে ফেলেছে। আমি তার সাথে দেখা না করে চলে আসব এটা তার বিগলিত অন্তর কিছুতেই মানছিল না। সে কারো কাছে কিছু না বলে আমার অশ্বের পদচিহ্ন ধরে হাঁটতে লাগল। সে আমাকে খুঁজে বের করার প্রত্যয় নিয়ে উন্মাদিনীর মত চলছে।

মাহমুদার আম্মা পরিচারিকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাহমুদার এ অসময়ে আসার কারণ কি? পরিচারিকা মাহমুদার আম্মার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল, আম্মা! আমি আপুকে এই অসময়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "গত রাত্র থেকেই কেমন যেন একটা অস্থির ভাব লাগছিল। রাত্রে বেশী ঘুম হয়নি। শুধু এ পাশ ও পাশ করে রাত কাটিয়েছি। সকালে গোসল করে, সামান্য নাস্তা খেয়ে অফিসে গিয়েছি। কিন্তু কেন যেন কিছুই ভাল লাগছিল না। অবশেষে মামার কাছ থেকে দু'ঘন্টার ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছি। আসার সময় ছওদাকেও (মামাত বোন) বলে আসিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যেতে হবে।"

বাড়ি থেকে হাসপাতালের দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার। মাহমুদার আম্মা তার জন্য নাস্তা তৈরী করতে লাগলেন।

অল্প কিছুক্ষণ পর মাহমুদার আম্মা পরিচারিকাকে ডেকে বললেন, "আমেনা! তোর আপুকে নাস্তা নিয়ে দাও।" আমেনা নাস্তা নিয়ে মাহমুদার রুমে গিয়ে দেখে মাহমুদার ব্যাগ আর খবরের কাগজ টেবিলে পড়ে আছে, মাহমুদা নেই। আমেনা ভাবছে হয়ত বাথরুমের জরুরত সারতে গেছে। সে নাস্তাগুলো ঢেকে রেখে পানি দিয়ে গৃহকর্তীর অন্যান্য কাজে সাহায্য করতে লাগল। মাহমুদার আম্মা নাস্তার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে উত্তরে বলল, "নাস্তা দিয়ে এসেছি।"

মাহমুদাই এ বিশাল ধন-ভান্ডারের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। হারেছ সাহেবের কোন সন্তান নেই। ১৪ বৎসর বয়সের ছেলে মাহমুদ দু'বছর আগে শাহাদাত বরণ করেছে। এখন মাহমুদাই তাদের আশা ভরসা। ভাল একটি পাত্রের হাতে মাহমুদাকে তুলে দিয়ে তার হাতে সংসার বুঝিয়ে দেবেন, এটাই ছিল পিতামাতার ইচ্ছা। মেয়ে রাজি না হওয়াতে এ আশা পূরণ হচ্ছে না।

প্রায় একঘন্টা অতিবাহিত হলে আমেনা মাহমুদার রুমে ঢুকে দেখে খাবার, ব্যাগ ও বিছানাপত্র অপরিবর্তিত। আমেনা বিস্মিত হয়ে বাথরুম ও অন্যান্য কামরা তালাশ করে তার কোন সন্ধান পেল না। মাহমুদার তো পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই নেই। তাহলে গেল কোথায়? পরিচারিকা চিন্তিত মনে মাহমুদার আম্মার নিকট গিয়ে বলল, "আম্মা! মাহমুদা আপু তো নাস্তা করেননি, তিনি কোথায়?"

"কেন? সে তার রুমে নেই?"

"দেখছি না তো।"

"মনে হয় টয়লেটে গেছে।"

"সেখানেও তো নেই, আমি খুঁজেছি।"

"না রাগ করে অফিসে চলে গেছে?"

"ব্যাগ যে টেবিলের উপর রাখা! ব্যাগ ফেলে কি চলে যাবে?"

"ব্যাগ ফেলেও তো যাওয়ার কথা নয়, আর ভুলে রেখে যাওয়ারও কথা নয়। নাকি বিকালে আবার আসবে বলে ব্যাগ রেখে গেল?"

"তাতো জানি না।"

"ওর আব্বু কোথায়?"

"তাকে তো মেহমান যাওয়ার একটু পরেই বাজারের পথ ধরে যেতে দেখেছি। মনে হয় বাজারে গেছেন।"

"ঠিক আছে, চিন্তার কারণ নেই, সে অফিসেই গেছে। তোমার কাজগুলো সেরে নাও।" পরিচারিকা তার অসম্পূর্ণ কাজগুলো সমাপ্ত করতে চলে গেল।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল। হারেছ মিকাইলী এখনো বাড়ি ফেরেননি। বাজারে এত বিলম্বের হেতু কি তা বুঝতে পারেনি। অন্যদিন তো বাজারে এত দেরি করেন না। মাহমুদার আম্মা চিন্তিত হয়ে পরিচারিকাকে বললেন, "মা আমেনা! তুমি এক্ষুণি বাজারে গিয়ে তোমার চাচাজানকে ডেকে পাঠাও। আর মাহমুদা অফিসে গিয়েছে, নাকি তার মামার বাসায়, তাও খবর নিয়ে এস।"

আমেনা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দৌড়ে গেল বাজারে। একি! আজকের বাজার অন্যদিনের বাজারের মত নয়। অনেক দোকান পাট বন্ধ। লোক চলাচল তেমন নেই। কাচা বাজার আর ঔষধের দোকান ছাড়া অন্যসব দোকান প্রায়ই বন্ধ। পুলিশ আর আর্মীদের গাড়িগুলো সাইরেন বাজিয়ে পাগলের মত টহল দিচ্ছে। আমেনা বাজারে তালাশ করে হারেছ সাহেবকে না পেয়ে চলে গেল মাহমুদার মামার বাসায়। সেখানেও দু'জনের একজনকেও না পেয়ে বাড়ি ফিরে এল। তখন বিকাল ৩টা।

হারেছ মিকাইলী বিকাল ৪টায় বাসায় ফিরে স্ত্রীর কাছে বললেন, "শহরে থমথমে ভাব বিরাজ করছে। অনেকেই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। থানা প্রাঙ্গনে, সেনা ক্যাম্পে ও হাসপাতালে পুলিশ আর আর্মীদের ভীড়। জানতে পারলাম গত রজনীতে উজারা অরণ্যে মুজাহিদদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। উক্ত যুদ্ধে অনেক পুলিশ ও বলসেবিক আর্মী নিহত হয়েছে। আর আহত হয়েছে প্রচুর। আবার এটাও শুনলাম যে, মুজাহিদদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আহা! খোবায়েবের

অবস্থা না জানি কি? সে কি সহী-সালামতে পৌঁছেছে, না কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। আয় আল্লাহ্! তুমি তাকে হেফাজত কর।"

মাহমুদার আম্মা তার পিতার কাছে সব ঘটনা খুলে বললে পিতা বললেন, "হাসপাতালে আহত রোগীদের চিকিৎসা চলছে। সেখানে আর্মীদের গাড়ি ঘোড়ার খুব আনাগোনা দেখছি। জনসাধারণ কাছে যেতে পারে না। ডাক্তারগণ আহতদের চিকিৎসায় খুবই তৎপর। ইমারজেন্সি বিভাগ ছাড়াও আউটডোরের ডাক্তারগণ তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় মাহমুদা রোগীদের সেবায় নিয়োজিত। এখন তার খোঁজ নেয়া সম্ভব নয়।" হারেছ সাহেবের কথা শুনে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, মাহমুদা হাসপাতালেই রোগীদের সেবায় ব্যস্ত আছে। তাই খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন মনে করেননি।

আমি নিরাপত্তার জন্য মেইন রোড পরিহার করে গ্রাম্য মেঠো পথে চলছি। চলতে চলতে কখন যে পূর্বের পথ হারিয়ে ফেলেছি তা বুঝতেই পারিনি। বিকাল তিনটার দিকে আমি বনে প্রবেশ করলাম। ঘন বন। পথ চলা যায় না। অশ্বের শরীর কাঁটার আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। আমার অবস্থাও তদ্রূপ। আমার জামা কাপড় কেবলই আঁকড়ে ধরে। অন্য কোন পথও নেই যে, সেদিক দিয়ে যাব। এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এতক্ষণে সাথীদের পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পথ ভুলে এলোপাথাড়ি চলার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রম ক্লান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র থেকে শ্লেষ্মা ঝরছিল। বন্য হায়েনাদের ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে গা শিউরে উঠছে। এতক্ষণে ঘন অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেছে। পথ চলা আর সম্ভব নয়। অশ্ব থেকে অবতরণ করে তার বাগডোর খুলে দিলাম। অশ্বটি লতা গুল্ম খেতে লাগল। আমিও অস্ত্রটি হাতে নিয়ে অশ্বকে অভয় দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক টুকরা রুটি খেয়ে জঠর জ্বালা নিবারণ করলাম।

মাঝে মধ্যে হিংস্র প্রাণীর দুর্বল প্রাণীদের উপর আক্রমণের শব্দ পাচ্ছিলাম। বন-জঙ্গল মাড়িয়ে কি যেন ছুটাছুটি করছিল। সে সময় ঘোটক কান দুটি খাড়া করে টগবগিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভয়ে কাঁপছিল। আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে সোহাগ করে অভয় দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ ঘোড়াকে পাহারা দিতে দিতে ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘুমের অত্যাচার সইতে না পেরে একটি বৃক্ষমূলে বসে, বৃক্ষে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার পদাঘাতের ও হ্রেষা ধ্বনিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চেয়ে দেখি একটি নেকড়ে আমাকে ধরার জন্য লাফ দিচ্ছে আর অশ্ব পদাঘাতে নেকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করছে। আমি আমার লোড করা অস্ত্রটিতে ট্রিগার

টানলাম। চোখের পলকে ২৮ রাউন্ড গুলি বেরিয়ে নেকড়েটিকে ঝাঁঝরা করে নিথর করে দিল। অশ্বটি আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তারপর অঘুম নয়নেই বাকি রাত কাটিয়ে দিলাম।

ভোরে ফজরের নামায আদায় করে আবার চলতে লাগলাম। আহা! কেন যেন আমার হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিস্তেজ, নিঃসার ও অবস হয়ে আসছে। কি যেন আমার হারিয়ে গেছে। কি যেন আমা থেকে চলে গেছে। আমার অন্তর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমার অবস্থা বর্ণনা করার কোন ভাষা আমার অভিধানে সংরক্ষণ নেই।

অতীতে মা হারালাম, পিতা হারালাম, হারিয়েছি প্রিয়তমা ছায়েমাকে কিন্তু এত বেচাইন আর অশান্তি অনুভব করিনি। দিলের মধ্যে বারবার গাওয়া দিচ্ছিল, যে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এভাবে মনমরা ও নিরানন্দ ভাব নিয়ে কয়েক ঘন্টা চলার পর পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে মৃদুমন্দ অনিল হিল্লোলে এক খুশবু ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত অরণ্যে। এ খুশবু আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশের সাথে সাথে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। কারণ এটা কোন ফুলের বা আতরের গন্ধ নয়। এটা শহীদের রক্তের গন্ধ, জান্নাতী গন্ধ। আমি সে গন্ধের উজান বেয়ে অগ্রসর হয়ে দেখি সাথীদের লাশ রক্তে গোসল করে এদিক ওদিক শুয়ে আছে। এরই একটু দূরে পড়ে আছে দুশমনের অসংখ্য লাশ। চেয়ে দেখি আমার খিমার এটি কোণা নিয়ে বাতাস খেলা করছে। কয়েক কদম এগিয়ে দেখি আমার দ্বিতীয় ছায়েমা রক্তাক্ত অবস্থায় বিদায় নিতে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে হাত দুটি বাড়িয়ে আমাকে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "প্রিয়তম! তোমার উসিলায় আমি ঈমান পেয়েছি আর তোমার উসিলায়ই শাহাদাদের নেয়ামত পেয়েছি। আমার আশা আল্লাহ্ পুরা করেছেন। আমার আশ-পাশের সাথীরা সবাই জান্নাতে চলে গিয়েছেন। আমাকে নেয়ার জন্য বেহেস্তের হুর-গেলমানরা এসেছিল। আমি ওদেরকে এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছি যে, আমার স্বামীর সাথে শেষ দেখা ও শেষ কথা না বলে যাব না। তাই তারা ফিরে গিয়েছিল। আপনি আসার সাথে সাথে সবাই চলে এসেছে। এখন আর থাকা যাবে না। আপনি জিহাদ করে শহীদ হয়ে আমার নিকট চলে আসুন। এখন আমি যাচ্ছি।" এই বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে কলমায়ে শাহাদাত পাঠ করে চির নিদ্রায় শায়িত হল। ফুটন্ত গোলাপের মত চেহারাটা তার নিথর হয়ে গেল। আমি আমার চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে সকলের জানাযা পড়ে চলে এলাম।

হায়রে দুঃখ! এক দেড়শ গজ আসতে না আসতেই দুশমনের পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণ হয়ে আমার অশ্ব জমিনে লুটিয়ে পড়ল। ভাগ্যক্রমে আল্লাহ্ আমাকে অক্ষত রাখলেন। এবার সবকিছু হারিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পায়ে হেঁটে চলছি। বিকাল চারটার দিকে এক মহীরুহের তলায় বসে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলছি। পাঁচটার দিকে এক স্থানে এসে হঠাৎ চেয়ে দেখি একটু দূরে ফুটফুটে চাঁদের মত এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী ধুলা-বালুতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ বিজন বনে একি মানুষ না পরী—তা বুঝতে পারিনি। সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দেখি মেয়েটি ক্ষুদ-পিপাসায় কাতর হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি মশক থেকে পানি বের করে নাকে মুখে ছিটিয়ে দিলাম ও পান করালাম। তারপর কয়েক টুকরা রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে নরম করে তাকে খাওয়ালাম। এখন সে সোজা হয়ে বসল। মেয়েটির চেহারা আমার কাছে পরিচিতি পরিচিত মনে হল। কিন্তু চিনতে পারলাম না। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বোন তুমি একাকিনী এখানে কেন? যাবে কোথায়?" সে উত্তরে বলল, "আমি ওই বনে যাব, আমার প্রিয়জনকে খুঁজতে যাব।" তার কথাবার্তায় বুঝলাম সে বিকারগ্রস্ত। আমি তাকে নিয়ে ধরে ধরে চলছি। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আমাদের এক সাথীর বেঁচে যাওয়া ঘোড়া কোথা থেকে ছুটে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। আমি মেয়েটিকে ঘোড়ার সামনে বসিয়ে চলতে লাগলাম। রাত দু'টায় এসে হারেছ মিকাইলীর বাড়িতে পৌঁছলাম।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

আমি অশ্ব থেকে অবতরণ করে বললাম, "এখন তো আর সামনে যাওয়া যাবে না। এখানে আমরা রাত্রি যাপন করব। আগামীকাল তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেব। অতএব এখন তুমি অশ্ব থেকে নিচে নেমে এসো। নামতে না পারলে ধর আমার হাত।" সে আমার দিকে রোষে উঠে বলল, "তুমি আমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলে কেন? আমাকে বনে পৌঁছে দাও। আমি বনে বনে ওকে খুঁজে বেড়াব।"

"সে বনে বাঘ, ভাল্লুক, বনমানুষ, আরো কত হিংস্র প্রাণীর বাস। তুমি এ গভীর অরণ্যে কাকে খুঁজবে? তুমি এখানে অবস্থান কর। আমি তাকে খুঁজে এনে দেব। বল কাকে খুঁজবে?"

"আমি খোবায়েবকে খুঁজব। সে আমাকে জিহাদে নিয়ে যাবে। সে একজন বড় মুজাহিদ। তাঁরই অপেক্ষায় আমি তিলে তিলে, পলে পলে ক্ষয় হচ্ছি।"

"খোবায়েবকে খুঁজছ তুমি? তাকে চেন কি করে?"

"আব্বু তাকে বাঁশ বাগান থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। আমি তাকে আদর যত্ন করে কয়েকদিন রেখেছিলাম। তারপর একদিন সে অজানা পথে ডানা মেলেছে। যাবার সময় ওয়াদা করেছিল আবার এসে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি তার সাথে জিহাদ করে মাহমুদের মত শহীদ হব।

ওর কথাবার্তা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, এ সুন্দরী তো অন্য কোন কাননের ফুলপরী নয়। সে তো ছায়েমার ছায়া মাহমুদা। আমি ওকে বললাম, "মাহমুদা! অমন পাগলামী করো না, ঘোড়া থেকে নেমে এস, তারপর কথা হবে।"

আমাদের কথোপকথনের সময় মাহমুদার আম্মা জেগেছিলেন। মাহমুদার ও দেশের চিন্তায় তিনি ঘুম যেতে পারেননি। তিনি আস্তে আস্তে হারেছ সাহেবকে জাগিয়ে বললেন, "দেখুন তো চাতালে দাঁড়িয়ে কারা কথা বলছে? হারেছ সাহেব গেট খুলে বাইরে এসে দেখেন আমি বাগডোর ধরে দাঁড়িয়ে আছি আর মাহমুদা অশ্বপৃষ্ঠে বসা। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "খোবায়েব! তুমি এসে গেছ? মাহমুদাকে পেলে কোথায়?" এবার মাহমুদার চৈতন্য ফিরে এল এবং বলল, খোবায়েব ভাই! তুমি? এতক্ষণ যে পরিচয় দাওনি?"

"আমি তো বলছি অশ্ব থেকে নেমে এস, তারপর আলাপ হবে।"

"তুমি বলবে না যে, তুমি খোবায়েব!"

"হাঁ, এবার বলছি, আমি খোবায়েব। এবার নামো।"

মাহমুদা অশ্ব থেকে অবতরণ করল। আমি ঘোড়াটি একটি বিটপী মূলে বেঁধে রেখে তাদের সাথে অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। হারেছ ও হারেছ পত্নী বিস্ময়ে হতবাক। কি বলবে না বলবে তা স্থির করতে পারেননি। উভয়ে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হারেছ সাহেব পত্নীকে বললেন, "এরা ক্ষুধার্ত। এদের খানার ব্যবস্থা কর, তারপর সব জানা যাবে। তিনি তাড়াতাড়ি কয়েকটি রুটি তৈরী করে তরকারি দিয়ে সামনে হাজির করলেন। আমরা দু'জনে মিলে রুটি খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করলাম।

এবার হারেছ মিকাইলী খুবই শান্তকণ্ঠে বললেন, "বাবা খোবায়েব! আমার মনে হাজার প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। কোনটা রেখে কোন প্রশ্ন করব এ নিয়ে চলছে দ্বন্দ্ব। কাজেই তোমার পক্ষ থেকেই বল।

তারপর আমি এক এক করে অরণ্যে প্রবেশের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলাম এবং শহীদ সাথীদের কথা বললাম। ছায়েমার কথা বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠ

চিরে কান্না বেরিয়ে এল। সে আমার বুকে বুক রেখে, শেষ নসিহত জানিয়ে কলেমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এ ঘটনা শুনে সবাই কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলেন। মাহমুদা মেরীর পরিচয় জানতে চাইলে বললাম, সে ছিল ভুবন পাগল করা এক অপূর্ব সুন্দরী খৃষ্টান ফাদারের একমাত্র আদরের কন্যা। সে আমার দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে পিতার অমানুষিক জুলুম, নির্যাতন ভোগ করছিল। তারপর আমি তাকে জালেমদের হাত থেকে মুক্ত করে আনি। অতঃপর সে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে। তার ধন-সম্পদ আর সুখ-শান্তির কোন অভাব ছিল না। ছিল না দাস-দাসী, চাকর-বাকর আর ভক্তদের অভাব। দ্বীনের জন্য সে তার এ সবকিছু লাথি মেরে তৌহিদের দিকে ফিরে এসেছে। তার উসিলায় উস্তুবার গির্জার অনেক পাদ্রী, রাহেব, রাহেবা ও ফাদারগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে। উস্তুবার ও উজিরাবাদের খৃষ্টানদের গর্বিত ঘাড় মটকে দিয়েছে। সেখানকার ছোট বড় সবগুলো গির্জা এখন ভক্তদের অভাবে বিলাপ করছে। সে ইসলাম গ্রহণ করে তার নাম রেখেছিল ছায়েমা। যে নামটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সেই নামটিই সে চয়ন করেছে। আমি তাকে মাঝে মধ্যে মেরী গমেজ বলে ডাকলে চরম রেগে যেত। সে আমার কলিজা বিদীর্ণ করে জান্নাতের উচ্চ মকাম দখল করে নিয়েছে।

অতঃপর হারেছ সাহেব অতীতের সমস্ত কারগুজারী জানতে চাইলেন। আমি হারেছ মিকাইলীর বাড়ি থেকে এ্যাম্বুলেন্সে কফিনের ভিতর অস্ত্র নিয়ে যাওয়া থেকে আম্মার জানাজা, ছায়েমাকে হারানো, বৌদ্ধ বিহারে ইসলাম প্রচার, ফুফাজির সাথে সাক্ষাত, আনোয়ার পাশার কাফেলার সাথে যোগদান। ছায়েমার সাক্ষাৎ ও বিবাহ। তারপর লড়াই ও ছায়েমার শাহাদাৎ এবং তার আখেরী নসিহত, এর সবই স্ববিস্তারে আলাপ করলাম। হারেছ সাহেব, তাঁর পত্নী ও মাহমুদা পাশে বসে আমার জীবন কাহিনী শুনে অশ্রু ঝরাচ্ছিল এবং নির্গত করতেছিলেন ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস।

এসব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সুবহে সাদিকের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। অতঃপর মাহমুদা ও তার আম্মা নামায পড়তে চলে গেলেন পাশের ঘরে। আমি হারেছ সাহেবকে নিয়ে এই ঘরে নামায পড়ে নিলাম।

ফজরের নামায আদায় করে বললাম, চাচাজান! সারারাত অঘুম নয়নে কাটিয়েছি। এখন যদি একটু না ঘুমাই তাহলে ব্রেইনে খুব চাপ পড়বে। মাথায় কোন কাজ করবে না। তাই তিন চার ঘন্টা ঘুমিয়ে নেই, এর মধ্যে কোন ডাক দেবেন না। হারেছ সাহেব বললেন, “বাবা! একটু চা বিস্কুট খেয়ে ঘুম যাও।”

এই বলে তিনি মাহমুদাকে ডেকে বললেন, "মামণি! চা-বিস্কুট নিয়ে এস।" মাহমুদা চা বিস্কুট এনে দস্তরখানে রেখে পাশের চেয়ারে বসল। আমি কয়েক পিস বিস্কুট চায়ে ভিজিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম এবং মাহমুদাকে বললাম, "তুমিও তো সারারাত জেগেছিলে, তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও।" তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে অতীতের নানা কথা, নানা কাহিনী ভাবতে ভাবতে কখন জানি নিদ্রাপুরে চলে গেলাম।

দুপুর ১২ টা। মাহমুদা গরম পানি, তোয়ালে, সাবান হাম্মানখানায় রেখে আমার নিকট গিয়ে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাচ্ছে আর ডাকছে, "ভাইজান! ভাইজান! উঠুন, গোসল করুন। নামাযের সময় হয়ে আসছে। তার ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি সে আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। আমি রাগে, গোস্বায় ও লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলাম এবং বললাম, "মাহমুদা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর! নির্জন গৃহে অমন করে চোরের মত আসা গোনাহে কবিরা। শরীয়ত এটাকে জায়েয করেনি। তুমি এখন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত সুন্দরী তরুণী। যে কোন যুবকের মন-প্রাণ তোমার সৌন্দর্যের গোলাম হয়ে যাবে। তোমার পর্দা করে চলা ফরজ। শয়তান আমার মনের পবিত্রতাকে যে কোন সময় হরণ করতে পারে। অতএব. আমি যে কয়দিন আছি, সে কয়দিন আমাকে চোখের গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকতে দাও।"

আমার কথা শুনে মাহমুদার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। চেহারা পাকা আনারের মত লালবর্ণের হয়ে গেল। আমি জানি তার স্বভাব। সে একটুতেই রাগ করে বসে। অভিমান যেন তার অর্জিত সম্পদ। তার হাবভাব বুঝতে পেরে আমি অনেকটা রাগ সামলে নিয়ে নরম কণ্ঠে বললাম, "মুসাফিরের সাথে গৃহঅলার রাগ করা কি শোভা পায় সুন্দরী?"

আমার কথা শুনে একটু মুচকি হেসে উড়নাঞ্চলে মুখ ঢেকে বলল, "মুসাফির ভাইয়া! আপনার সাথে আমি রাগ করব কেন? আমি আমার মনের সাথে রাগ করছি এবং ধিক্কার দিচ্ছি। আর আপনাকে বলছি, আপনি আস্ত একজন নেমক হারাম। আমি আপনাকে ভায়ের মর্যাদা দিয়েছি। ভাই শাহাদাৎ বরণ করার পর সে ব্যথা ভুলতে পারিনি। আপনাকে পেয়ে সে ব্যথা ভুলেছি। ভেবেছিলাম এক ভাই এর পরিবর্তে আর এক ভাই পেয়েছি। আপনিও আমার সাথে ভাই সুলভ আচরণ করেছিলেন। এখন দেখি দীর্ঘদিন জিহাদের ময়দানে ঘুরে ঘুরে নিষ্ঠুর হয়ে গেছেন। এতদিন পেরিয়ে গেল, একটিবার আসেননি এবং হতভাগিনী বোনটির কোন খোঁজ খবর নেননি। আমি আপনার চিন্তায় তিলে তিলে মরছি। আপনার ভালবাসা আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এখন একটু কাছে

আসব, তাও বাধা দিচ্ছেন। আপনি তো ইনশাআল্লাহ্ বলে পাক্কা ওয়াদা করেছিলেন, কথা দিয়েছিলেন, আবার এসে আমাকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যাবেন। সে ইনশাআল্লাহর তো মূল্য দিলেন না। এখন বুঝতে পারলাম, মুজাহিদরাও মিথ্যা ওয়াদা করে।"

মাহমুদার কথা শুনে না হেসে পারলাম না। আমি বললাম, আরে পাগলিনী! ইনশাআল্লাহ্র অর্থ হল, আল্লাহ্ চাহেত। ইনশাআল্লাহ্ বলে কোন ওয়াদা করে যদি আদায় না করতে পারে তবে গোনাহ হয় না। মুসলমান মাত্রই ওয়াদার আগে ইনশাআল্লাহ্ বলতে হয়।

"হুঁ! আমি কি একদম ছোট্ট খুকী, কিছুই বুঝি না? ইনশাআল্লাহ্ বলে ওয়াদা করা হল পাক্কা ওয়াদা। এটা পালন করতেই হয়। এখন তুমি আমাকে মিছামিছি বলে বুঝাতে চাচ্ছ।"

"আমি মিথ্যা বলিনি সুন্দরী। মাসআলা যা তাই বলছি। আমার ওয়াদা ছিল তাই এসেছি। এখন আবার অত অভিযোগ কেন?"

"এসেছ তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাই এর সামনে বোন যেতে পারবে না, তা আবার পেলে কই?"

"শোন! ভাই ডাকলেই ভাই হয় না। যেমন, ভাই ডাকলেই যদি ভাই হত তাহলে ওয়ারেশী সম্পত্তির ভাগ পেত। আসলে কি ডাকা ভাইএ ওয়ারিশ পায়? শোন স্বউদর ভাই, সতাল ভাই, আর দুধ ভাই ছাড়া যত ভাই আছে সকলের সম্মুখে যাওয়া হারাম। কেননা এসব ভাই এর নিকট বিয়ে বসা জায়েয।"

"তাহলে তোমাকেও বিয়ে করা যাবে তাই না?"

"অবশ্যই।"

"তাহলে তাই করা হবে। তবু জিহাদে যাব। জিহাদ করব।"

"বিয়ের আগে কিন্তু দেখা সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনা জায়েয নয়। বুঝলে?"

"আবার তুমি একই কথা বলছ। মনে হচ্ছে তুমি বহুত বড় পণ্ডিত। দশ গেরামের মোল্লাহ্। কথায় কথায় হাদীস কও। যাও পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে গোসল কর গে।"

আমি হাম্মামখানায় গিয়ে দেখি, গরম পানি, সাবান ও তোয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। বহুদিন পর গরম পানি পেয়ে মনের আনন্দে ভাল করে গোসল করলাম। তারপর কাপড় কাঁচতে উদ্যত হলে সে হাম্মামখানায় প্রবেশ করে আমার হাত থেকে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "তুমি এখন ভাল মানুষের মত চলে যাও। তা না হয় কিন্তু...।"

"কিন্তু আবার কি?"

"কাপড় ভিজিয়ে দেব, আবার গোসল করাব।"

ওর দুষ্টামী দেখে আমি ঘরে চলে এলাম। সে কাপড়গুলো সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে রোদে শুকাতে দিল। আমি রুমে গিয়ে যোহরের নামায আদায় করলাম। হারেছ সাহেব এরই মধ্যে বাজার থেকে এলেন। তারপর দু'জনে একসাথে বসে আহার করলাম আর মাহমুদা পরিবেশন করে খাওয়াল।

॥ তেতাল্লিশ ॥

আমি হারেছ মিকাইলীকে এলাকার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "বাবা খোবায়েব! এলাকার অবস্থা খুবই খারাপ। তা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই বেদনাদায়ক। এদেশে মুসলমান হয়ে, মুসলমান পরিচয় দিয়ে থাকা যাবে না। গত ক'দিন আগে বলসেবিকরা হঠাৎ তল্লাসি চালিয়ে কয়েকটি গ্রাম থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি কুরআন শরীফ জব্দ করে। ঐ সব গ্রামে কেউ একটিও কুরআন শরীফ লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এসব কুরআন শরীফ লক্ষ জনতার সম্মুখে স্টেডিয়ামের মধ্যে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ঘোষণা করে, "কারো বাড়িতে বা কারো জিম্মায় যদি কোন কুরআন শরীফ এমন কি আরবী লিখা কোন বই পুস্তক পাওয়া যায় তাহলে তাকে প্রকাশ্য দরবারে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হবে।"

উক্ত ঘোষণার তিনদিন পর, হঠাৎ অপর এক গ্রামে ঢুকে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি কুরআন পায়। তারপর উক্ত বাড়ির তিনজন মুসল্লীকে ধরে এনে অকথ্য নির্যাতন করে এবং হাজার হাজার মানুষের সামনে নির্মমভাবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে শহীদ করে দেয়।

উক্ত তিনজনকে ফাঁসি দেয়ার সময় আমি নিকটেই ছিলাম। ওরা ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "ওহে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাই ও বোনেরা! কুরআন রাখার অপরাধে আজ আমরা ফাঁসির আসামী হচ্ছি। কোথায় ঐ সমস্ত নামধারী উলামায়ে কেরাম! যারা মসজিদে মসজিদে, মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় বলে বেড়াত যে, বলসেবিকরা আমাদের বন্ধু। তারা আমাদেরকে ধর্মীয় কাজ করতে বাধা দেয় না। তোমরা তাদেরকে মেনে নাও। তোমাদের কথা মেনে নিয়ে আমরা আমাদের এলাকা থেকে আমার প্রিয় নবীর যোগ্য উত্তরসূরী ও আল্লাহ্র মকবুল বান্দা, আল্লাহ্র দ্বীনের হেফাজতকারী মুজাহিদদেরকে তাড়িয়েছি। তোমাদের কথা মেনে, তোমাদের দেয়া ফতোয়ার উপর আমল করে আজ আমরা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে যাচ্ছি। কোথায় ঐ সমস্ত

মুনাফেক আলেমরা! তোমরা আজ তোমাদের যুবতী মেয়েদেরকে বলসেবিকদের হাতে তুলে দিয়ে জীবন রক্ষা করছ। তোমরা আজ আমাদের অন্তিম সময়ে আমাদের কাছে আসো। তোমাদের মস্তক কেটে আমরা ফুটবল খেলে ক্লান্ত হয়ে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে চির বিশ্রাম নেব। ওহে ধর্মপ্রাণ এলাকাবাসী! তোমরা যদি মুসলমান হিসাবে বাঁচতে চাও, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে চাও, মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকার হেফাজত করতে চাও তাহলে যার কাছে যা আছে তা নিয়ে বলসেবিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড় আর মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকা থেকে ঐ সমস্ত সুন্নতী পোষাকধারী মুনাফেক আলেমদেরকে টেনে বের করে কুত্তার মত জবাই করে তাদের শরীর টুকরা টুকরা করে চিল শকুনকে বিলিয়ে দাও।

এসব কথাগুলো বলতে বলতে তিনজন তিনটি নির্মিত ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে নিজ হাতে ফাঁসির বেড়ী গলায় পড়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছিল, “হে আমার মাওলা! তোমার কালামের হেফাজত করতে গিয়ে আজ আমরা হাসিমুখে ফাঁসির বেড়ী গলায় ধারণ করেছি। হে প্রভু, তুমি সাক্ষী থাক! সাক্ষী থাক! সাক্ষী থাক!” অতঃপর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর জল্লাদরা পাদানী সরিয়ে দিলে কয়েক মিনিটেই তাদের শরীর শান্ত হয়ে গেল।”

মিকাইলী সাহেব আরো বললেন, “বলসেবিকরা আইন জারী করেছে, কেউ পাঞ্জাবী, জুব্বা, সেলোয়ার, পাগড়ী পরতে পারবে না। কারণ এসব পোশাকে কাপড় বেশী খরচ হয়। সকলেই শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরবে। নারী-পুরুষের পোষাকের কোন তারতম্য নেই। শাড়ি, বোরকা, উড়নী ইত্যাদি ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সবাইকে মাথা মুণ্ডিয়ে রাখতে হবে, মাথায় চুল থাকলে তৈলের অপচয় হয়। সরকারের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা যাবে না।” তিনি আরো বলেন—

“দেশের সমস্ত মানুষ সরকারের। জায়গা, জমি, ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই সরকারের। সকলেই শ্রম দেবে, সরকার তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা দেবে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকবে না। যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার যুবতীদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে একটি ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করবে। পুরুষরা তাদের যৌন চাহিদা মিটানোর জন্য উক্ত ব্যারাকে যাবে এবং চাহিদা মিটিয়ে চলে আসবে। সেসব মহিলাদের উদরে সন্তান হলে তাদেরকে শিশুসদনে রেখে লালন পালন করবে। এরাও বড় হলে কাজ করবে, সরকার খাওয়াবে। এভাবে কেউ মালিক আর কেউ শ্রমিক থাকবে না। সমাজে সবাই হবে এক সমান। ধনী-গরীবের কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না।” আমি

জিজ্ঞাসা করলাম, "যৌন চাহিদা কোয়াটার কি আপনাদের এলাকায় চালু হচ্ছে?" তিনি বললেন, "না। এখনো চালু হয়নি, তবে দু'এক মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। শুনতে পাচ্ছি মিকাইল শহরের জামেয়া ইসলামিয়ার পাঁচতলা ভবন এই কাজের জন্য নির্বাচন করেছে।"

"মাদ্রাসাটি কি এখন চালু নয়?"

"না। এটাতো অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে।"

"উস্তাদরা কোথায়?"

"যারা বলসেবিকদের সমর্থন করেনি, তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছে। আর যারা বলসেবিকদের মতবাদ মেনে নিয়েছে তারা কিছুদিন ভালই ছিল। তারপর যখন ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তখন তারা যার যার বাড়ি চলে গেছে। এখন তারা তুলার চাষ করে। এই মাদ্রাসারই মুফতী সাহেব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করার পর অনেক টাকা পেয়েছিল বলসেবিকদের পক্ষ থেকে। তারপর আনোয়ার পাশার গোয়েন্দা বাহিনীরা তাকে জবাই করে দিয়েছে।"

"তাহলে এ মাদ্রাসার কোন আলেম জিহাদে যায়নি, তাই না?"

"না, এমনটি নয়। আনোয়ার পাশার জিহাদের দাওয়াত পেয়ে ৩/৪ জন আলেম ও শতাধিক ছাত্ররা গোপনে গোপনে আনোয়ার পাশার দলে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর অন্য উস্তাদরা জানতে পেরে বলছিল, এসব ছাত্রদের কারণে মাদ্রাসার তালিম বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই তাদেরকে রাখা যাবে না। তারপর তাদের নামের তালিকা করে কমিউনিস্টদের হাতে পৌঁছে দেয়। অতঃপর একদিন পুলিশ এসে তালিকাভুক্ত ৫/৭ জন ছাত্রকে ধরে নিয়ে যায় এবং শহীদ করে ফেলে। তারপর থেকে অন্যান্য ছাত্ররা মাদ্রাসায় যায়নি। ঐ ঘটনার পর থেকে ছাত্রদের আর কোন খোঁজ পাইনি। মনে হয় এরা সবাই শহীদ হয়ে গেছে।"

"যেসব এলাকায় যৌন চাহিদা শিবির স্থাপন করেছে, সেখানকার মানুষের প্রতিক্রিয়া কি?"

"সেখানকার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ এটাকে খুব ভাল মনে করে আবার কেউ ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারে না। যেসব মানুষ তার মাকে, বোনকে এবং নিজের স্ত্রীকে সেসব ক্যাম্পে দিতে রাজি হয়নি, তাদের শহীদ করে দিয়েছে।" এসব কথা বলে মিকাইলী সাহেব সেসব এলাকার তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা শোনালেন। তা হল—

একবার এক যুবক তার যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্য ক্যাম্পে গেল। ম্যানেজার তার রুমে একজন মহিলাকে পাঠাল। যুবক চেয়ে দেখে, হায়! হায়! এ যে তার গর্ভধারিণী মা! যার উদরে সে জন্ম নিয়েছে, যার বুকের দুধ খেয়ে সে বড় হয়েছে। মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় আঁচলে চেহারা ঢেকে বলল, "বাবা! এ জন্যই কি তোমাকে পেটে ধারণ করেছিলাম? তোমার মত যুবক ছেলে থাকতে আজ জিহাদে বেরিয়ে যাচ্ছ না। তোমার তো উচিত ছিল নিজের এ মোটা তাজা দেহটি বিলিয়ে দিয়ে মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করা। আর এখন এসেছ নিজেই মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করতে।" মায়ের কথা শুনে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ম্যানেজার তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কাজ সেরে এসেছ তো?" যুবক উত্তর দিল, না। তিনি আমার মা হন। এতটুকু বলার সাথে সাথে ম্যানেজার বলল, এখানে মা-বোন, স্ত্রী-মেয়ে সবাই সমান। মৌলবাদীদের ফতোয়া আর চলবে না। এই বলে যুবকটিকে হত্যা করে ফেলল।

অপর একদিন এক যুবক যৌনক্যাম্পে গেলে তার নিকট তার সহোদর বোনকে পাঠিয়ে দিল। ভাই বোনের চার চোখের মিলন ঘটলে উভয়ে অনেক রোদন করল। তারপর ছেলেটি বেরিয়ে আসলে ম্যানেজার নানান কিছু প্রশ্ন করে তাকেও শহীদ করে ফেলল।

একদিন অর্ধবয়স্ক এক লোক উক্ত ক্যাম্পে গেলে তার নিকট তারই মেয়েকে পাঠিয়ে দিল। মেয়ে পিতাকে দেখে পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলল, "আব্বা! শিশুকালে কেন আমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করনি? পিতা হয়ে কিভাবে তুমি আমাকে তাদের হাতে তুলে দিলে? পিতা হয়ে আজ এসেছ তোমার মেয়ের সাথে....!"

পিতা লজ্জাবনত অবস্থায় কিছুক্ষণ বসে থেকে বেরিয়ে এল। হায়রে কমিউনিজম! হায়রে স্যোশালিজম! এই তোমার চেহারা!

এসব মর্মান্তিক ও করুণ ঘটনা শুনে চোখের পানি রাখতে পারলাম না। তারপর তিনি বলেন, "বাবা! আমি চেয়েছিলাম আমার অর্থ-সম্পদ বিক্রি করে ও ব্যবসা গুটিয়ে মক্কা-মদীনার দিকে হিজরত করব। তা আর ভাগ্যে হবে না। কারণ, এখন আর জায়গা-জমি, সহায়-সম্পদ বিক্রি করা যাবে না। এগুলো সবই সরকারের।

আমি বললাম, চাচাজান! জিহাদের আয়াত নাজিল হওয়ার পর হিজরতের আয়াতের আমল মনছুখ অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে। এখন হিজরত নয় জিহাদ করে শহীদ হব না হয় গাজী হব। এ দুটো ছাড়া তৃতীয়টি আর নেই। চলুন আমরাও জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। মাহমুদা আমার কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল এবং বলল, "আমি তৈয়ার! আমি যাব।"

॥ চৌচল্লিশ ॥

বিকাল চার ঘটিকায় হারেছ মিকাইলীকে নিয়ে মাহমুদার মামা ডাঃ রাগেব মিকচির সাথে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাসায় গেলাম। ডাক্তার সাহেবের সাথে এর আগে কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি। আমিও তাঁর নাম ভালভাবে জানি, আর তিনিও আমার নাম বহুবার শুনেছেন। উভয়ের দিলে সাক্ষাতের তামান্নাও ছিল প্রচুর। কিন্তু কালের ঘূর্ণিপাকে তা আর সম্ভব হয়নি। ডাক্তার সাহেব একজন সভ্রান্ত পরিবাবের দ্বীনদার ও দরদী ব্যক্তি। তিনি মুজাহিদদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী তাই সাক্ষাত করাটা খুব জরুরী মনে করেছিলাম।

আমি শহরে গিয়ে কিছু ফল-ফ্রুট কিনে নিলাম। শহরেই তাঁর বাসা। আমরা হেঁটে হেঁটে তার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। আমাদেরকে পেয়ে ডাক্তার সাহেব আনন্দে আত্মহারা।

তিনি খুশী প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, "বাবা! তোমার আগমনে আমরা আজ ধন্য। তোমার পদধূলি পেয়ে মিকাইলের পথ-ঘাট আনন্দিত। তোমার আগমনকে গাছ-গাছালী ও পাখ-পাখালীরাও স্বাগত জানাচ্ছে। এমনকি কবরবাসীরাও আনন্দিত। কারণ একজন মুজাহিদের সম্মানার্থে কবর আযাবও বন্ধ থাকে।" এই বলে তিনি আমার হাত ধরে বাসার ভিতর টেনে নিয়ে চললেন। আমি মেহমানখানায় বসার ইচ্ছা করলে তিনি বললেন, "বাবা! বাসায় তোমার মামীমা আর বোন ছাড়া অপর কেউ নেই। এসো, লজ্জা কিসের?"

আমি তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হলাম। এর আগে কোনদিন দেখা সাক্ষাত নেই, নেই আলাপ-আলোচনা। হঠাৎ করে এত খাতির আপ্যায়ন! যেন আমার হাকিকী মামাবাড়ি। আমি লজ্জাবনত মস্তকে ঘরে ঢুকে সোফায় বসলাম। হারেছ সাহেব একটি চেয়ার টেনে বসে গেলেন। আমি ফলের থলেটি হাত বাড়িয়ে ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে বললাম, "জনাব! এ আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া।" ডাক্তার সাহেব অধিকারের সুরে বললেন, "আরে মিয়া! তুমি একি করেছ? এতগুলো টাকা খরচ করার যৌক্তিকতা কি? তুমি আমার এখানে আসলে হাদিয়া নিয়ে আসতে হবে?"

এসব বলে তিনি অপর রুমের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, "ওগো ছওদার মা! দেখ বড় লোকের বেটা তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছে? দেখ কত বড় লোকের সন্তান সে।"

আমি টেবিল থেকে আজকের খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে উল্টিয়ে দেখি প্রথম পৃষ্ঠায় আমাকে ধরিয়ে দেয়ার সংবাদ ছাপা হয়েছে। এতে রয়েছে উছায়েদের কল্পিত আঁকা ছবি, যা আমার নামে প্রকাশ করছিল। এত চিন্তা আর

পেরেশানির ভিতর দিয়েও আমি হাসি চেপে রাখতে পারিনি। হারেছ সাহেবের চোখ পড়তেই আমার হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে বাবা! হাসছ কেন? তাঁর নিকট কথা গোপন রাখা লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই বললাম, চাচাজান! আমাকে ধরিয়ে দিতে যখন পুরস্কার ঘোষণা করা হল এবং কেউ ছবি দিতে পারলে ১০ হাজার ডলার ঘোষণা করা হল, তখন আমারই সহযোদ্ধা হযরত উছায়েদ শহীদ (রহঃ) আমার কাল্পনিক ছবি অঙ্কন করে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার আকারে লাগিয়ে দেয়। তারপর কয়েক ভঙ্গিতে কয়েকটা ছবি যেমন ঃ ভাষণ দেয়া অবস্থা, ট্রেনিংরত অবস্থা ও হামলা করার অবস্থায় কিছু ছবি তৈরী করে বলসেবিকদের হাতে দিয়ে বলল, এগুলো খোবায়েবের ছবি। তারপর তাকে আট হাজার ডলার পুরস্কার প্রদান করে। এরপর থেকে এ ছবিগুলো পোস্টার আকারে সারা দেশে বিলি করছে।

আমার কথা শুনে হারেছ সাহেবও খিল খিল করে হেসে উঠলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্ পাকের অপার মহিমা! একজন সাধারণ ব্যক্তির একটু ব্রেইন খরচে একটি জীবন বেঁচে গেল। ছবি অঙ্কন করা হারাম কিন্তু একটি ছবি অঙ্কন করাতে দ্বীনের বিরাট ফায়দা হল এবং সমস্ত ছবি অংকনের গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে গেল। এখন যদি কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে বলে ইনিই সেই খোবায়েব, যাকে সরকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাহলে এ সত্যটাকে কেউ বিশ্বাস করবে না বরং যে ধরে নিয়ে যাবে তার ঠেলা সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আয় আল্লাহ্! উক্ত মুজাহিদকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান কর।"

এর মধ্যেই ডাক্তার সাহেব দস্তরখান ও জগ, গ্লাস নিয়ে রুমে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছন দিয়ে বড় এক থালা ভর্তি কাটা ফল নিয়ে সালাম দিয়ে ঢুকল ছওদা। ফলের থালা দস্তরখানে রাখতে রাখতে আমাদেরকে ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করল। এর পিছন দিক দিয়ে ছওদার আম্মা নিয়ে এলেন চা বিস্কুট। তারপর আমরা সবাই মিলে ফল খেলাম ও চা পান করলাম।

এক পর্যায়ে ছওদা হারেছ সাহেবকে মাহমুদার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি অল্প কথায় উত্তর দিলেন যে, সে বাসায় আছে, আগামীকাল অফিসে আসবে।

অতঃপর ডাক্তার সাহেবকে আহত সৈন্যদের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমার হাসপাতালে আহত সৈন্য ভর্তি আছে ৯৬ জন। এর মধ্যে জরুরী বিভাগে ৩৫ জন। এ ৩৫ জনের মধ্যে ভর্তির ৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হয় ২৫ জনের আর বাকি ১০ জনের অবস্থা আশংকাজনক। বাকি ৬১ জন যদি বেঁচে যায় তাহলে এরা আজীবন পঙ্গু হয়েই থাকবে। কারণ এদের কারো এক হাত, কারো এক পা, আবার কারো উভয় পা চলে গেছে। হাসপাতালে ভর্তির পর হাত-পা

মিলিয়ে ১১ জনের অপারেশন (অর্থাৎ হাত-পা কেটে ফেলা) হয়েছে। সামরিক হাসপাতালেও রোগী আছে। সেখানে কতজন তার সংখ্যা জানা নেই, তবে ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে অফিসারদেরে ভর্তি করেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসপাতালে ভর্তির পর এসব খোদাদ্রোহীদের গোপনে মেরে ফেলার কোন সুরত করা যায় না?" আমার প্রশ্নের উত্তরে ছওদা বলল, "এ ব্যাপারে আব্বু কিছু বলতে পারবেন না। কারণ তিনি হলেন প্রধান পরিচালক। সবগুলো বিভাগের তদারকী তাঁকেই করতে হয়। যেসব ডাক্তারগণ ও সিস্টারগণ ওয়ার্ডে থাকেন তাদের দ্বারা এসব সম্ভব, যেমন...।"

আমরা সবাই ছওদার অসম্পূর্ণ বাক্য শ্রবণের জন্য তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছওদা কখনো আমাদের দিকে, কখনো তার পিতার দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু কোন একটি কথাও বের হল না তার মুখ থেকে। অগত্যা আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ছওদা! তোমার অসম্পূর্ণ বাক্য পূর্ণ কর। যেমন বলে কি উদাহরণ দিতে চাচ্ছিলে?"

"না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, আব্বু তো অফিসে থাকেন, তার দ্বারা এমনটা হবে কি করে? যারা জরুরী বিভাগে থাকেন এবং ওয়ার্ডে ডিউটি করেন তাদের দ্বারা এ সকল কাজ সম্ভব।"

"যেমনের উত্তর গোপনই রয়ে গেল। বল বোন! তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।" এবারও সে তার পিতার দিকে হতচকিত হয়ে তাকাচ্ছিল।

ডাক্তার সাহেব তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "বল মা, কি বলতে চাচ্ছিলে? সত্য কথা বল, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।"

এবার বলল, "এ পর্যন্ত আমি আর মাহমুদা আটজনকে হত্যা করেছি। আমি তিনজনকে আর মাহমুদা পাঁচজনকে। এদের মধ্যে পাঁচজন আর্মী আর তিনজন কমিউনিস্ট নেতা। এসব মৃত্যুকে আমাদের অফিসাররা কোনটাকে স্টোক করে মৃত্যু ঘটেছে আর কোনটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে রিপোর্ট দিয়েছে।"

ছওদার কথা শুনে ডাক্তার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা! বলত এটা কিভাবে সম্ভব হল? উত্তরে ছওদা বলল, আমরা রোগীকে বাঁচানোর জন্য খুব দৌড়াদৌড়ি করে চিকিৎসা করছিলাম। আমাদের এসব কর্মতৎপরতা দেখে রোগীর অভিভাবকগণ মনে করত যে, এরা নিরলসভাবে আমার রোগীর চিকিৎসা করে যাচ্ছে। আমরা এ সুযোগে কাউকে সরাসরি মানব নিধন ইনজেকশন দিয়ে আবার কাউকে ভুল ঔষধ খাইয়ে হত্যা করেছি। আমাদের এসব কৌশল এখনো ডাক্তারগণ ধরতে পারেননি। আশা করি সামনেও তা পারবে না। আল্লাহ্ অবশ্য অবশ্যই হেফাজত করবেন।"

"বল তো মা! এটা তোমাদের ব্রেইনে কি করে ধরল?"

"সত্য কথা বলতে কি? এসব মাহমুদার চিন্তার ফসল। সেই বলেছে এটা জিহাদের মধ্যে শামিল। এ ধরনের যদি না হত, তাহলে মাহমুদাকে পেতাম না। সে একেক সময় একাই ছুটে যেতে চায় জিহাদ করতে। জিহাদ ছাড়া অন্যকিছু তার কাছে ভাল লাগে না। তার অবস্থা দেখে এক সময় আমি নিজেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম হয়ত পাগলই হয়ে যাবে।"

এতক্ষণে সূর্য কস্তাকৃতি ধারণ করে পশ্চিমাকাশে পালানোর পথ খুঁজছে। আমরাও অজু করে নামায আদায় করলাম। তারপর ডাক্তার সাহেবকে বললাম, "জনাব! চলুন একটু শহরের অবস্থা দেখে আসি।"

তিনি বললেন, "সন্ধ্যার পর তো প্রায় সময় কারফিউ থাকে। সে সময় ঘোরাফেরা ঠিক নয়। আচ্ছা রাখ দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কি-না! অতঃপর তিনি ফোন করে হাসপাতাল থেকে এ্যাম্বুলেন্স আনালেন। তারপর আমরা তিনজনে শহর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে থানা, কোর্ট ও সামরিক এলাকার আশাপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এর মধ্যে আমাদেরকে তিনবার চেক করেছে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর আমরা ফিরে এলাম ডাক্তার সাহেবের বাসায়। রাত অধিক হওয়াতে তিনি আর আমাদেরকে আসতে দিলেন না। ডাক্তার সাহেবের এখানেই রাত কাটানোর চিন্তা করলাম।

॥ পয়তাল্লিশ ॥

ছওদা আমার জন্য শয্যা রচনা করে দিল। ফ্লাক্সে গরম পানি এনে রেখে দিয়ে বলল, "এটাতে গরম পানি রাখা আছে, প্রয়োজন হলে তা দিয়ে অজু-এস্তেঞ্জা করবেন।" তারপর আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিয়ে বাতি নিভিয়ে চলে গেল।

আমি শুয়ে শুয়ে অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছি। কি হবে ইসলামের! এত এত মুসলমান জীবিত থাকতে আজ ইসলামের নিশান ভূলুণ্ঠিত। মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংস, মা-বোনদের ইজ্জত হরণ, মুসলিম জবাই, এগুলো নিত্যদিনের ইতিহাস। মুসলমানরা যদি জানত, মুসলমানদের যদি ঐক্য থাকত, উলামায়ে কেরাম যদি ফতোয়াবাজী না করত, তাহলে মুসলমানদের ভাগ্যে এমন দুর্দশা থাকত না। নিজ চোখে ইসলামের জানাযা আর শবযাত্রা দেখছিলাম। এসব নিয়ে

চিন্তা করতে করতে আমার ঘুম কোথায় পালিয়ে গেল তা বুঝতে পারিনি। রাত গভীর, শুধু এপাশ-ওপাশ করছি।

আমার কামরা সংলগ্ন রুমে দু'তিনজনের আলাপ কানে এল। এর মধ্যে কয়েকবারই খোবায়েব খোবায়েব আওয়াজ এল। আমি আমার চিন্তার হুইল ঘুরিয়ে ও রুমের দিকে দিলাম। শুনি ওরা সবাই আমাকে নিয়ে আলাপ করছেন। ডাক্তার সাহেব বলছিলেন—

"মাহমুদার চিন্তা-চেতনা ও তার সিদ্ধান্ত অনেক উন্নত। দ্বীনের জন্য সে চায় তার জীবনকে বিলিয়ে দিতে। জিহাদের কারণে সে খোবায়েবকে ভালবাসে। এ ভালবাসা তার জন্য কোন অন্যায় নয়। কাজেই এখন আমাদের উচিত হবে, মেয়েকে তার নিকট বিয়ে দিয়ে, তাদেরকে জিহাদের কাজে সহায়তা করা। সুন্দরী যুবতী কন্যা ঘরে রাখা নিরাপদ নয়। দু-এক মাসের মধ্যেই আমাদের এলাকায় যৌন ক্যাম্প খুলবে। তখন কি তাদেরকে ধরে রাখা যাবে? আমি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ছওদাকে বিয়ে দিয়ে দেব। ছেলে ডাক্তার। চাকরী করে আফগানিস্তানে। কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। জানাজানি করা যাবে না, খুব চুপে চুপে কাজ সারতে হবে। বিয়ের সাথে সাথেই উজবেকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে কাবুলে চলে যাবে। আমি রাহাবরও ঠিক করে রেখেছি।" ডাক্তার সাহেব হারেছ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন—

"জামাই মিয়া! বেশি চিন্তা-ভাবনা আর যুক্তি পরামর্শ করার সময় এখন আর নেই। সিদ্ধান্ত তড়িৎ নিতে হবে।"

ডাক্তার পত্নী বললেন—"এত দেখাদেখি আর বাছাবাছি ভাল নয়। মেয়ে যাকে পছন্দ করেছে আমারও তাতে অমত নাই। আর অমত থাকার প্রশ্নই আসে না। কারণ এমন একজন সুশ্রী-সুদর্শন ছেলে মিকাইলে আর একজন খুঁজে পাবে না কেউ। তার আমল-আখলাক কত সুন্দর। এগুলো ছাড়াও তার মধ্যে রয়েছে বাহাদুরীর ছাপ। সে একজন দ্বীনের মুজাহিদ। একজন মুজাহিদকে ভালবাসা, আমি মনে করি গোটা দ্বীনকে ভালবাসা। আর একজন মুজাহিদকে খারাপ জানার অর্থই হল গোটা দ্বীনকে খারাপ জানা। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। দু'একদিনের মধ্যেই কাজ শেষ করে ফেলা দরকার।"

হারেছ সাহেব বললেন, "ছেলে যদি রাজি না হয় তাহলে?"

ডাক্তার সাহেব বললেন, "ছেলে অবশ্যই রাজি হবে। এমন এক কথা তাকে বলব, তখন সে বাধ্য হয়েই রাজি হবে। হারেছ সাহেব বললেন, "আমি এবং আপনার বোন, আমরা উভয়েই রাজি। আপনি আলাপ করে দেখেন ছেলে কি বলে?"

এসব আলাপ করে তারা শুয়ে পড়লেন।

ফজরের নামায পড়ে আমি কালামে পাক তিলাওয়াত করছি। এমন সময় ডাক্তার সাহেব চা বিস্কুট নিয়ে এলেন এবং বললেন, "বাবা! চা পান করে নাও।" আমি চা বিস্কুট খাচ্ছিলাম। তখন তিনি বলতে লাগলেন, "বাবা! আমি তোমাকে কিছু কথা বলব, তা শোন! দেশের সার্বিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির অবকাঠামো। ইসলামকে দাফন করে দিচ্ছে বলসেবিক হায়েনারা। এ কথা মান চাই না মান, কথা বাস্তব, তাহল পুরো দেশটা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। দেশের জনগণ সোশ্যালিজম মেনে নিচ্ছে। সারা দেশের জিহাদী তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে। দেশের ভিতর থেকে জিহাদী কার্যক্রম চালানো মোটেই সম্ভব নয়। দেশের বাইরে থেকে গেরিলা হামলা পরিচালনা করতে পারলে হয়ত কিছু সুফল দেখা যেতে পারে। সামান্যতম দ্বীনের দরদ যাদের মধ্যে আছে তারা অনেকেই আফগানিস্তানে হিজরত করেছে। আমিও এক পা আফগানিস্তানে দিয়ে রেখেছি। আমি তোমাকেও বলব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি আফগানিস্তানে চলে যাও। সেখানে গিয়ে লোক তৈরী কর, প্রশিক্ষণ দিয়ে মুজাহিদ বানাও। সেখানে গেলে দেশের অনেক আলেম, দ্বীনদার ও যুবকদের পাবে।"

ডাক্তার সাহেবের কথাগুলো আমার খুব পছন্দ হল। তাই রাজি হয়ে গেলাম। তারপর তিনি আবার বললেন, "বাবা! তোমার মুসলিম বোনদের ইজ্জত রক্ষা করা তোমার দায়িত্ব নয় কি?" উত্তরে বললাম, "তাই যদি না হবে তাহলে কিসের মুজাহিদ! আমরা মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জতের জন্য লড়াই করছি। আর এটা আমাদের উপর ফরয। তারপর তিনি বললেন, "তোমার বোন মাহমুদার ইজ্জত রক্ষার জন্য তোমাকে জিম্মাদারী দিতে চাচ্ছি, এতে তোমার অভিমত কি তা জানতে চাই।"

আমি ডাক্তার সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অতীতের কিছু কাহিনী শোনালাম এবং বললাম, আমি থাকব পাহাড়ে জঙ্গলে। একজন মেয়েকে নিয়ে এভাবে ঘোরাফেরা করা কি সম্ভব? অতএব আপনারা অন্য চিন্তা করলে ভাল হয়।"

"না বাবা! এখন আর অন্য চিন্তার সময় নেই। এ বিয়েতে মেয়ে এবং তার পিতামাতা সবাই রাজি। দু'একদিনের মধ্যে শুভ কাজ সমাধা করে তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আফগানিস্তানে। তুমি কাবুলে গিয়ে একটি বাসা ভাড়া করে অবস্থান করতে থাক। সেখানে পরিচিত অনেক লোক পাবে। আমরা তোমার জিহাদের যাবতীয় খরচ বহনের ওয়াদা দিচ্ছি।"

চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য একদিন সময় চেয়ে এস্তেখারা করে দেখলাম এটা খারাপ নয়। পরে ডাক্তার সাহেবকে কথা দিলাম যে, আপনাদের কথায় আমি একমত হলাম।

॥ ছিচল্লিশ ॥

ফজরের নামায আদায় করে বাতায়ন পাশে বসে পবিত্র কুরআন খুলে পাঠ করতেছিলাম। জানি না আজকের তিলাওয়াত এত মধুময় কেন লাগছিল! পবিত্র কুরআনের মহব্বত আর ভালবাসায় আমার অন্তর কানায় কানায় ভরে গেল। আমি কুরআনের গায়ে বার বার চুমু খেতে লাগলাম। বুকে জড়িয়ে ধরে অনাবিল শান্তি অনুভব করতে লাগলাম এবং মনে মনে ভাবছিলাম যে, ওহে কুরআন! তোমার ইজ্জত ও আযমত রক্ষা করতে গিয়ে অনেক ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত মুজাহেদীন অকাতরে জীবন দিয়ে যাচ্ছেন। আমার অনেক প্রাণপ্রিয় সাথীরা তোমার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তোমার বাণী বিশ্বময় সর্বোচ্চে স্থান দিতে গিয়ে দুনিয়া থেকে রক্তমাখা শরীর নিয়ে জান্নাতে পলায়ন করেছেন।

ওহে মুকাদ্দাস কুরআন! তোমাকে তো আসমান, জমিন, পাহাড়-পর্বত ও সাগর মহা সাগর গ্রহণ করেনি। তোমাকে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা মানব জাতি। তোমার হেফাজতের ভার আল্লাহ্ নিজের জিম্মায় রেখে দিয়েছেন। আমরা এজন্য তোমাকে ভালবাসি এবং লালন করি, যেন আমরা ইহকালে ও পরকালে সৌভাগ্যশালী হতে পারি। যেন কিয়ামতে হও তুমি নাজাতের উসিলা।

এদিকে হারেছ মিকাইলী ডাক্তার রাগেড় মিক্‌চির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গত রাত্রে ডাক্তার সাহেব বিবাহ সংক্রান্ত আলাপের শেষ পর্বে পৌঁছার জন্য ভোরে আসার কথা দিয়েছিলেন। হারেছ সাহেব ডাক্তার সাহেবসহ একসাথে নাস্তা খাবেন, তাই অপেক্ষা করছেন। এরই মধ্যে ডাক্তার সাহেব গাড়ি নিয়ে হাজির।

মাহমুদা পিতা-মাতার কানাকানি ও আলাপালোচনায় আগেই বুঝতে পেরেছিল তার বিয়ের আলাপ আজকেই সম্পূর্ণ হবে। তাই লজ্জা ও সংকোচে বাড়ির বাইরে বাইরে ঘুরছিল।

ডাক্তার সাহেব একা আসেননি। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ডাক্তার রাগেব বেগম ও কন্যা ছওদাকে। গাড়ি থেকে নেমে অন্দর বাটিতে প্রবেশ করতেই বেগম হারেছ দৌড়ে এসে ভাই-ভাবী ও ভাইজীকে হাল পুরুস্তী করে ঘরে নিয়ে গেল। ছওদা মাহমুদাকে দেখার জন্য সবগুলো ঘর তন্ন তন্ন করে তালাশ করে কোথাও না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ফুপি মা! মাহমুদা কই? তাকে দেখছি না যে? বেগম

হারেছ জবাবে বললেন, "সে আজ বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমনি ছওদা ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের দিকে চলে গেল। মাহমুদা উদাস আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি কানে আসতেই যেন তার ধ্যান ভঙ্গ হল। হতচকিত হয়ে পশ্চাতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ছওদা পিছনে দণ্ডায়মান। উভয়ে উভয়ের কুশল বিনিময় করে আবার বৃক্ষ মূলেই বসে আলাপে প্রবৃত্ত হল।

পরিচারিকা আমেনা নাস্তা এনে দস্তরখানে সাজিয়ে রাখল। হারেছ সাহেব ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আমার রুমে আসেন এবং নাস্তার দাওয়াত দেন। আমরা তিনজন একসাথে বসে খানা খাচ্ছি। বেগম হারেছ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র এগিয়ে দিচ্ছেন আর আমেনা তা পরিবেশন করছে। আমাদের খানা প্রায় অর্ধেকেরও বেশী হয়ে গেছে, এমন সময় দক্ষিণ দিক থেকে কান্নাকাটির শোরগোল ভেসে এল। এ কান্না ক্রমান্নয়েই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আমাদের কানে আসছিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি খানা সমাপ্ত করতে লাগলাম।

মাহমুদা ও ছওদা দৌড়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। মাহমুদা হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের রুমে এসে বলল, "আব্বু! আব্বু! আর মনে হয় রক্ষা নেই। আমাদের দক্ষিণের গ্রামে (মোল্লা পাড়া) বলসেবিকরা হানা দিয়েছে। বাড়ি ঘর সব একদিক থেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে। ঐ শুনুন নারী-পুরুষ আর শিশুদের কান্নার আওয়াজ।"

আমরা সবাই খানা শেষ করে হাত ধুয়ে নিলাম। তারপর হারেছ সাহেবকে বললাম, চাচাজান! আপনি একটু সামনে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা কি জেনে আসুন। বলসেবিকদের থেকে দূরে থাকবেন। খবর নিয়ে দেরী করবেন না, এক্ষুণি ফিরে আসুন।

হারেছ সাহেব বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় উঠতেই মোল্লা পাড়ার অর্ধ বয়সী এক লোককে দৌড়ে যেতে দেখে তিনি তাকে থামালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই তুমি অমন করে দৌড়াচ্ছ কেন? আর তোমার গ্রামে কি হচ্ছে বল শুনি। লোকটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, "ভাই আমাদের গ্রামে বলসেবিক হায়েনারা প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিটি ঘর তালাশ করে কুরআন শরীফ বের করে নিচ্ছে। যে ঘরে কুরআন ও ধর্মীয় কিতাবাদী পাচ্ছে সে ঘরটি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আবার কোন কোন বাড়ির লোকজনকেও গ্রেপ্তার করছে। আমার ঘরেও পবিত্র কালাম সংরক্ষিত ছিল। আমার ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র রহমতে জীবন নিয়ে বেঁচে এসেছি। জানি না আমার পরিবারের অন্য সদস্যের কি অবস্থা হয়!" এই বলে লোকটি দৌড়ে পালাতে লাগল। লোকটি যাবার সময় এ কথাও

বলছিল যে, সবগুলো কুরআন কিতাব স্কুলের মাঠে নিয়ে জমা করছে। সেখানে নাকি এগুলোকে জ্বালাবে।" হারেছ সাহেব লোকটির কথা শুনে ফিরে এসে সব ঘটনা খুলে বললেন।

আমি একটু চিন্তা করে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলাম। তারপর হারেছ সাহেবকে বললাম, চাচাজান! আপনার বাড়িতে যে কয়টি কুরআন শরীফ আছে সে কয়টি নিয়ে আসেন। তিনি তিনটি কুরআন শরীফ এনে বললেন, "নাও বাবা! আল্লাহ্‌র কালামের হেফাজত কর।" আমি তাড়াতাড়ি কুরআন শরীফের গিলাফ ও মড়ক খুলে সাধারণ বই পুস্তকের সাথে রেখে দিলাম। তারপর কুরআন শরীফের সাইজের ছয়টি পুস্তক নিলাম। এর মধ্যে তিনটি পুস্তকের ঠিক মধ্যখানে ধারালো চাকু দিয়ে সুন্দর করে কেটে গর্ত বানালাম। তারপর তিনটি পুস্তকের ভিতর তিনটি গ্রেনেড ঢুকালাম। পাশের খালি জায়গাটুকু তুলা দিয়ে ভরে দিলাম। তারপর অন্য পুস্তকের সাথে ওজন করে দেখলাম প্রায় সমান। স্বাভাবিক ওজনের এ সামান্য বেশকম কেউ বুঝতে পারবে না। অতঃপর এগুলোর মধ্যে কুরআন শরীফের গিলাফ পরিয়ে ছয়টা একসাথে বেঁধে কাপড়ে মুড়িয়ে মসজিদের তাকে নিয়ে রেখে দিলাম। আমার হাতিয়ার আর গোলা-বারুদগুলো গোপন স্থানে নিয়ে খুব সাবধানে রেখে দিলাম।

ডাক্তার সাহেব ও হারেছ সাহেব আমাকে নিয়ে চিন্তায় অস্থির। আমি উভয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, চাচাজান! আমার জন্য মোটেও চিন্তা করবেন না। জীবনে বেঁচে থাকার আশা আমার অন্তর থেকে অনেক পূর্বেই পালিয়ে গেছে। আমার আত্মা সদা-সর্বদা ছট্‌ফট্‌ করছে শুহাদাদের পবিত্র আত্মার সাথে মিলিত হতে। আল্লাহ্‌র পথে জীবন দেয়ার চেয়ে উত্তম অভিপ্রায় আমার অন্তরে নেই। তারপর হারেছ সাহেবকে লক্ষ্য করে আরো বললাম—

চাচাজান! আমি একা। আমার নেই কোন সঙ্গী সাথী। আমি ইচ্ছা করলে একাই তাদের অগ্রযাত্রা রুখতে পারি, কিন্তু তা রুখব না। কারণ, দুদিন পর বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে এরা গ্রামে হানা দিয়ে সব ধ্বংস করে দেবে। এ এলাকাকে জঙ্গীবাদী বা মৌলবাদী এলাকা ঘোষণা দিয়ে নির্বিচারে সব ধ্বংস করতে থাকবে, না হয় একটা কিছু অবশ্যই করতাম। তবে পবিত্র কুরআন শরীফ জ্বালানোর সময় অবশ্যই একটা কিছু ঘটবে। আল্লাহ্‌ চাহেত কিছু শুনবেন।

ডাক্তার রাগেব মিচ্‌কি বললেন, "বাবা খোবায়েব! আমরা তো একমত বৃদ্ধই হয়ে গেছি। আমাদের চিন্তা তেমন করি না। চিন্তা হল মাহমুদা ও ছওদার। কারণ এদেরকে ওরা রেখে যাবে না।"

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, "ক্যামুপ্লাসের মাধ্যমে আজকের মত তাদেরকে রক্ষা করা যাবে।"

"সেটা আবার কিভাবে?"

"তাদের চেহারা পরিবর্তন করে।"

"বাবা! এটা কি করে সম্ভব হবে?"

"এটা সম্ভব হবে, তা বলে দিচ্ছি।"

তারপর মাহমুদা ও ছওদাকে ডেকে এনে বললাম, বোন! নিজের ইজ্জত আব্রুকে রক্ষা করা নিজের উপর ফরজ। বলসেবিক হায়েনারা খুব দ্রুতগতিতে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে তোমাদের ইজ্জত রক্ষা করতে হবে। পারবে কি তা?"

"অবশ্যই পারব, বলুন কি করতে হবে?"

"তোমাদেরকে হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত, গলাসহ মুখমণ্ডল এবং হাত থেকে উভয় বাহুতে, পাতিলের তলার কালি এমন মসৃণভাবে মাখাতে হবে যেন কেউ বুঝতে না পারে যে, এটা আলাদা লাগানো কালি। মানুষ দেখলেই যেন মনে করে তোমরা জন্মগত কাল।"

"তারপর...?"

"তারপর দু'জনে পুরাতন কাপড় পরবে।"

"তারপর...?"

"তারপর দু'টি ঝাড়ু নিয়ে মেইন রাস্তায় বেরিয়ে যাবে।"

"তারপর তাদের কপালে ঝাড়ু মারব তাই না?"

মাহমুদার কথা শুনে হেসে ফেললাম এবং বললাম, আরে কপালে ঝাড়ু মারবে না। রাস্তার আবর্জনা সাফ করবে।"

"তা বুঝেছি, মেথরানীর কাজ!"

"হাঁ, মেথরানীর কাজ। এ অবস্থায়ই তোমাদেরকে বাঁচতে হবে।"

"রাস্তা ঝাড়ু দিলে পয়সা দিবে কে?"

"হিসাব করে আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নিও।"

"অগ্রিম দিয়ে দিন।"

"শোন! হাসি মযাক করার সময় এখন নেই। অবহেলায় চরম ক্ষতি হয়ে যাবে।"

অতঃপর এরা আমার কথা মত নতুন সাজে চেহারা পরিবর্তন করে আমার সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আমি নিজেই চিনতে পারিনি।

এরই মধ্যে কমিউনিস্ট হায়েনারা, অসভ্য সৈন্যরা একদম নিকটে এসে গেল। ৮/১০ বাড়ি তল্লাশি করেই আমাদের এখানে আসবে। মানুষের চিৎকার আর আহাজারিতে আকাশ বাতাস স্তম্ভিত হয়ে গেল। আগুন আর ধোঁয়ায় দক্ষিণের আকাশ ভরে গেল।

আমরা যা ভাবছিলাম সে অনুপাতে বাড়িঘর জ্বালায়নি এবং লোকজনও বেশী গ্রেপ্তার করেনি।

আমি বাতায়নে বসে সেদিকে তাকিয়ে ধ্বংসলীলার করুণ দৃশ্য দেখছিলাম। এরই মধ্যে ওরা সেসব বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পাদুকা সহ মসজিদে প্রবেশ করল। মসজিদ হারেছ সাহেবের বাসা থেকে আনুমানিক ৪/৫ শ গজ দূরে। কোন আড়াল না থাকায় স্পষ্ট তাদেরকে দেখা যাচ্ছিল। আমার পাশে বসে হারেছ সাহেব ও ডাক্তার সাহেব সে দৃশ্য দেখছিলেন।

মসজিদ থেকে আমার রেখে যাওয়া পুস্তকগুলো কুরআন শরীফ মনে করে নিয়ে এল এবং পিকাপে নিক্ষেপ করল। আমি তা দেখে একটু হাসলাম। হারেছ সাহেব আমার হাসি দেখে দুঃখভরা মন নিয়ে বললেন, "বাবা! কুরআন শরীফ ...ল ছুঁড়ছে আর তুমি বসে হাসছ! আমি বললাম, "এগুলো কুরআন শরীফ নয়। এগুলো তাদের মরণ ফাঁদ।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সেটা কিভাবে?" আমি মরণ ফাঁদের বিষয়টি বুঝিয়ে দিলাম।

হায়েনারা মসজিদ থেকে বের হয়ে সোজা হারেছ সাহেবের বাড়ির দিকে আসতে লাগল। ফটক পেরিয়ে কারের (গাড়ি) নিকট এসে থামল এবং দেখল এটা হাসপাতালের ডাক্তারের গাড়ি। অর্থাৎ সরকারী গাড়ি। তাই গাড়ির কোন ক্ষতি করেনি। এবার বাড়িতে ঢুকে সবগুলো ঘর আর কামরা তল্লাশি করতে লাগল। টেবিলে ও তাকে সাজানো বইগুলো এবং বুক সেলফের বইগুলো দেখতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি তালাশ করছেন বলুন। একজন আর্মী বলল, "তোমাদের খোদার কালাম তালাশ করছি। তোমাদের খোদার কালাম না-কি খোদায় রক্ষা করবে। আজ খোদায় তা ফেলে রেখে পালাচ্ছে। ২০/২৫টি কুরআন নিয়ে এসেছি। এগুলো স্কুল মাঠে লক্ষ জনতার সম্মুখে জ্বালিয়ে প্রমাণ করব যে, খোদায় তার কালাম সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এতদিন রূহানীরা বলত, খোদার কালামের হিফাজত খোদায় করবে। আমরা বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত কুরআন জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের দাবী যে মিথ্যা, তা প্রমাণ করেছি।

আমি বললাম, "স্যার! কাগজে লিখা কুরআন শেষ করা যাবে। আসলে এতে কুরআন শেষ হবে না। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যা মানুষ

সীনায় ধারণ করতে পেরেছে, অর্থাৎ মুখস্ত করতে পেরেছে। কিন্তু একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন মানুষ কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। কাগজের কুরআন শেষ হলেও সীনার কুরআন শেষ হবে না। আর শেষ করা সম্ভবও নয়।"

আমার কথা শুনে অপর এক আর্মী বলে উঠল, একে নিয়ে নাও, এ রূহানী। রূহানী না হলে রূহানীদের পক্ষে উকালতি করছে কেন? এতটুকু বলার সাথে সাথে আমাকে নিয়ে চলল। ওরা ডাক্তার সাহেব ও হারেছ সাহেবকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না এবং বাড়িরও কোন ক্ষতি করল না। আমার সাথে অন্যান্য বন্দীর সংখ্যা ১০/১৫ জন। পুলিশ আর আর্মী মিলে ২০/৩০ জন আর কমিউনিস্ট পাবলিক হবে প্রায় দেড়শ। ওরা আমাদেরকে নিয়ে মিকাইলের উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জমা করল। মাঠের মধ্যখানে রাখল ৫০/৬০টি পবিত্র কুরআন শরীফ।

॥ সাতচল্লিশ ॥

সৈন্যরা চলে গেলে মাহমুদা ছওদাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। এদের দিকে বলসেবিকরা ফিরেও তাকায়নি। বাড়ি ফিরে আমার রুমে গিয়ে আমাকে তালাশ করল, কিন্তু পেল না। সব ঘর খুঁজল, আমাকে দেখল না। পরিচারিকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "মুসাফির ভাইয়া কোথায়?" পরিচারিকা উত্তর দিল, "তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।" একথা শোনার সাথে সাথে মাহমুদার মাথায় চক্কর খেল। হায়! আবার বুঝি মুসাফিরকে হারালাম! তার বুদ্ধিতে আমরা বেঁচে গেলাম, আর সে বন্দী হয়ে গেল। যে আমার জীবন দু-দু'বার করে বাঁচাল তাকে আমি উদ্ধার করেই ছাড়ব। জীবন যায় যাক, তবু তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব। সে দৃঢ় পণ করে ঐ অবস্থায়ই আমার দেয়া রিভলভারটি কোমরে গুঁজে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির অন্যেরা তা জানল না। ছওদা গোসলখানায় গিয়ে ভালভাবে গোসল করছে। বাড়ির অন্যান্য মানুষ মনে করছে সেও হয়ত গোসল করছে।

আমাকে ছাড়া অন্যসব বন্দীদের হাত বাঁধা। কারো হাত গামছা দিয়ে, কারো হাত রশি বা মাফলার দিয়ে বেঁধেছে। আমাদেরকে মাঠের এক পার্শ্বে দাঁড় করিয়েছে। অন্য পার্শ্বে কমিউনিস্ট যুবকরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। অন্যদিকে কুরআন জ্বালানোর দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার মুসলমান নারী-পুরষকে তাড়িয়ে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ৪/৫ জন পুলিশ আমাদের পাহারা দিচ্ছে।

মাঠের মধ্যে ২০/২৫ জন পুলিশ ও আর্মীরা কুরআন শরীফের স্তূপের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। দু'তিনজন পুলিশ কেরোসিনের টিন এনে পবিত্র কুরআন

শরীফের স্তূপে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। বলসেবিক যুবকরা হাত তালি দিতে দিতে আর নাচতে নাচতে মাঠের মধ্যে গেল। লেনিনের জয়গান গাচ্ছিল। এমন আনন্দঘন মুহূর্তে একসাথে তিনটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়ে মিকাইল শহর কাঁপিয়ে তুলল। আগুন ধরা কুরআন শরীফগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ে আর্মী, পুলিশ ও কমিউনিস্ট কর্মীদের গায়ে আগুন লেগে যায়। তিনটি গ্রেনেডের শত শত গোলা অগ্নিবর্ণ ধারণ করে তাদের নাকে, মুখে, বক্ষে, কলিজায় বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার হয়ে যায়। তাদের জয়-উল্লাসের পরিবর্তে আর্ত-চিৎকারে আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত করে দিল। গোলার আঘাত মারাত্মক যখমি হওয়ায় ছুটাছুটি করতে পারেনি। মাটির মধ্যে গড়াগড়ি করতে করতে পাপিষ্ঠদের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। স্কুল ময়দান গণশ্মশানে পরিণত হল।

প্রলয়ংকরী ও গগনবিদারী নিনাদে সমস্ত দর্শকরা যার যেদিকে মুখ ছিল, সে সেদিকেই ছুটে পালাল। আমাদের পাহারারত পুলিশরাও কে কোথায় পালিয়েছে তা কে জানে? আমি তাড়াতাড়ি অন্যান্য বন্দীদের হাতের বন্ধন খুলে দিয়ে বললাম, যাও, জলদি পালাও। বন্দীরা জীবন বাজি রেখে দৌড়ে ময়দান ত্যাগ করল।

আমি বন্দীদের মুক্ত করে দৌড়ে পালানোর সময় দেখি, রিভলভার হাতে আফ্রিকানের মত কৃষ্ণ চেহারার এক বীরবালা খোবায়েব খোবায়েব বলে চিৎকার করে ঘুরছে। তাকে আমি চিনতে ভুল করিনি। তার হাত থেকে রিভলভারটি টেনে এনে বললাম তুমি এখানে? চল, জলদি চল। এক মুহূর্ত বিলম্ব করা যাবে না। এই বলে তার হাত ধরে ছুটে চললাম। শহরের দোকান পাটের শাটারগুলো যে যার মত বন্ধ করছিল। রোডের পাশের দোকানগুলো ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে দোকানীরা পালাতে লাগল। মানুষের ভীড়ের কারণে গাড়িগুলো চলতে না পেরে যাত্রীরা গাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল। চালকরাও গাড়ি ফেলে দৌড়াতে লাগল।

কোথায় কি হয়েছে, কি ঘটেছে তা অনেকেই জানে না। এমন কি কেউ কেউ এ কথার গুজব ছড়াচ্ছিল যে, শহরে আক্রমণ হয়েছে। একদিক থেকে দালান কোঠা ভেঙ্গে, মানুষ হত্যা করে এদিকে আসছে। এ ভুয়া সংবাদে অনেকে বাড়ি ঘরে তালা ঝুলিয়ে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে পালাতে লাগল। তাৎক্ষণিকভাবে এ অবস্থার নিয়ন্ত্রণ কেউ করতে পারেনি। সবাই শুধু দৌড় আর দৌড়। কার আগে কে পালাবে। একজনের শরীরের ধাক্কা লেগে আর একজন ছিটকে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে।

মানুষের এ দুরবস্থা দেখে আমার দিলে খুব মায়া লাগল। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগলাম। ভাই সব! কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।

এটা আর্মীদের উল্লাসের তোপ্ ধ্বনি। কুরআন জ্বালানোর উল্লাসের তোপ্ ধ্বনি। আপনারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যান। ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার চিল্লাচিল্লিতে দৌড়ে ক্লান্ত কিছু মানুষ ও বৃদ্ধরা থেমে গেল। এরা বলল, "আর দৌড়াতে পারব না, মারে মারুক, মরি-মরাম। চল বাড়ি ফিরে যাই, দোকানে চলে যাই। সবকিছু ফেলে কোথায় যাব? মওতের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারেনি আমরাও পারব না। অযথা দৌড়ানোর অর্থ নেই। চল যা হয় হবে।" এই বলে একদল লোক উল্টো দিকে খুব মন্থর গতিতে এগুচ্ছিল। এদের দেখে অন্যদেরও একটু সাহস হল। এরাও তাদের পশ্চাতে বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগল।

এদিকে ডাক্তার সাহেব রাস্তার লোকজনের দৌড়াদৌড়ি আর কান্নাকাটি দেখে অস্থির হয়ে বললেন, "তোমরা কে কোথায় আছ, জলদি চল বেরিয়ে যাই। আর হয়ত থাকা যাবে না।" বেগম হারেছ এসে ডাক্তারকে জানালেন, "ভাইজান! আপনার ভাগনীকে পাচ্ছি না।"

"কেন! মাহমুদা আর ছওদাকে তো আসতে দেখেছি। ওরা গেল কই?"

"ছওদা এসে গোসল করে খানা খেতে বসেছে, কিন্তু মাহমুদাকে পাচ্ছি না।" এই বলে বেগম হারেছ কাঁদতে লাগলেন। হারেছ সাহেব এসে বললেন, "প্রিয়তমা! কেঁদো না, ভাগ্য ভাল থাকলে তোমার মেয়ে ফিরে আসবে। দেখ না, সব মানুষ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। রাস্তায় নেমে এসেছে জনতার ঢল। এ অবস্থায় তালাশ করতে কোথায় যাব? সে খোবায়েবের গ্রেপ্তারীর কথা শুনে হয়ত সেদিকেই গিয়েছে। খোবায়েবের জন্য সে পাগল। তুমি শান্ত হও। একটু পরে তাকে খুঁজতে যাব।" ডাক্তার সাহেব বললেন, "লোকমুখে শুনেছি একদিক থেকে নাকি শহরের দালান কোঠা সব মিছমার করে আসছে। তাই যদি হয় তবে তুমি ওকে খুঁজতে যাবে কোথায়?' উত্তরে হারেছ সাহেব বললেন, "এটা অন্য কিছু নয়, এটা খোবায়েবের কাণ্ড। আপনি শুনেননি সে বলেছিল, কুরআন শরীফে আগুন ধরিয়ে দিলে একটা কিছু ঘটবে। এটা সে কথার প্রতিফলন। উনারা এসব আলোচনা করতেছিলেন। এর মধ্যে আমি মাহমুদার হাত ধরে প্রধান ফটকের ভিতর দিয়ে ভবন আঙ্গিনায় চলে এলাম। এমন সময় ডাক্তার সাহেব বলে উঠলেন, "দেখ! দেখ! এক পাগলে এক পাগলীকে ধরে নিয়ে এসেছে।" এ শব্দ আমার কানে আসতেই লজ্জায় তার হাত ছেড়ে দিলাম। অতঃপর কয়েক কদম এগিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করলাম।

আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে বাড়ির সবাই দৌড়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল এবং কিভাবে ছাড়া পেলাম, শহরে কি ঘটল, আর মাহমুদাকে কোথায়

পেলাম এসব জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল। আমি অল্প কথায় সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিলাম। আমার কথা শুনে সকলেই আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। বেগম হারেছ বললেন, "তোমরা যাও। গোসল করে খানা খেয়ে নামায পড়ে বিশ্রাম নাও।"

আমরা গোসল করে নিলাম। তারপর নামায আদায় করে খানা খেয়ে বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লাম।

বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছি, ঘুম আসছে না। এমন সময় দেখি পরিচারিকা কয়েকটা চেয়ার এনে আমার রুমে সাজাতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চেয়ার সাজাচ্ছ কেন, কোন মেহমান আসবে কি? সে উত্তরে বলল, "না, অন্য কোন মেহমান নয়, মাহমুদার মামা-মামী ও আব্বা-আম্মা বসবেন।" আমি মনে মনে ভাবলাম, তাহলে এরা নিশ্চয়ই বিয়ের আলাপ করবেন, তাছাড়া অন্য আর কিছু নয়।

আমার ভাবনা শেষ হতে না হতেই এক এক করে চারজনে চারটি চেয়ার দখল করে বসলেন। এর মধ্যে ছওদাও উঁকি ঝুঁকি মারছে। পরিচারিকা আর একটি চেয়ার এনে একদম পিছনে রেখে দিল। ছওদা এবার এ শূন্যস্থান পূরণ করে দিল। পরিচারিকা চা পরিবেশন করছে। এর মধ্যে ডাক্তার সাহেব বললেন, "বাবা খোবায়েব! গতকাল তো তোমার কাছে সার্বিক ব্যাপারে আলাপ করেছি। কিন্তু ইতিবাচক আলাপে পৌঁছতে পারিনি। তাই আজ এসেছি। আহা! ভাগ্যের লিখন, কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল চোখের পলকে। যাক সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

আমি বললাম, "জনাব! আপনার সব কথাই আমি দিলের কান দিয়ে শুনেছি এবং গভীর চিন্তা করেছি। আপনার পরামর্শ যে খুবই সুন্দর ও মূল্যবান তা অস্বীকার করলে সত্য প্রত্যাখ্যান হবে। কিন্তু আমি একটি কথাই চিন্তা করি তা হল, আমি হলাম সমুদ্রের ফেনার মত ভাসমান। ঢেউয়ের তালে তালে চলছি। কখন যে দম্‌কা হাওয়া এসে অস্তিত্ব শেষ করে দেবে তা কে জানে? আমার নেই বাড়ি ঘর, নেই জায়গা জমি। ঘুরি পাহাড়ে জঙ্গলে ও পথে ঘাটে। থাকি গাছতলায় বা গিরি-কান্তারে। কিছু জুটলে খাই আর না জুটলে ছবর করি বা বৃক্ষ পত্র ছিড়ে চিবিয়ে রস পান করি। এমতাবস্থায় একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করার অর্থ তার জীবন ধ্বংস করা ছাড়া আর কি হতে পারে? তাকে কোথায় রাখব সে জায়গা আমার নেই।"

আমার কথা শুনে ডাক্তার সাহেব বললেন, "তোমার এসব প্রশ্নের উত্তর আমি গতকালই দিয়েছি। হয়ত তা বুঝতে পারনি। আমি তোমাকে বলেছিলাম, দেশে থেকে এখন আর কিছু করতে পারবে না। তাই দেশের বাইরে গিয়ে

রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে তোমার গেরিলা বাহিনী মজবুত কর। উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের বহু মানুষ আফগানিস্তানে হিজরত করেছে। তুমিও যদি সেখানে যাও তবে অনেক যুবক পাবে।" তিনি আরো বলেন—

"বর্তমানে আফগানিস্তানে নাদির শাহ শাসন করছেন। তিনি দ্বীনদার, পরহেজগার, খোদাভীরু, ন্যায়পরায়ণ ও অত্যন্ত দয়ালু বাদশা। বড় ভাল মানুষ তিনি। শরণার্থীদের জন্য তিনি নিয়মিত রেশন চালু করেছেন। আফগানের উত্তরাঞ্চলে তিনি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। হাজার হাজার তাঁবু, খাদ্য, ঔষধ শরণার্থীদের জন্য পাঠাচ্ছেন। তুমি যদি যাও তবে রাজধানী কাবুলে একটি ভাল দেখে বাসা খরিদ করে নেবে। সেখানে থেকে যুদ্ধের প্লান তৈরী করবে। বাসা কেনার মত টাকা এবং দু'চার বৎসর চলার মত অর্থ আমরা ব্যবস্থা করে দেব। এমন কি আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমরাও চলে আসব। এ দেশে মুসলমানদের বাস করার মত পরিবেশ আর নেই। কাজেই হিজরতই করতে হবে। এখন বল তোমার মনের অভিপ্রায়।"

ডাক্তার সাহেবের কথা শেষ হলে আমি বললাম, "ঠিক আছে। এ বিশ্ব সংসারে আমার কোন মুরুব্বী নেই, আপনারাই আমার মুরুব্বী। জিহাদের স্বার্থে আপনাদের কথা অম্লান বদনে মেনে নিলাম।" তারপর সকলের মুখ থেকে এক যোগে বেরিয়ে এল আলহাম্‌দুলিল্লাহ। অতঃপর আসরের নামাযের পূর্বেই ইজাব-কবুলের মধ্য দিয়ে আমাদের আকদ অনুষ্ঠিত হল। বিবাহের মহর ধার্য করেছিলেন পাঁচ হাজার টাকা। আমার শ্বশুর পাঁচ হাজার টাকা আমাকে হাদিয়া দিয়ে বললেন, "এ টাকা দিয়ে তুমি তোমার মহরের ঋণ পরিশোধ কর।" আমি বললাম, এ টাকা দিতে হবে কেন? আমার নিকট গনিমতের অনেক টাকা আছে, তা থেকে দেব। তারপর দশ হাজার টাকা মাহমুদার হাতে দিয়ে বললাম, পাঁচ হাজার টাকা মহর বাবদ দিলাম আর পাঁচ হাজার দিলাম রাস্তা ঝাড়ু বাবদ। মাহমুদা হেসে কুটপাট। ওদিক থেকে ছওদা বলে উঠল, "কি গো একজনকেই রাস্তা ঝাড়ুর টাকা দিচ্ছে। আমিও তো ঝাড়ু দিয়েছি, আমার টাকা কই? আমি হাসতে হাসতে তাকেও পাঁচ হাজার টাকা দিলাম। এতে সবাই হাসলেন। তারপর আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলেন।

॥ আটচল্লিশ ॥

এক আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে রাত পোহাল। আমাকে স্বামী হিসাবে পেয়ে মাহমুদার আনন্দের সীমা নেই। সে যে কখন পিতামাতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ করবে, তা নিয়ে অস্থির। সে রাত্রেই কয়েকবার বলছিল, "চল আজ রাত্রেই বলসেবিকদের উপর আক্রমণ করি।" আমি বললাম, এত অস্থির হয়ো না, এত জজবা ভাল নয়। আল্লাহ্ চাহেত তোমাকে নিয়ে আক্রমণ করব ইনশাআল্লাহ্। এর আগে তোমাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করতে হবে। সে গর্জে উঠে বলল, "কেন! তুমি না আমাকে পিস্তল, রিভলভার, স্টেনগান ইত্যাদি অস্ত্র চালানো শিক্ষা দিয়েছ! তা তো ভুলিনি।" আমি বললাম, "শোন! এগুলো ছাড়াও অনেক কলা-কৌশল শিখতে হবে। সবগুলো তোমাকে আস্তে আস্তে শেখাব। আশা করি তোমার মাধ্যমে এক মহিলা গেরিলা টিম গঠন করতে সক্ষম হব। তুমি সে গ্রুপের নেতৃত্ব দেবে। বুঝলে সুন্দরী! আমার উৎসাহমূলক সান্ত্বনার বাণী শুনে সে আনন্দের সীমানা পেরিয়ে হারিয়ে গেল কোন সুদূরে।

হারেছ মিকাইলী ও ডাক্তার সাহেব আমাদেরকে আফগানিস্তানে কিভাবে, কোন পথে পাঠানো যায় তার পরামর্শে বসলেন। মামাজী (ডাক্তার) বললেন, "আমি হাসপাতালের গাড়ি দিয়ে উজবেকিস্তানের সীমান্তে পৌঁছে দেব।" শ্বশুরজী বললেন, "আমার খেয়াল একটি ভাল টাংগা রিজার্ভ করে দিলে কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে। এতে নিরাপত্তা বেশী মনে হয়।" আমি রাশিয়ার মানচিত্র ও বিশ্ব মানচিত্র খুলে খুব ভালভাবে নজর বুলাতে লাগলাম। তারপর বললাম, "মুহতারাম! আপনারা আমাকে পাঠানোর যে চিন্তা করছেন সেভাবে পাঠাতে পারবেন না। কারণ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছার মত কোন রাস্তা নেই। সবচেয়ে সহজ রাস্তা ছিল ট্রেনে যাওয়া। এতে সময় লাগবে প্রায় ৮/৯ দিন। এ আট নয়দিন ট্রেনে অবস্থান করা মোটেও নিরাপদ নয়। তাছাড়া পাকা রাস্তায় অর্ধেকেরও বেশী যাওয়া যাবে। এ রাস্তাও তো আমাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ আমরা তো খালি হাতে যাব না। আমাদের সাথে থাকবে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম। এসব নিয়ে কি নিরাপদে পথ চলা যাবে? আমার নিকট আফগানিস্তানে পৌঁছার দু'টি পথ খোলা আছে। একটি হল অশ্ব যোগে। জায়গায় জায়গায় মঞ্জিল কায়েম করে বিশ্রাম নিতে নিতে যে কয় মাস লাগে, সে কয় মাসে পাহাড় পর্বত আর নদীনালা পেরিয়ে পৌঁছা যাবে। তা না হয় নৌকা যোগে। ছোট্ট একটি ছৈ ওয়ালা মাছ ধরার নৌকা নিয়ে কখনো পাল তুলে, আবার কখনো দাঁড় বেয়ে মাছ ধরে ধরে চলব। আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় কল কল তালে যে নদীটি

বিরামহীনভাবে বয়ে চলছে, সে নদীটি আঁকাবাঁকা হয়ে, পাহাড় পর্বত আর বন-বনানীর কূল ঘেঁষে আফগানিস্তানের নদীসমূহে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হল আমু দরিয়া। তাছাড়া ইচ্ছা করলে ফারারুদ, ফরিরুদ, হেলমান, লুগার ও কূনার নদীসমূহেও যাওয়া যাবে। এখন মুরুব্বী হিসাবে আপনারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আমি যে পরামর্শ দিয়েছি তা আমার মনগড়া মত দেইনি। মানচিত্রে ট্রেন ও বাসে চলার যেসব অসুবিধা, দেখা যাচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বলছি। এখন আপনারা যা বলবেন তার উপরই আমল করব। মামুজী বললেন, "মেয়েরও তো একটি মত আছে, তাকে একটু জিজ্ঞাসা করে নেই দেখি সে কি বলে।" এই বলে ছওদাকে বললেন, মাহমুদাকে ডেকে পাঠাতে। ছওদা মাহমুদাকে নিয়ে এল। সে লজ্জায় চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মামাজী মাহমুদাকে লক্ষ্য করে আমাদের পরামর্শের সবগুলো দিক তার কাছে খুলে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, "মা! এখন তুমি বল কোন পথে যাবে?" উত্তরে মাহমুদা বলল, "এর আগে আমি জানতে চাই কোন পথে অগ্রসর হলে যুদ্ধ করতে করতে যাওয়া যাবে?" ডাক্তার সাহেব আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "বল বাবা, কি বলবে? তার কথার উত্তর দাও। আমি বললাম, "অশ্বে বা নৌকায় গেলে ছোটখাটো যুদ্ধ করা লাগতে পারে।" মাহমুদা আমার কথা শুনে নৌকায় যাওয়ার মত প্রকাশ করল।

ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ আমার শ্বশুরকে এই বলে পাঠালেন যে, "তুমি যাও, দেখ ভাল কোন ছৈ ওয়ালা মজবুত ও সুন্দর নৌকা পাওয়া যায় কি-না? পাওয়া গেলে মূল্য যতই হোক না কেন কিনে ফেলবে। এর সাথে রশী, ভাল পাল, ডাবল বৈঠা, দাঁড় এবং গেরাফী অর্থাৎ একটি নৌকায় যা যা লাগে তা সব এক সাথে কিনে নিও। তাছাড়া দু'চারজন মানুষ পাক করে খেতে যে সব ছামানার প্রয়োজন সবই খরিদ করে নিও। কেরোসিনের জন্য বড় একটি ক্যান্টিন আর পানির জন্য বড় একটি কলস নিয়ে নিও। হ্যারিকেন তো অবশ্যই কিনতে হবে।" তারপর সবগুলো মালের লিস্ট তৈরী করে আমার শ্বশুরের হাতে দিলেন। আমি বললাম, "মাছ ধরার ছোট একটি জালও আনতে হবে।" মামুজী লিস্টের নিচে জালের কথাও লেখে দিলেন।

শ্বশুরজী নাস্তা-পানি খেয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বিকাল তিনটায় বাড়ি ফিরে বললেন, ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে লিস্টভুক্ত সবকিছু খরিদ করে এনেছি। নৌকা বর্তমানে আমাদের ঘাঁটে বাঁধা আছে। সংবাদ পেয়ে বাড়ির সকলেই নৌকা দেখতে ঘাটে যায়। সবাই নৌকা দেখে খুব পছন্দ করল। হারেছ সাহেব একমাস চলার মত হাট বাজার করে দিলেন। এবার সবাই বাড়ি

ফিরে আমাদের বিদায় দেয়ার আয়োজন করল। সকলের চোখ ভরা জল আর মুখ ভরা হাসি। আনন্দ আর দুঃখ মিলে হৃদয় আঙ্গিনায় খেলা করছে। অর্থাৎ, একদিকে চিন্তা হল এতদিন পর্যন্ত একমাত্র সন্তানকে লালিত পালিত করে একজন অপরিচিতের হাতে তুলে দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আবার আনন্দ এই নিয়ে যে, মেয়ের ইজ্জত আব্রুর হেফাজতের জন্য, ঈমান-আকিদা সংরক্ষণের জন্য একজন উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছে।

আমার শাশুড়ী ও মামিমা দামি দামি কাপড়-চোপড় একটি বড় ব্রিফকেসে ভরে দিলে আমি বললাম, "আম্মা! এগুলো আমাদের জন্য জীবন বিপন্নের কারণ হবে। কোন স্থানে যদি চেক হয় তবে সবাই বলবে এরা জেলের বেশে ডাকাতী ও লুট তরাজ করে। কারণ জেলে নৌকায় এসব দেখে সন্দেহ করবে। এগুলো না দিয়ে পুরাতন কাপড়-চোপড় ও কাঁথা-কম্বল, বালিশ দিয়ে দেন। এগুলো আমাদের উপকারে আসবে। তারপর উনারা তাই করলেন।

আমার শ্বশুর তিনলক্ষ ও মামাশ্বশুর দুই লক্ষ টাকা দিলেন। শাশুড়ী বিশ ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের নেকলেসদানী দিয়ে বললেন, "বাবা! আল্লাহ্ যদি তোমাদের সহী সালামতে সে দেশে পৌছায় তবে এটা বিক্রি করে অনেক কিছু করতে পারবে। নেকলেসদানীটি দেখতে পিতলের মত দেখায়। আসলে খাঁটি স্বর্ণ।

সন্ধ্যা নেমে আসার পূর্বেই মাল-সামানা নৌকায় তুলে দিলেন। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আমরা মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তারপর সবাইকে নিয়ে একসাথে বিদায়ী খানা খেলাম। সকলের চোখে পানি ছলছল করছে। এবার মাহমুদার অন্তরও অনেকটা ভারাক্রান্ত হয়ে আসছে। ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরছে। বারবারই উড়নাঞ্চলে মুখ লুকানোর চেষ্টা করছে। সকলের অন্তরে একই বেদনা। এটাই হয়ত জীবনের শেষ খানা। আর হয়ত এমনটি নাও হতে পারে। খানিকটা দুঃখ, খানিকটা বেদনা, খানিকটা হতাশা, খানিকটা ভাবনা। এসবে সকলের অন্তর দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করে দিচ্ছে। মাহমুদা এবং অন্যেরা অন্যদিনের মত আহার করল না। মাত্র কয়েক গ্রাস ভক্ষণ করে হাত তুলে নিল। দস্তরখানের সব খাবার এমনি পরে রইল।

খানা সমাপ্ত করে বিদায়ের পালা। আমরা চললাম সাম্পানের দিকে নদী তটে। পরিবারের সকল সদস্যই ক্রন্দনরত। পা পা করে হেঁটে হেঁটে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা নদীর কূলে এসে হাজির হলাম। তারপর বিদায়ী সালাম ও মুসাফাহা-মোয়ানাকা করে নৌকায় আরোহণ করলাম। সকলেই চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে দোয়া করে বিদায় দিলেন।

আমাদের সাথে চলল দূরাকাশের শুক্লা দ্বাদশীর এক ফালি চাঁদ। মাঝে মধ্যে দু' একটি নৌকা উজান-ভাটিতে যাচ্ছে। নিঝুম রাত। মাঝি-মাল্লা আমরা মাত্র দু'জন। স্রোত ও বাতাসের অনুকূলে আমাদের তরী চালালাম। মাহমুদা বলল, "আমরা যেহেতু স্রোত ও বাতাসের অনুকূলে যাচ্ছি তাহলে পাল তুলে দিলে তো আরো বেগে চলবে।" পালের কথা আমার মনেই ছিল না। মাহমুদার কথায় তাড়াতাড়ি পাল বের করে টানিয়ে দিলাম। এবার কলের নৌকার মত উর্মিমালার উপর দিয়ে কল কল গান গেয়ে আমাদের তরী চলল। আমি পিছনের ছাপ্পরে বসে হাল ধরে রাখলাম। মাহমুদা আমার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে তার জীবনে ইতিকথাগুলো শোনাচ্ছে। আহঃ কত মজা! কত আনন্দ!

দীর্ঘক্ষণ হাল ধরে রাখার কারণে আমার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর ঠিকভাবে নৌকা ধরে রাখতে পারছি না। মাহমুদা আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, "আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমার কাছে দিন।" আমি বললাম, "তুমি পারবে না, কারণ একে তো প্রবল বাতাস আবার স্রোতের অনুকূলে। এখানে অনেক বুঝে-সুঝে হাল ধরতে হবে। একটু ব্যতিক্রম হলে নৌকা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হবে। তারপরও জোর করে সে আমার হাত ছাড়িয়ে বৈঠা তার হাতে নিল। অমনি নৌকাটা এক ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়ে উল্টে যাওয়ার উপক্রম হল। সে এক চিৎকার দিয়ে বৈঠা ছেড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি দ্রুত বৈঠা মজবুতির সাথে ধরে ফেললাম। আল্লাহ্‌র খাস রহমতে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম। তারপর দু'জনে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম।

অতঃপর বললাম, দেখ মাহমুদা! আমি তোমার আমীর বা কমান্ডার। আমার হুকুম মানা তোমার উপর ফরজ। আল্লাহ্‌র হুকুম মানা যেমন ফরয, ঠিক নবীর হুকুম মানা তেমনি ফরয। নবীর হুকুম মানা যেমন ফরয, আমীরের হুকুম মানা তেমনই ফরয। এর মধ্যে কোন বেশ-কম নেই। আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করলে যেমন গোনাহ, নবীর হুকুম ও আমীরের হুকুম না মানলে ঠিক তেমনি গোনাহ। কমান্ডারের কমান্ড না মানলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সাবধান আর কোনদিন এ ধরনের ভুল করো না। আমি নিজেই তোমাকে হাল ধরা শিখাব। যখন নদী শান্ত থাকে এবং স্রোতের তোড় কম থাকে তখন তোমাকে দেব, সহজে শিখতে পারবে।

রাত এগারটা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম। এখনো নামায পড়া হয়নি। ক্ষুধায় পেট চো-চো করছে। ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু করছে। তীব্র শীত ও হীমপ্রবাহে শরীর থরথর করে কাঁপছে। এবার বিশ্রাম না নিয়ে উপায় নেই। পাক করা যেসব

খাবার বাসা থেকে দিয়েছিলেন, সেসব খাবার বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মুখে নেয়ার মত নয়। তাই মাহমুদাকে বললাম, উনুনে আগুন ধরিয়ে খাবারগুলো গরম কর। তা না হয় খাওয়া যাবে না। সে তাই করতে লাগল। আমি নৌকার পালের রশি ছেড়ে দিলাম। তারপর তরণী কূলে ভিড়ালাম এবং একটি পাকুর বৃক্ষশাখায় মজবুত করে বেঁধে নামায আদায় করলাম। তারপর দু'জনে মিলে উদর পূর্ণ করে আহার করলাম। আহারাদীর পর মাহমুদাকে বললাম, তুমি হাতিয়ার হাতে নিয়ে নৌকায় বস, আমি আশ-পাশের এলাকাটা একটু ঘুরে দেখে আসি। পার্শ্ববর্তী এলাকার খবরাখবর নেয়া খুবই জরুরী।

অতঃপর মাহমুদাকে নৌকায় বসিয়ে রেখে আমি নদীর পাড়ে উঠে একটু একটু হাঁটতে লাগলাম। বেশ কিছু জায়গা ঘুরাফেরা করলাম, কিন্তু বাড়ি ঘরের কোন আলামত পেলাম না। মনে হচ্ছে যেন ধূ ধূ মরুভূমি। কিছুক্ষণ ঘুরাফেরা করে নৌকায় ফিরে এলাম। মাহমুদা ছাপ্পরে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। চন্দ্র ডুবে যাওয়ার কারণে ঘন অন্ধকারে সারা দুনিয়া ছেয়ে গিয়েছিল। সে ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। আমি ফিরে এলে সে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর আমরা পরামর্শ করে পালাক্রমে পাহারা দিয়ে রাত্রটি পোহায়ে দিলাম।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

রজনীর শেষ প্রহর। পালাক্রমে ঘুমালেও খুব তৃপ্তির সাথে ঘুম হয়েছে। আমরা অযু করে নামাযে দণ্ডায়মান হলাম। সামান্য কিছু এবাদতের পরই নিশাবসানের আলামত পূর্বাকাশে দেখা দিল। আমরা ফজর পড়ে নিলাম। এরই অল্পক্ষণ পরে আঁধারে দোল খেয়ে ভোরের রবি উদিত হল। শাখে শাখে দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়ারা সমধুর গানে গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। সোনালী রোদ্রে শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসে সোনা দানা জলজল করছিল।

আমি অজিফা শেষ করে নৌকার রশি খুলে ছাড়ার ব্যবস্থা করলাম। এতক্ষণে বাতাস মন্দীভূত হয়ে গেল। নদীর স্রোত নেই বললেই চলে। জোয়ার ভাটার পর নদী অনেকটা শান্ত মেজাজের হয়ে গেল। বাতাস না থাকায় পাল খাটানো যাবে না, তাই দাঁড় বেয়ে নিতে হবে। এবার মাহমুদাকে নৌকা চালানোর প্রশিক্ষণ দিতে লাগলাম। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটামুটি ধরনের বাইতে শিখল। তবে যতটুকু শিখল, তাতে আমার অনেকটা সহায়ক হবে। যদিও খরস্রোতা নদীতে চালাতে পারবে না। এবার তার হস্তে বৈঠা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমি বসে গেলাম। মাহমুদা খুব মন্থর গতিতে নৌকাটি বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তার পাশে বসে নদীর দু'কূলের দৃশ্যগুলো প্রাণভরে অবলোকন করছি।

ঘন্টাখানেক চালানোর পর মাহমুদা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার অবস্থা বুঝতে পেরে বৈঠাটি আমার হাতে নিয়ে বললাম, মাহমুদা খুব হয়েছে, এখন তুমি বিশ্রাম নাও। সে কাঁচা কাঁচা রোদে ছৈএর উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি প্রায় ৩শ মিটার পথ অতিক্রম করতেই সম্মুখে চেয়ে দেখি একটি ত্রিমোহনী। এর পাশে একটি খিমা দৃষ্টিগোচর হল। মনে হল এটা আর্মীদের চেক পোস্ট। আর একটু এগিয়ে দেখি বাস্তবিকেও তাই। ভয়ে শরীর কাঁপছে। তিনজন সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক ওদিক গ্রীবা ঘুরিয়ে কি যেন দেখছে। ভয়ে আমার জীবন ওষ্ঠাগত। এখান থেকে পিছনে আসা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ সৈন্যরা আমাদেরকে ভালভাবেই দেখে ফেলেছিল।

এর মধ্যে একজন সৈন্য হাত উঁচিয়ে আমাদেরকে ইশারা দিয়ে কাছে ডাকল। আমি নিরুপায় হয়ে তাদের নিকটে নৌকা ভিড়ালাম। ওরা সংখ্যায় তিনজন। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি পণ্য নিয়ে এসেছ?" আমি বললাম, আমি সওদাগর নই। মাছ শিকার করি। তারপর ওদের একজন বলল, আমাকে ওপারে নিয়ে যাও। আমি তাকে নদী পার করে দিলাম। সৈন্যটি চলে গেল। আল্লাহ্‌র রহমতে আমাদের কোন অসুবিধা হল না। মাহমুদা এ সবের কোন খবরই রাখেনি। কারণ সে ছিল গভীর নিদ্রায় শায়িত।

এখানে এসে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। কারণ এ স্থানটি হল তিনটি নদীর মোহনা। কোনটা আসল নদী আর কোনটা শাখা নদী তা বোঝা যাচ্ছিল না। সবগুলোই সমান তালে বইছে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মানচিত্র খুলে দেখলাম। কিছু বুঝতে না পেরে আনুমানিক একটি নদী দিয়ে এগুতে লাগলাম।

বেলা দ্বিপ্রহর। সূর্য মাথার উপর এসে গেছে। বাতাস বইছে প্রতিকূলে আর স্রোত বইছে অনুকূলে। স্রোতের বাঁকে বাঁকে নাও বেয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে মাহমুদার নিদ্রা ভঙ্গ হল। সে চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, "মাঝি ভাই! নামাযের সময় হয়ে যাচ্ছে, পেটেও কিছু দিতে হবে। আপনিও তো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটা মনোরম স্থান দেখে নৌকা ভিড়ান। আমি রান্না-বান্না করি, আপনি বিশ্রাম করুন। তারপর নামায ও খানাপিনা সেরে বিকালের দিকে যাত্রা করা যাবে।" আমি তাই করলাম। সে পাক করছে আমি বিশ্রাম নিলাম। এর মধ্যে বসে বসে চিন্তা করতে লাগলাম যে, আমি দাবী করছি জেলে, মাছ শিকার করি। আসলে তো আমাদের কাছে এর কোন আলামত নেই। না আছে মাছের পাত্রের মধ্যে কোন চিহ্ন, আর না আছে জালের মধ্যে। কেউ যদি এসব নিয়ে একটু চিন্তা করে তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাব। আবার এও ভাবছিলাম যে,

মাহমুদাকে যদি কেউ দেখে, তাহলে মনে করবে, এটা আবার জেলের বউ হয় কি করে? তার চেহারা সুরতে আভিজাত্যের ছাপ লেগে আছে। তখন মানুষ সন্দেহ করবে আমি তাকে কোথাও থেকে ধরে নিয়ে এসেছি এবং তুলে দেব কোন পাচারকারীর হাতে। হরিণ যেমন মূল্যবান কস্তুরী ধারণ করে জীবনহরণকারী শিকারীর লোলুপ দৃষ্টির কৃপানলে পতিত হয় ঠিক তেমনিভাবে নারীদের রূপ-লাবণ্যে কামুক ও কুচক্রি মহলের বেড়াজালে বন্দী হতে হয়। মাহমুদার শারিরীক সৌন্দর্য ও গঠনপ্রণালী যেন তার শত্রু হয়ে না দাঁড়ায়। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম।

এমন সময় ৫/৭ জন দুষ্ট যুবক নদীতে গোসল করতে এসে মাহমুদাকে দেখে পাগল হয়ে যায়। তারা শলাপরামর্শ পাকাপোক্ত করে অতর্কিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা এমনভাবে মাহমুদার মুখ বন্ধ করে দিল যে, চিৎকার দেয়ারও সময় পেল না। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। বেলা দু'টায় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হলে শূন্য নৌকা দেখে শরীর শিহরে উঠল। এদিক-ওদিক তাকিয়েও মাহমুদার কোন সন্ধান পেলাম না। কি হল, কোথায় গেল তা ভেবে পাচ্ছি না। আমার একান্ত অজান্তে যেন মস্তকে বজ্র পতিত হল। কে যেন বিষমাখা তীর কলিজায় ঢুকিয়ে এফোড়-ওফোড় করে দিল।

নৌকায় লক্ষ টাকার ছামানা রেখে তার খোঁজে কোথায় যাই! চিন্তা আর পেরেশানীতে জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম। চিন্তা করে দেখলাম, লক্ষ টাকার সম্পদের চেয়ে মানুষের দাম অনেক বেশী। নৌকা যায় যাক, মাল বিনষ্ট হয় হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মাহমুদাকে উদ্ধার করতেই হবে। জীবন দিয়ে হলেও তাকে হায়েনাদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। দিবালোকে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা সম্ভব নয়, তাই রাত্রে বের হওয়ার সংকল্প করলাম।

যোহরের নামায আদায় করে নৌকার ভিতর বসে অস্ত্রটি মুছে তৈল লাগিয়ে পাঁচটা ম্যাগজিনে গুলি ভরে নিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ছিলাম। মাহমুদার পাকানো খানা পাতিলে পড়ে আছে। তাকে ছাড়া আমার উদরে এক লোকমা আহারও ঢুকবে না। আমি মনে মনে শপথ নিলাম যে, রাতের আহার মাহমুদাকে নিয়ে নৌকায় বসে করব। তাকে ছাড়া এক লোকমা আহারও মুখে উঠাব না। চোখের পানিতে দাড়ি সিক্ত করে কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতে লাগলাম।

নদীর কূলে একজন বৃদ্ধ লোক মন্থরগতিতে পায়চারী করছিলেন। আমাকে নৌকার ভিতর নামায পড়তে দেখে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "বাবা! এখানে নৌকা ভিড়িয়ে কি করছ? অনেকক্ষণ যাবৎ এ নৌকাটি এখানে দেখছি।"

"চাচা মিয়া জাল বাওয়া খুবই কষ্ট, তাই বিশ্রাম নিচ্ছি।"

"হাঁ, যে কোন সুরতে ঈমান বাঁচানোর দরকার।"

"চাচা! আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।"

"বাবা! বুঝেও গোপন রাখা দরকার। তুমি যাবে কোথায়?"

"আমার কাজ হল, মাছ শিকার করি আর বিক্রি করি। এতে যা পাই তা দিয়ে সংসার চালাই। নদী আর বাজার ছাড়া যাওয়ার কোন জায়গা নেই।"

"বাবা! সবখানে সব গোপন করো না। আমি তোমার সামান্য উপকার করতে চাচ্ছি। যদি তা গ্রহণ কর।"

"জনাব! আপনার পরিচয়টা দিলে ভাল হত।"

"আমার নাম এক সময় ছিল মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হাশেমী। বর্তমানে শুধু আব্দুল্লাহ।"

"নাম পরিবর্তন করলেন যে?"

"তুমি যে কারণে মাছ ধরছ, আমি সে কারণে নাম পরিবর্তন করেছি।"

মুরুব্বীর কথা শুনে বুঝলাম তিনি আমার অবস্থা অনেকটাই আঁচ করে নিয়েছেন। অতঃপর আমি বিনয়ের সাথে বললাম, হুজুর! আমি আপনার উপকারের প্রত্যাশী। বলুন, আমার কি উপকার আপনি করতে চান?"

"তুমি যাবে কোথায় তা আগে বল।"

"আমি বুখারা হয়ে আফগানিস্তানে যাব।"

"তুমি পথ ভুল করেছ। ত্রিমোহনী থেকে সোজা না এসে বাম দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।"

"তাহলে আবার উজান ঠেলে ত্রিমোহনায় যেতে হবে?"

"অবশ্যই।"

"আরো কোন উপকারের আশা করতে পারি কি?"

"বল, আর কি সমস্যা! দেখি কিছু করা যায় কি-না।"

"জনাব! দুপুরে আমি এখানে নৌকা নোঙর করে বিটপী মূলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমি আমার স্ত্রীকে পেলাম না। আমার ধারণা, তাকে কেউ অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই। আমি আপনার নিকট আরজ করতে চাই যে, আপনি যদি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ঐসব গ্রামে গিয়ে ঘুরাফেরা করে এর সন্ধান করতে পারেন তবে খুবই উপকার হবে। আর আপনাকে পারিশ্রমিক হিসাবে তিন হাজার টাকা প্রদান করব। যাবেন কি?"

"বাবা! তোমার ধারণা ঠিক। ৫/৭ জন দুষ্ট ছেলেকে এদিক থেকে পরমা সুন্দরী একটি মেয়েকে নিয়ে যেতে দেখেছি। এখন তাকে কোথায় কিভাবে রেখেছে তা জানা নেই। তবে কোথায় রেখেছে তা জানা যাবে বলে আশা রাখি।"

অতঃপর বৃদ্ধ চলে গেলেন। আমি আছরের নামায আদায় করে টাকা আর স্বর্ণগুলো মজবুত করে কোমড়ে বেঁধে নিলাম। তারপর অস্ত্র ঠিকঠাক করে বুড়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম। সূর্য অস্ত গেছে। মাগরিবের নামায আদায় করলাম। এরই একটু পরে বৃদ্ধ ফিরে এসে বললেন, বাবা! জলদি আমার সাথে এস। বিলম্বে ক্ষতি হবে। তার সন্ধান পেয়েছি বটে, তবে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছে। আমি অস্ত্রটা হাতে নিয়ে হুজুরের পিছু পিছু চলতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ বৃদ্ধের পিছনে পিছনে চলার পর এক প্রাচীর বেষ্টিত প্রাসাদের নিকট এসে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার প্রিয়তমা এ বাড়ির যে কোন একটি কক্ষে বন্দী আছে। এখানে হয়ত আরো কোন বন্দী থাকতে পারে। বাবা! তোমার প্রিয়তমা ছাড়া আরো কোন বন্দিনীকে যদি উদ্ধার কর তাহলে আমাকে জানাবে। সে বন্দিনী হয়ত আমার ষোড়শী কন্যা খাদিজা হতে পারে। তুমি চেষ্টা করে দেখ, ওদেরকে মুক্ত করতে পার কি-না। আমি চললাম তোমার নৌকা পাহারায়।" এই বলে বৃদ্ধ নৌকার দিকে চলে গেলেন।

আমি অট্টালিকার চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। ফটক ভিতর দিয়ে বন্ধ, কোন দ্বাররক্ষী আছে বলে মনে হয় না। প্রাচীরের অভ্যন্তর থেকে করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। এ আর্তনাদ নারী না পুরুষের তা বোঝা যাচ্ছিল না। প্রাচীরে উঠা বা প্রাচীর ডিংগিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা ছিল খুবই কঠিন। মোটা রশি হলে রশির সাহায্যে উঠা যেত, কিন্তু রশিতো নেই। অনেক ভেবে চিন্তে নৌকায় ফিরে এলাম এবং রশি নিয়ে গেলাম। তারপর প্রাচীর সংলগ্ন একটি গাছ বেয়ে উপরে উঠলাম। যে ডালটি প্রাচীরের উপর দিয়ে ভিতরে গেছে, সে ডালটির মধ্যে রশির এক মাথা ভাল করে বেঁধে নিলাম। তারপর রশি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

চেয়ে দেখি প্রাসাদের এক পাশে একটি প্রাইভেট কার রয়েছে। প্রাসাদ অভ্যন্তরে মানুষের শোরগোল ও কান্নকাটি। আমি অস্ত্রহাতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে গগনবিদারী তাকবীর লাগিয়ে দিলাম। আমার তাকবীর ধ্বনিতে সমস্ত শোরগোল স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়ে সবাই প্রকম্পিত। চেয়ে দেখি তিনজন পরমা সুন্দরী যুবতীকে ওরা বেঁধে ফেলে রেখেছে। এদেরকে যৌন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছিল। আমি প্রথমেই বন্দীদের বন্ধন মুক্ত করে দিলাম। তারপর

বললাম, তোমরা মুক্ত, এসো আমার সাথে। লম্পট যুবকরা ভয়ে কম্পমান। টু শব্দ করার সাহস পর্যন্ত পেল না। আমি বন্দিদেরকে নিয়ে ফটকের নিকট আসতেই দ্বাররক্ষী আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াল এবং গেট খুলে দিল। আমি গেটের বাইরে এসে বললাম, আছ কি কেউ তাদেরকে ছিনিয়ে রাখবে বা আমার সাথে মোকাবেলা করবে? সবাই নীরব।

বিনা বাঁধায় বন্দীদেরকে মুক্ত করে নৌকায় নিয়ে এলাম। তারপর মাহমুদার পাকানো খানা সবাইকে খেতে দিলাম। এ পর্যন্ত সব মেয়েরাই ছিল অনাহারী। আমার নির্দেশে সবাই খানা খেল। তারপর বৃদ্ধকে বললাম, হুজুর! আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন, তা চিরদিন মনে রাখার মত। দোয়া করি আল্লাহ্ আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন। এখন আপনার কন্যাকে আপনি নিয়ে যান। অপর মেয়েকে তার পরিবারের নিকট পৌঁছে দিতে বৃদ্ধকে অনুরোধ জানালাম।

বৃদ্ধ বললেন, "বাবা! আমি এখানকার বাসিন্দা নই। আমার বাড়ি জার্দুখল। মেয়েকে অপহরণ করে আনায় আমি তিনদিন যাবত খেয়ে না খেয়ে এ এলাকায় ঘুরে ঘুরে মেয়ের মুক্তির চিন্তা করছিলাম। আল্লাহ্র খাস মেহেরবানীতে তোমার উসিলায় উদ্ধার হল। এখন আমি আমার নিবাসে ফিরে যাব। তুমি যে নদী দিয়ে যাবে সে নদী আমার বাড়ির পাথ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। তুমি যদি দয়া করে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তবে বড়ই উপকার হত।" আমি বললাম, "ঠিক আছে চলুন। অপর মেয়েকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলল, আমারও নিবাস জার্দুখলে। পাষণ্ডরা আমাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। আমার আত্মীয়-স্বজনরা কেউ আমার অপহরণের সংবাদ রাখেনি। আপনারা যদি দয়া করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন-তাহলে খুবই উপকার হত।"

আমি চিন্তা করলাম, আমাকে যদি জার্দুখল হয়েই যেতে হয় তাহলে এদের একটু উপকার করে যাই। এরাতো আমারই অসহায়া ও বিপন্ন বোন। এসব ভেবে বললাম, আচ্ছা আপনারা সবাই নৌকায় আরোহণ করুন। এখনই নৌকা ছেড়ে দেব। সবাই নৌকায় বসল। আমি গেরাফী টেনে তুলে নিলাম। এমন সময় দেখি শত শত লোক দা-লাঠি নিয়ে এদিকে আসছে। এখানে গোলাগুলি করা সমীচিন মনে করলাম না। তাই নৌকা ছেড়ে নদীর মধ্যে নিয়ে এলাম এবং আমাদের গন্তব্যের দিকে এগুতে লাগলাম। দুশমনরা কিছুক্ষণ হৈ-হুল্লো করে চলে গেল। আমরা একরাত একদিন নৌকা বেয়ে প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে জার্দুখলে এসে পৌঁছলাম। বৃদ্ধের অনুরোধে জার্দুখলে রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

॥ পঞ্চাশ ॥

রাতের খানা পিনার ব্যবস্থা বৃদ্ধই করলেন। এশার নামায আদায় করে বললেন, "বাবা! তুমি তো আফগানিস্তানে হিজরত করতে চাচ্ছ। বুঝি, এ হিজরতটা তোমার সময়ের দাবী, তা ছাড়া ঈমান হেফাজতের অন্য কোন পন্থা নেই। যদি অবস্থা এত নাজুক না হত তাহলে তোমাকে বলতাম, কমিউনিস্ট বেঈমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। মেয়েদেরকে উদ্ধার করতে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ তা দশজন যুবকের পক্ষেও সম্ভব নয়। তোমার আলীশান হিম্মত, কৌশল আর সাহস দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম। সত্যিকার অর্থে তুমিই হলে মুজাহিদ। আহা! তোমার মত অকুতোভয় যুবককে যদি আনোয়ার পাশা পেতেন বা খোবায়েবকে পেতেন তাহলে দ্বীনের বহু উপকার হত।"

বৃদ্ধের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি যাদের নাম বলছেন তাঁরা কারা? থাকে কোথায় আর কি করেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "এরা ছিলেন দ্বীনের মুজাহিদ, আল্লাহ্‌র সৈনিক। এরা কাফেরদের সাথে জিহাদ করত। কিছুদিন জিহাদ করার পর আনোয়ার পাশা শহীদ হয়ে যান। আর বর্তমানে যিনি সবচেয়ে বেশী আলোচিত ব্যক্তি তিনি হলেন খোবায়েব।"

"খোবায়েব এত আলোচিত ব্যক্তি কি করে হলেন?"

"তার গেরিলা বাহিনী খুবই দুর্ধর্ষ। রণ-কৌশল আর্মীদের চেয়ে অনেক বেশী। কোন হামলায় পরাজয় বরণ করেনি।"

"বাড়ি কোথায় খোবায়েবের?"

"তার বাড়ি কোন প্রদেশে তা জানি না, তবে আমার উস্তাদের একজন ছেলে ছিলেন এ নামে। সেও ছিল মুজাহিদ। আবার এ গুজবও উঠেছিল, খোবায়েব শহীদ হয়ে গেছে। আসলে এ কোন খোবায়েব তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।"

"আপনার উস্তাদ কে এবং তাঁর বাড়ি কোথায়?"

"তিনি ছিলেন আলমাআতা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাপরিচালক। তাঁকেও বলসেবিকরা শহীদ করে দিয়েছে। তাঁরই একমাত্র সন্তান ছিলেন খোবায়েব জাম্বুলী।"

বৃদ্ধের কথা শুনে আমি আমার পূর্ণ পরিচয় দিলাম এবং অতীতের কিছু ঘটনাবলী শোনালাম। তারপর তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "হুজুর! জীবন বাঁচানোর জন্য কাপুরুষের মত হিজরত করিনি। জিহাদের তীব্র বাসনা নিয়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছি। শুনেছি আমার দেশের অনেক দ্বীনদার পরহেজগার আলেম, উলামা ও যুবকরা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে গিয়ে জমা হয়েছেন। মহামতি

নাদির শাহ নাকি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি যাচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, সেখানকার যুবকদেরকে যদি জিহাদের জন্য তাশ্‌কিল করতে পারি এবং জিহাদের উপর উঠাতে পারি তাহলে আবার জিহাদের কাজ চাঙ্গা করা যাবে। এ উদ্দেশ্য যদি না থাকত তবে তো হিজরত করা জায়েয হত না। ক্বিতালের (জিহাদের) আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তো হিজরতের আমল মনছুখ (রহিত) হয়ে গেছে। দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন আমার আশাকে পূরণ করেন। এসব আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে রাত গভীর হয়ে গেল। তারপর শয্যা রচনা করে শুয়ে পড়লাম। মাওলানা দু'জন লোক দিয়ে নৌকা পাহারার ব্যবস্থা করলেন।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে অজু, এস্তেঞ্জা ও নামায আদায়ের পর সামান্য নাস্তা করে নৌকায় আরোহণ করলাম। তারপর পাল উঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে হাল ধরে বসলাম। বিকাল চারটার দিকে আবাদী ভূমি পেরিয়ে পাহাড়ী ও বনাঞ্চলে এসে পৌঁছলাম। উপরের দিকে তাকালে মনে হয় পর্বতের চূড়াগুলো শুভ্র টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ ছোঁয়া পর্বত শৃঙ্গ। পর্বত জুড়ে রয়েছে ঘন জঙ্গল। নদী বেশ গভীর, স্রোতও খুব বেশী। স্রোতের অনুকূলে হাল ধরে রাখলাম। প্রবল বাতাসের ধাপ্‌টায় একেক সময় নৌকা উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়। এতে মাহমুদা খুব ভয় পাচ্ছিল। তারপর পালের রশি খুলে দিল মাহমুদা। এবার নৌকার বেগ অনেকটা কমে গেল। এভাবে রাত ৮টা পর্যন্ত নৌকা চালিয়ে এক পর্বতের পাদদেশে নোঙ্গর ফেললাম। কারণ এখন আর সামনে যাওয়া যাবে না। শরীর খুবই ক্লান্ত। মাহমুদা খানা তৈরীতে লেগে গেল, আমি তাকে সাহায্য করতে লাগলাম। খানা পিনা শেষ করে ছৈ এ বসে দু'জনে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করতে লাগলাম।

মাহমুদা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি এত ভীরু তা প্রকাশ করতেও লজ্জা লাগে। একজন মুজাহিদ থাকবে বীর পুরুষের মত নির্ভীক, অকুতোভয়। আর আপনাকে দেখছি মহিলাদের চেয়ে ডরুক।"

"তুমি সত্যিই বলেছ, দোয়া করো আমি যেন নির্ভীক হতে পারি। তবে আমার কোন আমলটি তোমার কাছে আমাকে ভীরু হিসাবে পরিচয় দিয়েছে?"

"আপনাকে দেখছি সর্বক্ষণ কাঁধে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখেন, একটু বিরক্তও লাগে না?"

"মাহমুদা! অস্ত্র সাথে রাখার জন্য তুমি আমাকে ভীরু বলছ! এটা তো আমার প্রিয় নবীর শিক্ষা। অস্ত্র নিয়ে নামায পড়লে কয়েকগুণ বেশী সওয়াব হয়। আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-এর তাক্‌ওয়া, পরহেযগারী, তাওয়াক্কুল ও বাহাদুরী কম

ছিল না। দুনিয়ার ইতিহাসে তাঁর মত এত বড় সমরবিদ ও রণকৌশলী আর কেউ ছিলেন না। তারপরও তিনি সশস্ত্র থাকাকে অধিক পছন্দ করতেন। তিনি কোন সময় গাফেল থাকতেন না। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) অধিকাংশ সময় সারারাত্র হুঁশিয়ারীর সাথে জাগ্রত থাকতেন। (ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা) প্রকৃত প্রস্তাবে সাথে অস্ত্র রাখাটাই হুঁশিয়ার বা বাহাদুরীর আলামত। অস্ত্র না রাখাটা হল কাপুরুষতার লক্ষণ। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) এবং হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ কাপুরুষতা থেকে এমনভাবে মুক্তি চাইতেন, যেমনভাবে পানাহ চাইতেন শিরক ও কুফর থেকে। (বুখারী ১ম খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয়তমা মাহমুদা! দেখ আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর ঘরে খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমীরা, সুকেস, ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আমার নবীর গৃহে ছিল ১১টি তরবারী, ৮টি নেযা, ৬টি কামান, ২টি জংগী টুপি, ৭টি যুদ্ধ পোষাক, ৪টি ঢাল, তাছাড়া যুদ্ধের জন্য ছিল উট, উটনী ও ঘোড়া। অতএব যুদ্ধের সরঞ্জামাদী সব সময় প্রস্তুত রাখা সুন্নত। আমি চাই না এক মুহূর্তের জন্যও অস্ত্র ছাড়া থাকি। চাই না কোন মুসলমান অস্ত্র ছাড়া থাকুক। যেদিন থেকে মুসলমান অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে, সেদিন থেকে দুশমনরা মুসলমানদের উন্নত শির গোলামীর জিঞ্জির পড়িয়ে নত করেছে। বর্তমানে মুসলমানরা পরাধীন। মুসলমানরা এখন কাফেরদের গোলামে পরিণত হয়েছে। হে আল্লাহ্! তুমি এ জাতিকে বাঁচাও।

আমি মাহমুদাকে পাহারাদারীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ফজিলত শুনিয়ে বললাম, দেখ মাহমুদা! নবীজীর অন্তরে মউতের ভয় ছিল না। আর মউতের ভয় থাকবেই বা কেন? যিনি ছিলেন পুতঃপবিত্র ও গোনাহ থেকে একেবারে পবিত্র, তাঁর আবার মউতের ভয় থাকবে কেন? তারপরও তিনি যখন মদীনাতে গেলেন তখন কাফেররা তাঁকে হত্যার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। তাই তিনি তাঁর বাড়িতে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজেও রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামগণ পাহারাদারী করেছেন। তাহলে আমরা কেন পাহারাদারী থেকে বঞ্চিত থাকব? এবার মাহমুদা নিজেই অনুতপ্ত হয়ে বলল, "প্রিয়তম! না জেনে, না বুঝে অনর্থক প্রশ্ন করেছি। ক্ষমা চাই; আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। আজ থেকে আমি নিয়মিত পাহারাদারী করব। কোন প্রকার অলসতা করব না।"

অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলত, আজ রাত্রে কে কখন, কতক্ষণ পাহারা দেবে? উত্তরে বলল, "আমি প্রথম অর্ধরাত আর আপনি বাকি রাত পাহারা দিবেন।"

“নৌকায় বসে, না স্থলে দাঁড়িয়ে?’

“নৌকায় বসে, একদম আপনার কাছে বসে।”

“হাঁ, নৌকায় বসেই তবে প্রদীপ নেভানো থাকবে।”

“তাহলে তো ভয় পাব।”

“ভয় পেলে চলবে না। এটাই পাহারাদারীর নিয়ম। যদি বাতি জ্বালানো থাকে তাহলে দূর থেকে দুশমন তোমাকে ভালভাবে দেখবে, সহজে তোমাকে টার্গেট বানাতে পারবে।”

“ঠিকই তো! তা তো আমার মোটেও জানা ছিল না।”

“শোন! পাহারাদারী অবস্থায় মুখে থাকবে আল্লাহ্র যিকির আর চোখ এবং কান থাকবে সদা জাগ্রত। তবে চোখ থেকে কানের পাহারাদারী রাতের বেলায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বুঝলে? এসব বুঝিয়ে দিয়ে আমি শয্যা গ্রহণ করলাম, সে পাহারা দিতে লাগল।

নিঝুম রাত। প্রচণ্ড শীত। দুদিকের পাহাড়গুলো দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে। কলকল তালে বিরামহীনভাবে নদী বয়ে চলছে। শুক্লাপক্ষের পূর্ণ চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে। নদীতে আমাদের নৌকা ছাড়া আর কোন নৌকা নেই। কারণ পাহাড়ী অঞ্চলের নদীগুলোতে কুমির আর হাঙ্গর থাকে বেশী। তাই জেলেরা বা অন্য কোন মাঝিমাল্লারা নৌকা নিয়ে এদিকে আসে না। ক্ষুধার্ত হাঙ্গর শিকার ধরতে নদীতে যে ছুটাছুটি করছে এতে মনে হয় নদীর পানি সব একাকার করে দিচ্ছে। একেকবার শরীর শিহরে উঠে।

রাত প্রায় ১১টা। আমি গভীর ঘুরে অচেতন। মাহমুদা এক চিৎকার দিয়ে আমার উপর আছড়ে পড়ল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি ছাপ্পর সম্মুখে খালি জায়গায় ইয়া বড় দুটি ব্যাঘ্র দাঁড়িয়ে আছে। আমি অস্ত্রটি হাতে নিয়েই গুলি ছুড়লাম। একটি নৌকায় লুটিয়ে পড়ল আর অপরটি লাফিয়ে পড়ল নদীতে। বেরেল ঘুরিয়ে সেটাকেও নিশানা বানালাম। এবার দেখি সর্বশান্ত হয়ে ভেসে উঠল।

ব্যাঘ্রটি মরে ভেসে উঠতেই অসংখ্য হাঙ্গর এসে সেটাকে টানা-হেঁচড়া আরম্ভ করে দিল। চাঁদের আলোতে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তারপর চিন্তা করে দেখলাম এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের নৌকা যদি মজবুত না থাকত তাহলে হাঙ্গরের লেজের আঘাতে নৌকা ভেঙ্গে যেত। হাঙ্গরের উদরে হত আমাদের স্থান। বাঘের উপদ্রব তো আছেই। আমার ভাগের ঘুম তো ঘুমিয়েই ফেলেছি। এখন তো পাহারাদারীর পালা। বসে বসে পাহারা না দিয়ে সামনে চলতে লাগলাম, যতটুকু যেতে পারি ততটুকুই পথ কমবে। তাই মাহমুদাকে নৌকার

ভিতর ঘুমানোর নির্দেশ দিয়ে আমি নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর নৌকা আর সামনে যাচ্ছে না। চেয়ে দেখি পানির উপর বিশালাকারের বরফের চটানগুলো ভাসছে। আহা! এবার কি করি। নিচ দিয়ে স্রোত বইছে আর উপরিভাগে বরফের চটান। এখন নৌকা কোনদিকেই নিতে পারছি না। বরফ গলার অপেক্ষায় এখানেই যাত্রা বিরতি করতে বাধ্য হলাম।

রাত পোহায়ে ভোর হল। আমরা ফজরের নামায আদায় করলাম। মাহমুদা জিজ্ঞাসা করল, কতদূর পথ অতিক্রম করেছি? আমি বললাম, পথ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। আমরা বরফে আটকা পড়ে গেছি। চেয়ে দেখি নৌকার চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ।

রান্না-বান্না, খানা-পিনা, নৌকাতেই হচ্ছে। আমি খঞ্জর দিয়ে ব্যাঘ্রের চামড়াটা ছুলিয়ে রেখে দেহটা নদীতে ফেলে দিলাম। তারপর রক্তগুলো ধুয়ে নৌকাটা পরিষ্কার করলাম। এভাবে বেজে গেল সকাল ১০টা। তারপর বরফ গলতে শুরু করল। বারটার দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হতে লাগলাম।

দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর্যন্ত বরফাঞ্চল পাড়ি দিতে লেগে গেল। আরো ১৫দিন কেটে গেল পাহাড়াঞ্চল পাড়ি দিতে। এত সময় লাগার কারণ হল নদী পথ। খুবই আঁকাবাঁকা। দু'ঘন্টার রাস্তা যেতে হয় দুদিনে। এভাবে অনেক কষ্ট করে ৪৫ দিনে লোকালয়ে এসে পৌছলাম। ম্যাপ খুলে দেখি আমরা প্রায় সমরকন্দের কাছাকাছি এসে গেছি।

আমাদের খাবার-দাবার যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে। এখন বাজার না করলে চলবে না। ভাবলাম আরো একটু সামনে গিয়ে যদি নদীর কূলে কোন হাট-বাজার পাই তাহলে সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করে নেব। সে আশায় চলতে চলতে বিকালের দিকে ওয়েন্টানাভ বন্দরে এসে পৌছলাম। আমি মাহমুদাকে বললাম, তুমি নৌকার ভিতর কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক, আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব। এই বলে বাজার করার বস্তা নিয়ে চলে গেলাম এবং প্রয়োজনীয় সব বাজার করে নৌকায় ফিরলাম।

ফিরে এসে কালবিলম্ব না করে আবার চলতে লাগলাম। দিনের পর দিন নৌকা বেয়ে আরো প্রায় এক মাস পরে সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানের ফারারুদ নদীতে এসে পৌছলাম। ফারারুদ অববাহিকায় অনেক তাঁবু দৃষ্টিগোচর হল। বুঝতে পারলাম এরা স্বদেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা এখানেই নোঙ্গর ফেললাম।

॥ একান্ন ॥

আফগানিস্তানে প্রবেশের পরই নতুন পুলকে মন প্রাণ ভরে গেল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পবন হিল্লোলিত হয়ে বইতে লাগল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পাখিরা স্বাধীনতার গান গেয়ে মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতার আনন্দ বক্ষে ধারণ করে নদীগুলো কলকল তানে বয়ে চলছে। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গরাও সমভাবে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছে।

ধিক্কার! শত ধিক্কার! কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাসখন্দ, সমরখন্দ, বুখারার মুসলিম জনগোষ্ঠির। তিরস্কার জানাই জার নিকুলাই এর কাপুরুষ বাহিনীদের! তোমরা একটি কুফরী নীতির লালন ও সম্প্রসারণের জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছ! হয়ত ভেবেছিলে কমিউনিজম মেনে নিলে স্বর্গ পেয়ে যাবে! আসলে কি তা পেয়েছ? হারিয়েছ স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। সবাই ভেবেছিলে, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাবে—অর্থাৎ ধনী আর গরীব হয়ে যাবে এক সমান। এখন ধনী গরীব মিলে হয়ে গেলে শাসক গোষ্ঠির গোলাম।

ওহে হতভাগা জাতি! তোমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল, ধর্মীয় স্বাধীনতা দেবে। আজ কোথায় পেলে ধর্মীয় স্বাধীনতা? তোমাদের পূর্বসূরীদের নির্মিত মসজিদ, মাদ্রাসা আর খানকাগুলোকে আস্তাবলে, ক্লাবে আর মদ্যশালায় রূপান্তরিত করেছে। ওহে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদানকারী মুনাফিক মুফতীগণ! জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাদের মা-বোন, কন্যা আর স্ত্রীদের সম্ভ্রমও রক্ষা করতে পারলে না বরং তোমরা নিজেরাই তোমাদের মা-বোন, আর যুবতী কন্যাদের তাদের হাতে তুলে দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ। চিরদিন মুনাফিক হিসাবে তোমাদেরকে ইতিহাস স্মরণ করবে। আমার এসব ধিক্কার আর তিরস্কার অরণ্য রোদনেরই নামান্তর, কারণ মনে মনে যতই গালি দেই না কেন কে শুনবে সে গালি।

তারপর আমি মাহমুদাকে নিয়ে আমার দেশের পালিয়ে আসা রিফুজিদের দেখার জন্য ক্যাম্পে ঘুরতে লাগলাম। এমন কোন পরিবার আমি খুঁজে পাইনি, যে পরিবারের একজন লোকও শহীদ হয়নি। কেউ হারিয়েছে সন্তান, আর কেউ হারিয়েছে ভাই। কেউ হারিয়েছে স্বামী আর কেউ হারিয়েছে পিতা। কেউ হারিয়েছে মেয়ে আর কেউ হারিয়েছে মাতা। বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি আর সহায় সম্পদ হারিয়েছে সবাই। আমি সবগুলো উদ্বাস্তু শিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ছোট বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেকের সাথে ভাব বিনিময় হল। কিন্তু আমার পরিচয় কেউ পেল না। আমিও আমার পরিচয় দিলাম না। আমার সন্দেহ ছিল

যে, এসব এলাকায় লেলিনের চর পাঠাতে পারে, যেন কেউ জিহাদের জন্য সংগঠিত হতে না পারে।

শরনার্থী শিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছি আর মানুষের মন মেজাজ ও চিন্তা চেতনা জরিপ করছি। একবার মাহমুদাকে বললাম যে, "তোমার সোনাদানা ও অর্থ সম্পদ ছাড়াই আমার নিকট গনিমতের দেড় লক্ষ টাকার উপরে আছে। এসব টাকা তো জমা করেছিলাম জিহাদের উদ্দেশ্যে। কোন জিহাদী কাফেলা গঠন করা ছাড়া তো টাকার প্রয়োজন নেই। টাকাগুলো অযথা পড়ে থাকলে দ্বীনের কি ফায়দা হবে? প্রিয়নবীর উম্মতরা আজ কত কষ্ট করতেছে তা নিজ চোখে দেখলে। কত মাসুম বাচ্চারা খাদ্য, ঔষধ ও পুষ্টিহীনতার অভাবে মায়ের কোলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। খিমায় খিমায় তো দেখেছ কত নর-কঙ্কাল মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছে। এদের পাশে দাঁড়ানোর মত তো কেউ নেই। মহামতি নাদির শাহ্ যদিও এদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করেছেন তা পর্যাপ্ত নয়, খুবই সীমিত। আমি চাই আমার একলক্ষ টাকা তাদের মধ্যে বিতরণ করতে। আফগানিস্তানে জিনিস পত্রের দাম খুবই কম। ৫০ হাজার টাকার খাদ্য-বস্ত্র ও ঔষধ দিলে আর নগদ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করলে আপাতত তাদের অভাব থাকবে না। এতে তোমার অভিমত কি?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে মাহমুদা বলল, "স্বামী গো! এ মহৎ কাজে আমিও সামিল থাকতে চাই। আমার লক্ষ লক্ষ টাকা যদি দ্বীনের কোন উপকারেই না আসে তাহলে এ টাকা দিয়ে কি হবে? আমিও আপাতত ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আপনার সাথে শরীক থাকতে চাই।" মাহমুদার প্রস্তাব শুনে আমি খুবই খুশী হলাম এবং বললাম, "মাহমুদা! তোমরা প্রতি আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ও যেন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।"

অতঃপর বেছে বেছে দশজন যুবককে রাতের খানার দাওয়াত দিয়ে আমার নৌকায় নিয়ে এলাম। তাদেরকে নিয়ে এক সাথে বসে খানা-পিনা করলাম। তারপর খাতা কলম নিয়ে ত্রাণ বিতরণের শৃঙ্খলার জন্য ছক এঁকে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিলাম। ওরা যেন শরনার্থী শিবিরগুলো ঘুরে ঘুরে প্রতিটি পরিবার প্রধানের নাম, লোক সংখ্যা, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও রোগীর তালিকা তৈরী করে এবং কার কি প্রয়োজন তার তালিকা তৈরী করে। এভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে খাতা কলম দিয়ে দিলাম। যুবকদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "জনাব! এসব তালিকা প্রস্তুত করলে কি হবে?" আমি বললাম, "এসব তালিকা তৈরী করে সরকারের নিকট আবেদন করে দেখি কিছু

অনুদানের ব্যবস্থা করা যায় কি-না।" অন্য এক যুবক বলল, "জনাব! আমাদের তো প্রতিনিধি আছে, তাঁদের কাছে বললেই হত।"

"প্রতিনিধি কে বা কারা তা তো চিনি না।"

"আমাদের সাথে চলুন, পরিচয় করিয়ে দেই।"

"উনারা থাকেন কোথায়?"

"তাঁরা সংখ্যায় পাঁচজন। তিনজন এখানে থাকেন আর দু'জন মাঝে মধ্যে আসেন।"

"তাঁরা কোথাকার বাসিন্দা?"

"তা ঠিক জানি না, তবে মনে হয় উজবেকিস্তানের হবেন। ভাষা ও চেহারায় তাই মনে হয়।"

"উনারা কি হিজরত করে এসেছেন, না এমনিতেই আছেন তা বলতে পার কি?"

"না, তা জানি না।"

"এখানে কি পরিবার পরিজনসহ থাকেন না শুধু উনারাই থাকেন।"

"পরিবার নিয়ে থাকেন না উনারা। এখানে তাঁরা অফিস তৈরি করেছেন। খুব সংরক্ষিত এলাকায় থাকেন। সেখানে কাউকে যেতে দেন না। তাঁরা আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন নিয়ে ভাবেন। মাঝে মধ্যে কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করেন।"

"উনাদের সাথে কি দেখা করা যায় না?"

"যাবে না কেন? দু'এক দিন পরপরই উনারা এসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন, খোঁজ খবর নেন। উনারা সবাই আলেম।"

যুবকের কথা শুনে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। পরিবার-পরিজন কিছুই সাথে নেই, অথচ রিফুজিদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আবার সংরক্ষিত এলাকায় থাকেন।

অতঃপর আমি খুব গোপনে গোপনে তাদের প্রতি নজরদারী করতে লাগলাম। এরা কখন কি বলে, কোথায় যায় ও কি করে তা জানার জন্য চেষ্টা করছি এবং আল্লাহ্র নিকট দোয়া করছিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই এসব নেতাজীদের ছল-চাতুরী ও ধোঁকাবাজী আমার নিকট ধরা পড়ে গেল। এরা বলসেবিকদের চর। এদের মধ্যে একজন বুকাইলীর তুরাব হারুনী সাহেবের মসজিদের ইমাম ছিল। যার চাপাবাজি ও ধাপ্পাবাজির কারণে হযরত মাওলানা নজির আহম্মদ আলওয়ানী শহীদ (রহঃ) কে এনে জিহাদের উপর বাহাছ করানো হয়েছিল। ইমাম সাহেব আমাকে মোটেই চিনতে পারেনি।

আমি অনেক কৌশলে তাদের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একদিন সমস্ত শিবিরের লোকজন জমা করে বয়ান করছিল উক্ত মুনাফিক ইমাম সাহেব। সে বলছিল, "ভাই সব! আজকে ঐসব মুজাহিদরা কোথায়? যারা সমাজে জিহাদের নামে আগুন ধরিয়েছে। যাদের কারণে আমরা আজ ভিন দেশে রিফুজি হতে বাধ্য হয়েছি। জিহাদ ফরজ তা আমরা জানি। কখন কার সাথে কিভাবে জিহাদ করতে হবে তাও জানি। জিহাদের সময় এখনো হয়নি। বলসেবিকরা শরীয়ত বিরোধী আইন পাশ করেছে তা মানি। আমরা যেহেতু তাদের সাথে শক্তিতে কুলাতে পারব না সেহেতু নীরব থাকার দরকার ছিল। মুজাহিদদের চেয়ে হেকমত আমরা কম বুঝি না।"

উক্ত ইমাম সাহেবের শরীয়ত বিরোধী বক্তব্য আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাই একটু সময় চেয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "ভাইসব! বুকাইলের জামে মসজিদের খতিব ও আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আল্লামা ছদর উদ্দীন বুকাইলী যে দার্শনিক বক্তব্য রেখেছেন এজন্য তাকে জানাই ধন্যবাদ। তিনি যে বলেছেন আমরা মুজাহিদদের কারণেই দেশ ত্যাগ করেছি তা সত্য। মুজাহিদরা যদি জিহাদ না করে তাদের মা-বোন, আর কন্যাদেরকে বলসেবিকদের হাতে তুলে দিত, আর ঈমানের বিনিময়ে যদি কুফুরী মতবাদ মেনে নিত তাহলে কতই না ভাল হত। আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা হযরত মাওলানা ছদর উদ্দীন বুকাইলী সাহেবের উদরে হেকমতের ভাণ্ডার, তাই তার যুবতী কন্যাকে ও তার সুন্দরী বোনকে বলসেবিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ইস্! কত সুন্দর হেকমত। এখন আর বলসেবিকরা তাকে কিছু বলে না। বর্তমানে তো তিনি হেকমত খাটিয়ে তাদের থেকে বেতনও গ্রহণ করতেছেন। ইমামতি থেকে আর কত টাকা পেতেন? এখন তার টাকারও অভাব নেই আবার নিরাপত্তারও অভাব নেই। আজকের এ মহতী সভার পক্ষ থেকে মহামান্যকে বেঈমান উপাধি দেয়া হল।"

আমার বক্তব্য শুনে ইমাম গ্রুপের লোকদের হৃদপিণ্ডে কম্পন আরম্ভ হয়ে গেল। আর উপস্থিত লোকজনের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পেরেছে এ শয়তান বলসেবিকদের খাঁটি গোলাম ও গুপ্তচর। আলোচনা সমাপ্ত করে পাঁচজন যখন খিমায় ফিরছিল তখন এক ব্রাশফায়ারে তাদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করলাম। তারপর লোকজনকে ডেকে বললাম, "ভাইসব! মুনাফেক খতম হয়েছে। আর কোনদিন যেন অত্র এলাকায় মুনাফিক প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য সতর্ক থাকবেন।" এবার সবাই বুঝতে পেরেছে আমি কে।

পরদিন যুবকরা খিমায় খিমায় ঘুরে ঘুরে তালিকা তৈরী করল। তারপর নগদ টাকা ও প্রয়োজনীয় মালামাল কিনে বণ্টন করে দেয়া হল। খরচের সংখ্যা

ছিল দেড় লক্ষ টাকা। শরনার্থীরা এসব সাহায্য পেয়ে খুবই খুশী হলেন। তারপর যুবকদেরকে বললাম, "প্রিয় ভায়েরা! আমরা চিরদিন ভিন দেশে রিফুজী হিসাবে থাকব না। আমাদের পৈত্রিক নিবাসে আমরা ফিরে যাব। আমরা জিহাদের মাধ্যমে আগাছা ও পথের কাঁটা অপসারণ করে সামনে অগ্রসর হব। হয়ত বিজয় না হয় শাহাদাত। যে কোন একটা অর্জন করতেই হবে।" এরপর জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও ফাযায়েল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলে যুবকদের মধ্যে এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি হল। সকলেই জিহাদ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করল।

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ছিল না কোন রাস্তাঘাট, ছিল না স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। এ অঞ্চল ছিল খুবই অনুর্বর। পাহাড়ে ঘেরা চারদিক। আমরা কাবুল পর্যন্ত পৌছার কোন রাস্তা পাচ্ছিলাম না। তাই নৌকার মালামাল সহ নৌকা দান করে দিয়ে দিলাম। তারপর দু'টি ঘোড়া কিনে মাহমুদাকে নিয়ে কাবুল চলে গেলাম। আমরা প্রথমে একটি হোটেল ভাড়া করে থাকলাম। তারপর মহামতি নাদির শাহের নিকট সাক্ষাত করে বিস্তারিত ঘটনা জানালাম। তিনি আমাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। কিছুদিন পর কাবুলে মাহমুদার জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করলাম। কাবুল ও গজনীতে আমার জন্মভূমির অনেক পরিচিত লোক পেয়ে গেলাম। আমাকে পেয়ে অনেকেই খুব খুশী হয়েছিল। আমি বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে মুজাহিদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শতকরা পাঁচজন যুবকও জিহাদের জন্য পেলাম না। সবাই নিজের দেশ থেকে নিরাশ হয়ে গেছেন। একদিকে তৈরী করলে আর একদিকে ঝিমিয়ে যায়। তারপরও জিহাদী যজবা বুকে নিয়ে, শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লালন করে বিরামহীনভাবে জিহাদের দাওয়াত দিয়ে চললাম। দিনের বেলায় দাওয়াত দেই, আর রাতের বেলায় সেজদায় পড়ে আল্লাহ্র নিকট এ জাতির অলসতা দূর করার জন্য এবং ঘুম ভাঙ্গার জন্য দোয়া করতে লাগলাম।

৩য় খণ্ড সমাপ্ত

[চমৎকার কাহিনী নিয়ে সামনে আসছে আঁধার রাতের বন্দিনী ৪র্থ খণ্ড।]